অন্যপূর্বা

রঞ্জন

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫৭
তৃতীয় মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৫৮
চতুর্থ মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০



প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে তিন টাকা

THE ONLIE BEGETTER OF THESE INSVING PAGES

"মালতী"—কে

Pervixi : neque enim fortuna malignior unquam
eripiet nobis quod prior hora dedit.

I have lived ; nor shall maligner fortune ever
Take from me what an earlier hour once gave.

PETRONIUS ARBITER

লেখকের অন্যান্য বই

শীতে উপেক্ষিতা

বইয়ের বদলে

অসংলগ্ন

ভূমিকা

"অন্যপূর্বা" উপন্যাস নয়। বরং বলা চলে উপন্যাসকণিকা। সংস্কৃত খণ্ডকাব্যের অনুকরণে খণ্ড-উপন্যাস নামধেয়ী কোনো বস্তু যদি কল্পনা করা যায় তাহলে "অন্যপূর্বা"-র সেই শ্রেণীভুক্ত হতেও আপত্তি নেই। যদিও সবচেয়ে সঠিক বর্ণনা বোধহয় হবে, রোমন্যাস।

'সত্য বলিব, পূরা সত্য বলিব এবং সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না,' এই রকমের শপথ গ্রহণ করে ধর্মাবতারের সমক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া চলে, রোমন্যাসরচনা চলে না। তাই বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুধু মাত্র সত্য ঘটনার নির্ভেজাল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করব বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা এখন প্রত্যাহার করলেম। "অন্যপূর্বা"-র কাহিনীর ও চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি প্রকাশ্যে বেকবুল করলেম।

আমার বর্তমান পরিকল্পনা দেবেশ ও মালতীকে ঘিরে একটি উপন্যাসমালা রচনা করা। তার সামগ্রিক নাম দিয়েছি "ধারাভাষ্য।" "অন্যপূর্বা" সেই ভাষ্যের প্রাথমিক আভাষমাত্র, তার বেশি নয়। কিন্তু অংশ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বাঙ্গে আত্ম-প্রকাশ করবার ঔদ্ধত্য পোষণ করে তাহলে তার আপন পূর্ণতা অপরিহার্য। "অন্যপূর্বা" সেই আংশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা-বিরহিত নয় বলে বিশ্বাস করি।

প্রকাশক মহাশয় বললেন, এখানে আরো একটু জবাবদিহির প্রয়োজন আছে। আমার প্রথম বইকে আমার দ্বিতীয় বইয়ের

ভূমিকামাত্র বলে নিবেদন করোছলেম। (সর্বাধুনিক সংস্করণ থেকে এটি বাদ দিয়েছি)। এখনও অনুরূপ নিবেদন কেন করছি? কারণ দ্বিবিধ।

এক, এবারে সত্যি আরো লিখতে হবে। প্রথম অধ্যায়ে বলেছি যে কাহিনীর সমাপ্তিটা না জেনেই লিখতে শুরু করেছি। কথাটা সত্য। সমাপ্তিটা এখনো জানিনে, কেননা তা এখনো ঘটেইনি। যতটা জানি তারও অতি অল্পই এই খণ্ডে বর্ণিত হবার সুযোগ পেয়েছে। "অন্যপূর্বা" যে সত্যি আস্থায়ী মাত্র, তার অন্যতর প্রমাণ হিসাবে পরবর্তী পর্বের নামকরণ করেছি "অন্তরা"।

দুই, আমি যাই লিখি তা শেষ করা মাত্র তার সহস্র ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আমার চোখে এমন বেদনাদায়ক স্পষ্টতার সঙ্গে প্রকট হয়ে ওঠে যে তখনই সংকল্প না করে পারিনে যে সঙ্গে প্রকট হয়ে ওঠে যে তখনই সংকল্প না করে পারিনে যে এর পরে আরো লিখতে হবে এবং আরো ভালো করে।

"অন্যপূর্বা" গত বারো মাস ধরে শনিবারের চিঠিতে যে আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, পুস্তকাকারে মুদ্রণের বেলায় স্থানে স্থানে তার অল্পবিস্তর পরিবর্তন সাধন করবার লোভ সম্বরণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে এর আরো পরিবর্তন হবে না, এমন প্রতিশ্রুতিই বা দেব কী করে?

আর যা কথা ভূমিকায় প্রাসঙ্গিক হোতো তার অনেকখানি বইটির দেহে বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭। "রঞ্জন"

অন্যপূর্বা

এক

বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন সময়ে আমি কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছি। সেগুলি ফরমায়েশি লেখা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন সম্পাদকগণ বা বেতারকর্তৃপক্ষ।

আমি সব চাইতে বিপন্ন বোধ করি তখন, যখন কোনো সম্পাদক বন্ধু (সম্পাদকীয় কর্তব্যের প্রেরণায় নয়, বন্ধুত্বের প্রশ্রয়ে) বলেন, আমার ওই সংখ্যাটার জন্যে একটা লেখা দিতে হবে। আমি তখন কিছুতেই লেখবার মতো একটা বিষয় খুঁজে পাই নে। কেবলই মনে হতে থাকে, ও তো সবাই জানে, ও নিয়ে আবার নতুন করে লেখবার কী আছে? তিন-চার দিনের নিষ্ফলা ভাবনার পরে তখন আবার আমি টেলিফোন করি সম্পাদক মশাইকে, বলি, লিখতে রাজি, কিন্তু বিষয়টা আপনাকে বলে দিতে হবে।

পলিটিশিয়ানরা যাই বলুন না কেন, আমি সাধারণত সম্পাদকদের হৃদয়হীন তিরস্কারক মাত্র মনে করি নে। আমি তাঁদের সন্ধিসূত্রে-আবদ্ধ, অপরিহার্য কিন্তু অবিশ্বাস্য, শত্রু বলে জ্ঞান করি নে, বন্ধু বলে ভালোবাসি। তাঁরা তাই আমার

অনুরোধ অনুযায়ী বলেন, চৈনিক দর্শন সম্বন্ধে লিখুন। আমি তৎক্ষণাৎ বসে যাই চীন সম্বন্ধে একটা বই পড়তে, আর একটা দর্শন সম্বন্ধে। ছুটোয় মিলিয়ে প্রবন্ধ সৃষ্টি—না, সৃষ্টি নয়, প্রস্তুত—করি চৈনিক দর্শন সম্বন্ধে।

বাংলা-না-জানা অন্তত দুজন চীনা বন্ধু আমার সেই বাংলা প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

প্রতিভাবান ব্যক্তিরও প্রবন্ধ রচনায় বাধা নেই, কিন্তু প্রতিভাহীনও সাহিত্যের এই ক্ষেত্রটিতে একেবারে অনধিকারী নয়। ইংরেজীতে যাকে 'ট্যালেণ্ট' বলে, তার ঠিক বাংলা কথাটা আমি জানি নে। 'ক্ষমতা' কথাটা কোনো কোনো প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সাধারণত এর তাৎপর্যের ব্যাপকতা বিস্তৃততর। ঠিক বাংলা কথাটা যাই হোক, আমার ধারণা, সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচনার জন্যে 'ট্যালেণ্ট' বস্তুটিই যথেষ্ট। তার সঙ্গে একটু পরিশ্রম যোগ করলে শুধু সুখপাঠ্য নয়, পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করাও সাধারণের সাধ্যাতীত নয়। 'নো নেম্‌স্, নো প্যাক্‌ড্রিল' —নইলে ডজন তিনেক নামের উল্লেখ করতে পারতেম অনায়াসে।

প্রবন্ধের সুবিধা এই যে, সেখানে মৌলিকতার বা কল্পনার পরিসর অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। এই উভয় বস্তুই আমার অত্যন্ত পরিমিত। তাই, মনে মনে 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না' আবৃত্তি করে এত দিন পর্যন্ত নিজেকে নিবৃত্ত করেছি বামন হয়ে চাঁদ পাওয়ার প্রয়াস থেকে। সাহিত্যের যাকে সৃজনী শাখা

বলতে পারি, তা থেকে দূরে ছিলেম সসংকোচে ও সসম্মানে। সাহিত্যের মালঞ্চ মালাকর হতে না পেরে সাংবাদিকতার কারখানায় ঠিকে-মজুরের কাজ করেছি মাত্র মাঝে মাঝে।

গল্প আমি একেবারেই বানাতে পারি নে।

প্রবন্ধ রচনার প্রথম নীতিটি হচ্ছে সংক্ষেপণ। তাতে পরিবেশন করতে হয় বহু ও বিভিন্ন ফ্যাক্টের নির্যাসটুকু। স্তূপীকৃত ঘটনারাশি মন্থন করে বের করতে হয় প্রামাণ্য সত্যটা, (বা মিথ্যাটা), হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ। অপর দিকে, উপন্যাস রচনা করতে হলে চাই সংগীতশাস্ত্রে যাকে বলে বিস্তার। এই বিস্তার আমার হাতে একেবারেই আসে না। যা এক কথায় বলা যায় তাকে দু কথার ভারে জর্জরিত করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। অথচ এই এক কথার জায়গায় অন্তত দু'শো কথা না বললে উপন্যাস অসম্ভব। বাগ্‌বাহুল্যবর্জিত মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব না থেকে থাকত একটিমাত্র পর্ব। ফলে কাগজ বাঁচত, কিন্তু মহাকাব্যটি অমর হোতো না।

আমি যদি 'ইউলিসিস' উপন্যাসখানির পুনর্লিখনের আদেশ পাই, সমস্ত কাহিনীটা আমি একটি মাত্র নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদে বিবৃত করতে পারি। অমিত-লাবণ্যর কাহিনী নিয়ে আমাকে লিখতে বলা হলে আমি তৃতীয় লাইনের জন্যে ত্রিভুবন খুঁজে শূন্য হাতে ফিরতেম, অর্থাৎ কলম রেখে দিতেম।

কিন্তু এসব তো গেল উপন্যাসের রচনারীতির কথা। তার বেশি দরকারী হচ্ছে গল্প—প্লট। এই ঘটনা-উদ্ভাবনী শক্তি থেকেও বিধাতা আমাকে একেবারেই বঞ্চিত করেছেন।

আমার সঙ্গে কোনো অসাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ হলে আমিও কৌতূহলী হই, কিন্তু কিছুতেই তাকে সম্ভাব্য উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি নে। কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুসকাশে তার বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু লিখতে গিয়ে তাকে জীবন্ত করে তুলতে পারি নে। পাঠকের চোখের সামনে কিছুতেই তুলে ধরতে পারি নে আমার কল্পিত চরিত্রের মনোরম বা বিশ্বাসযোগ্য একটা রূপ।

কোনো কোনো সময় কার্টুন আঁকতে পারি। কিন্তু পোর্ট্রেট, নৈব নৈব চ।

এই চরিত্রচিত্রণও আবার উপন্যাসসৃষ্টির একটা অংশ মাত্র। একত্রিত চরিত্রসমষ্টি নিয়ে ছবির গ্যালারি হতে পারে যেখানে প্রতিটি চিত্রের পৃথক সত্তা স্বীকৃত; কিন্তু ফ্রেস্কো হতে পারে না, যেখানে সেই সমষ্টির সম্মিলিত ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে একটা সুসম্বদ্ধ ও সুসম্পূর্ণ কাহিনী বিবৃত করতে হয়। বিভিন্ন চিত্রের, বিভিন্ন চরিত্রের সেই যে মূল সুরটি, সেই যে সূত্রটি, তা আমার আয়ত্তের বাইরে। তাই আমি একজন নায়ক আর একজন নায়িকা যদিবা ঘর্মাক্ত মস্তিষ্কে কল্পনা করতে পারি, শত ষড়্‌যন্ত্র করেও তাদের স্বাভাবিক, এমন কি বিশ্বাসযোগ্য, একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারি নে।

যে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা পরস্পরের অপরিচিত, কে পড়তে যাবে অমন উপন্যাস? আর যে উপন্যাস কেউ পড়বে না, কে লিখতে যাবে তেমন উপন্যাস?

আমার নায়ক-নায়িকার অপরিচয়ের জন্যে একমাত্র আমার

কল্পনাশক্তির দৈন্যই যে দায়ী, এমন কথা স্বীকার করব না কিন্তু। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাই এমন যে সাধারণত তরুণ-তরুণীর প্রথম সাক্ষাৎই ঘটে ছাদনাতলায়; তাদের আপন অন্তরের প্রেরণায় বা পারস্পরিক আকর্ষণে নয়, গুরুজনের নির্বাচনে ও নির্দেশে।

সমাজবিধি ছাড়াও, নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটানো সব ঔপন্যাসিকেরই পক্ষে বিষম এক সমস্যা। বিশ্বসাহিত্যের কত শত গল্পে নায়ককে নায়িকার সম্মুখীন করা হয়েছে কোনো দুর্ঘটনার অজুহাতে—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন একটা উপন্যাসে যেন তার দীর্ঘ একটা তালিকা আছে।

এ ছাড়া বোধ হয় উপায় নেই। কিন্তু আমার কাছে এই রকমের আকস্মিকতার সুযোগ গ্রহণ কেমন যেন মনে হয়। অথচ স্বাভাবিকভাবে তাদের দেখা করাব এমন একটা বিশ্বাসযোগ্য অবস্থাও কল্পনা করে উঠতে পারি নে।

প্রথমটা যদিবা কোনো রকমে ভেবে উঠতে পারি, শেষটা একেবারেই নয়।

পূর্বকল্পিত একটা প.রণতিকে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক গতিতে, ধারাবাহিকভাবে, ধীরে ধীরে, প্রায় অদৃশ্যভাবে, পাঠকের মানস চক্ষে উদ্ভাসিত করতে যে কী অসামান্য ক্ষমতার প্রয়োজন তা কুশলী শিল্পীদের উপন্যাস যাঁরা একটু মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করেছেন তাঁরাই জানেন। আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যক এমন সহস্র ছোট ছোট কাহিনীর অবতারণার মধ্য দিয়ে মূল গল্প অগ্রসর হতে থাকে সমাপ্তির দিকে। শেষ পাতায়

পৌঁছে পাঠক সন্তুষ্ট হয় ; ভাবে ঠিক জায়গায় শেষ হয়েছে। আমি এমন একটা গ্রহণযোগ্য সমাপ্তি আজও ভেবে উঠতে পারলেম না।

অক্লান্ত পরিশ্রমে যদিবা কতকগুলি চরিত্রের চিত্র আঁকতে পারি, তাদের পরিণতি একেবারেই আমার কল্পনাতীত।

সম্প্রতি একটা বড়ো গল্পের জন্য কয়েকটা চরিত্র মনে মনে স্থির করেছিলেম। গল্পের কাঠামোটাও যখন অনেকটা এগিয়েছে, তখনই বিপদ শুরু হোলো। শেষে এরা, অর্থাৎ আমার চরিত্ররা, করবে কী ? একমাত্র যে সমাপ্তির কথা আমার মনে এলো তা হচ্ছে এই যে তারা সবাই মিলে হিরোশিমা গেল এবং তারপরেই সেখানে আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হোলো !

এখানেই অরসিক পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করে বসেন যে হঠাৎ এরা কলকাতা থেকে হিরোশিমা বা নাগাসাকি যেতে গেল কোন্ দুঃখে, আমি কী বলব ? বলব, নিজেদের প্রয়োজনে নয়, লেখকের প্রয়োজনে ! মুশকিল হচ্ছে এই যে, লেখকের প্রয়োজনের সঙ্গে পাঠকের প্রয়োজন প্রায়ই মেলে না।

এই সব অক্ষমণীয় অক্ষমতা সত্ত্বেও আজ যা লিখতে বসেছি, তাকে উপন্যাস ছাড়া অন্য কোনো নামে অভিহিত করবার উপায় নেই। নিহিতং গুহায়াম্ কোনো প্রতিভা হঠাৎ আবিষ্কার করে আজ লিখতে বসেছি, এমন নয় ! দৈব কোনো অনুগ্রহ বা স্বপ্নলব্ধ কোনো কবচ আমার সকল অক্ষমতা দূর করে দিয়েছে, এমনও নয়। কবুল করতে লজ্জা নেই,

লিখতে বসেছি শুধু এই জন্যে যে, আমার উপন্যাসের উপজীব্য আমাকে একটুও উদ্ভাবন করতে হয় নি।

আমার প্রতিটি চরিত্র আমার একান্ত পরিচিত, ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাদের রীতিমতো অন্তরঙ্গভাবে জানি। যে যে ঘটনার উল্লেখ করব তার এক কণাও আমার কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রতিটি বিবরণ হয় আমার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিবেদিত, নয়তো স্মৃতি বা শ্রুতি থেকে অনুলিখিত। আমি বিশ্বস্তভাবে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করে যাবো, যতটা আমি জানি। যা জানি নে তার উল্লেখমাত্র করব না।

কলকাতার এক বিদেশী দুগ্ধব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দিতেন: মিল্ক অ্যাজ দি কাউ গিভ্স ইট। আমিও ঠিক তাই করব। আমার কল্পনার জল মেশাব না। লিখিত বস্তু যতদূর সম্ভব পাঠযোগ্য করবার জন্যে যতটা উপন্যাসের আকার দেওয়া দরকার, তার একটুও বেশি দেব না। অভিজ্ঞ পাঠকের বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবে না যে, বর্ণিত ঘটনার কোন্ অংশ আমার চোখে দেখা আর কোন্ অংশ কানে শোনা বা মনে বোনা।

নায়ক-নায়িকার পরিচয়সাধনের দুরূহতা নিয়ে পূর্বেই বিলাপ করেছি। সেই সমস্যার সমাধান করলেম কী করে? আমি করি নি। প্রকৃতি করেছেন। আমার নায়ক-নায়িকার পরিচয় ঘটানোর জন্যে সমগ্র সৌরমণ্ডলের ষড়্যন্ত্র ছিল বোধ হয়।

আরম্ভ না হয় প্রকৃতি দেবী করেছেন, সমাপ্তিটা কী হবে? আমি নিজেই এখন পর্যন্ত জানি নে। আশা করছি, আমি

আমার উপন্যাসের সর্বশেষ অধ্যায় লিখতে আরম্ভ করবার আগেই জানতে পারব।

যে প্রকৃতি আমার কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তার উপর যবনিকাও তাঁকেই টেনে দিতে হবে।

কলকাতা বেতার 'রানিং কমেন্টারি'র বাংলা করেছেন "ধারাভাষ্য"। আমি সেই ধারাভাষ্যকার। যা দেখেছি এবং দেখছি, তাই বলছি। মাঝে মাঝে মাইক্রোফোনটা এগিয়ে দেব চরিত্রদের সামনে, তাঁদের নিজেদের জবানির জন্যে।

ভাষ্য শুরু করলেম অনুষ্ঠান যখন চলছে। শ্রোতাদের, এ ক্ষেত্রে পাঠকদের, অনুধাবন সহজ করবার জন্যে আগের ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে নিতে হবে।

দুই

আজ যিনি মিস্টার দেবেশ মুখোপাধ্যায় (এখানে বলা আবশ্যক যে, আসল নামটা দেবেশ নয়। প্রায় প্রত্যেক চরিত্রের বেলায়ই এই রকম নাম ও অন্যান্য দুয়েকটা বিবরণ পরিবর্তন করতে হয়েছে, কেন না তাঁদের অধিকাংশই জীবিত এবং উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য সামাজিক জীবনে 'বিব্রতির' কারণ হতে পারে) তাকে আমি জানতেম দেবু বলে। সে কুড়ি বছর আগেকার কথা। তখন তার বয়স ছিল নয় কিংবা দশ। কিন্তু সে জানাটাকে জানা বলেই মানি নে।

সেদিনের দেবু সেদিনের মণ্টু বা বাচ্চু থেকে বিশেষ বিভিন্ন ছিল না। হাসপাতালে যেমন এক শিশু থেকে অপর শিশুকে আলাদা করে জানতে হয় তার কব্জির নম্বরওয়ালা ফিতে দেখে, আমার তেমনি বালক বা কিশোরদের পৃথক করে জানবার জন্যে জোর করে মনে রাখতে হয় তাদের নামগুলো। সব শিশু, সব বালক, সব কিশোর আমার চোখে এক—যেমন সমগ্র চীনা জাতি আমার চোখে এক। মিস্টার মাংটু ও মিস্টার চাংটু যেমন আমার কাছে অভিন্ন ব্যক্তি, দেবু ও অন্যান্য সমবয়সী কিশোর তেমনি আমার কাছে একই ছিল।

কুড়ি বছর আগে যখন তাকে দেখেছিলেম, তখন সে ইস্কুলে কোন ক্লাসে যেন পড়ত। সম্প্রতি যখন তার সঙ্গে দীর্ঘকালের

ব্যবধানে আবার দেখা হোলো, তখন সেটাকে প্রথম পরিচয় বলেই মনে করতেম যদি না দেবেশের মুখের সঙ্গে তার মার, যাঁকে আমি মাসীমা ডাকতেম, মুখের অসামান্য সাদৃশ্য থাকত। অস্বাভাবিক রকম বড়ো গোল গোল দুটো চোখে যখন নিতান্ত লৌকিকতার দৃষ্টিতেই আমার দিকে চেয়ে নিতান্ত মামুলি সুরেই বললে, "প্লীজ্‌ড্‌ টু হ্যাভ মেট য়ু," আমার কেবলই মনে হচ্ছিল একে যেন কোথায় দেখেছি, একে যেন কোথায় দেখেছি! কিন্তু পরিচয়টা সাধিত হয়েছিল বহু জনের উপস্থিতিতে, সেখানে এমন ব্যক্তিগত সন্দেহের নিরসনের বা সমর্থনের সুযোগ ছিল না।

পরিবেশটাই ছিল আন্তরিকতার পরিপন্থী। অন্যান্য বেতারকেন্দ্রের অভিজ্ঞতা নেই আমার, কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াটাই কেমন যেন আমুভূতিক সূক্ষ্মতার প্রতিকূল। সেখানে না আছে সাহিত্যের বা সংগীতের আসরের উদার অনিয়ম, না আছে সুপরিচালিত আপিসের নিরাবেগ নিয়মানুবর্তিতা। কৃত্রিম ভদ্রতা আছে, অনান্তরিক সৌজন্য আছে, নির্লজ্জ চাটুকারিতা আছে; নেই শুধু কলাসৃষ্টির অনুকূল সৌহার্দ্য।

আমার সঙ্গে বেতারের সম্বন্ধ প্রধানত ব্যবসায়িক। নিমন্ত্রিত হলে সেখানে গিয়ে বক্তৃতা করে আসি। কাজ ছাড়া বড়ো একটা কারও সঙ্গে কথা বলি নে। সেখানকার পরিচিতদের পরিচিত বলেই মনে করি, তার বেশি নয়।

কিন্তু দেবেশ আমাকে আকর্ষণ করল প্রবলভাবে, তার

অনুদ্ধত নির্লিপ্ততা দিয়ে। আমাদের যিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি অন্য কী একটা কাজে আমাদের উভয়ের কাছে ইংরেজী আদব অনুযায়ী ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেই আমি দেবেশের দিকে আর একবার ভালো করে তাকালেম।

মাসীমার মুখের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা তখন আর মনে ছিল না। দেখছিলেম শুধু ছেলেটির মুখে অসামান্য কোন তারুণ্যের অনির্দেশ্য কিন্তু সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

সবচেয়ে আগে চোখ পড়ে তার চোখ তুটোর উপর। তাদের আকৃতি অসাধারণ রকম বৃহৎ, কিন্তু তার চেয়ে অধিকতর অসাধারণত্ব আছে তাদের প্রকৃতিতে। আমি যখন ওকে দেখছিলেম, তখন ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সামনের কি একটা বইয়ের পাতায়। অন্য সময়ে আমি অবহেলিত হয়েছি বলে ক্ষুব্ধ হতেম। কিন্তু দেবেশকে দেখতে দেখতে আমি সে কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেম। দৈর্ঘ্যে দেবেশকে হ্রস্বকায়ই বলতে হবে, পাঁচ ফিটের উপরে যে কয় ইঞ্চি তা গুনতে একটা হাতেরও সবগুলো আঙুলের প্রয়োজন হয় না। স্থূলদেহ নয়, কিন্তু দেখলে স্বাস্থ্যহীনও মনে হয় না। মাথায় চুল আছে অনেক, কিন্তু প্রশস্ত ললাট তাতে চাপা পড়ে নি। মাথা এবং মুখ তুইই বেশ বড়ো; তাদেরও ছাপিয়ে ওঠে ওর চশমাটা; তার কাচ যেমন ভয়ানক পুরু, ফ্রেমটাও তেমনি অস্বাভাবিক রকম মোটা। দেবেশকে প্রচলিত অর্থে সুন্দর বলা যায় না কোনোমতেই; বর্ণ তার ঘোরকৃষ্ণ না হলেও

গৌরও তেমন নয়। মাথার চুল কোঁকড়ানো নয়, মুখে নেই অর্থ ও পৌরুষহীন হাসি।

না, দেবেশ বাংলা ছবির নায়ক হতে পারবে না। কিন্তু সে নিঃসন্দেহে পৃথক, বিভিন্ন। তার চেহারায় আর যাই থাক্ বা না থাক্, ক্যারেক্টর আছে ; ও বস্তুটি দুর্লভ। আমি প্রথম দর্শনেই দেবেশের অনুরাগী হলেম, তার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই না জেনে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমার স্বভাবশীতলতা পরিহার করে জিজ্ঞাসা করলেম, "আপনি বোধ হয় খুব অল্পদিন এখানে যোগ দিয়েছেন ?"

বই থেকে মুখ তুলে দেবেশ উত্তর করল, "বস্তুত, সবে গত কাল রাত্রে আমি দিল্লী থেকে এসেছি। আজ সকালে এখানে যোগ দিয়েছি। আমার চলে আসায় দিল্লী দীন হয় নি, বাংলা ধনী হয়েছে কি না সন্দেহজনক।—" একটু হাসল দেবেশ।

আমি প্রশ্ন করেছিলেম বাংলায়, উত্তর পেলেম ইংরেজীতে। এর মতো বিরক্তিকর আর কিছু নেই। কিন্তু এতটুকু বিরক্ত হই নি। আমার সকল বিরক্তিবোধ জয় করে নিয়েছিল দেবেশের অপূর্ব কণ্ঠস্বর আর তার আশ্চর্যরকম অভারতীয় ইংরেজী উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গী। সাধারণত আমরা একজন লোককে যাচাই করে থাকি চোখ দিয়ে দেখে। দেবেশকে চিনতে হয় আরও কয়েকটা ইন্দ্রিয় দিয়ে।

আমি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর যৌবনে, এমন কি প্রৌঢ়ত্বেও

দেখিনি। প্রথম যখন তাঁর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করি তখন তিনি বার্ধক্যের সীমানায় উপনীত মাত্র নন, বেশ কিছু-দূর অগ্রসর হয়েছেন। অথচ, আজ পর্যন্ত যথার্থ রূপবান কোনো পুরুষের কথা চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে রবীন্দ্রনাথের কথা, তারপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর, তারপর উদয়শংকরের।

নিজ নিজ ক্ষেত্রে এই তিন প্রতিভাবান ব্যক্তির (অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র ছিল সর্বদিকে প্রসারিত) অতুলনীয় কীর্তির মহিমা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না করে তাঁদের শারীরিক রূপের উল্লেখ করলেম এই জন্যে যে, রূপ ও গুণের অমন সমন্বয় বড়ো দুর্লভ।

বিধাতা সক্রেটিসকে পাণ্ডিত্য দিয়েছিলেন, কিন্তু রূপ থেকে একেবারেই বঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক্।

যে তিন সার্থক পুরুষের নাম করেছি, তাঁদের প্রত্যেকেরই কণ্ঠ আমাকে নিরাশ করেছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে শুনেছি যে, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নাকি এক সময়ে অপরূপ মূর্ছনা ছিল। নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু আমি তা শুনি নি। তাঁর শেষ বয়সের রেকর্ডে গাওয়া গান ভক্তিভরে শোনা যায়, আনন্দমুগ্ধ হয়ে নয়। কথা বলবার সময় তাঁর স্বরে মধুরতা ছিল, কোমলতা ছিল, সঙ্গীতের রেশ ছিল; কিন্তু পৌরুষ ছিল না। জওহরলালের স্বরের আন্তরিকতার সুর অনস্বীকার্য, কিন্তু তা আদৌ শ্রুতিমধুর নয়। উদয়শংকরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে বিধাতা এত ছন্দ, এত সুর দিয়েছেন যে কণ্ঠের জন্যে এক কণাও অবশিষ্ট থাকে নি।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের বেলায়ই আমার নয়ন তৃপ্ত হলেই আমি পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত হই নে। দৃষ্টি তুষ্ট হলেও শ্রুতি বলতে থাকে আমি পেলেম কী? দেবেশ নয়ন জুড়োয় না, নয়নকে জাগ্রত করে। কান খাড়া করে শুনতে হয় তার কথা। আমি যে দেবেশের এত প্রশংসা কীর্তন করছি তা চোখ-কান বুজে নয়, চোখ এবং কান দুইই খুলে।

দেবেশের ইংরেজী উত্তরে কৃত্রিমতা ছিল না, ঔদ্ধত্যও ছিল না। কিন্তু কি রকম একটা নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততার সুর ছিল। তার উত্তর আলাপের ধারাবাহিকতার দ্বার রুদ্ধ করে দেয় না, কিন্তু কর্পোরেশনের পার্কের দরজার মতো তা খোলাও থাকে না নির্বিশেষ প্রবেশের জন্যে। সে-দরজা, বেশ বুঝতে পারলেম, খুলতে প্রস্তুত; কিন্তু প্রবেশপত্র দেখাতে হবে। দেবেশের উত্তরে নিষেধ ছিল না, আবার নিমন্ত্রণও ছিল না। কিন্তু তার সম্বন্ধে কেন জানি না আমার কৌতূহল ক্রমশই এমন অদম্য হয়ে উঠল যে আবার নিজেই জিজ্ঞাসা করলেম, "আপনি বুঝি এখানে—"

আমি প্রশ্নটা শেষ করতে পারলেম না। দেবেশ বুঝতে পারল, আমার উপস্থিতিতে আর বই পড়া হবে না। সশব্দে সে বইটা বন্ধ করে আমার দিকে চেয়ে হাসল। সেই প্রথম লক্ষ্য করলেম যে, তার কণ্ঠে যেমন বলিষ্ঠতা ও মধুরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল, তার হাসিতে তেমনই বুদ্ধির দীপ্তি শুধু নয়, বন্ধুত্বের আবেশও ছিল। প্রীতিমধুর হাসির সঙ্গে বললে, "হ্যাঁ, আমাকে দিল্লী থেকে এখানে স্পেশ্যাল অফিসার করে

পাঠিয়েছে, বিশেষ করে আগামী পনেরোই অগস্টের অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় এখানকার পরিচালকদের সহায়তা করতে। এখনও দেড় মাস বাকি তার, তাই ফাঁকি দিয়ে বই পড়ছিলেম।”

“আমি তো শুধু এক রকমের ফাঁকির কথাই জানি,—বই থেকে ফাঁকি।”

দেবেশ আমার পরিহাসে দৃশ্যতই খুশি হোলো। কিন্তু আমার হাসি শেষ হবার আগেই তার মুখে গাম্ভীর্যের কুঞ্চন দেখা দিল। হঠাৎ অন্যদিকে তাকিয়ে, প্রায় অন্যমনস্কভাবে, তার গভীর এবং গম্ভীর স্বরে স্বগতোক্তির মতো বলল, “না, অত্যধিক পড়াশুনোও এক রকমের ফাঁকি, অত্যধিক সুরাপান ইত্যাদির মতো একটা পলায়ন মাত্র। মানুষ যখন দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত হয় অর্থাৎ মরে যায়, তখন যেমন আমরা মৃতের ফোটোগ্রাফ নিয়েই পূজো করতে থাকি, পড়াশুনোও তেমনই। জীবন যাদের কাছে জীবন্ত নয়, তাদেরই জীবনের প্রতিলিপি খুঁজে ফিরতে হয় বইয়ের পাতায়। বাঁচতে যারা শেখে নি বা অন্য কোনো কারণে পরিপূর্ণভাবে বাঁচা থেকে যারা বঞ্চিত, তারাই কোনো-না-কোনো আতিশয্যে সেই শূন্যতার সব্‌স্টিট্যুট খোঁজে। সেটা অধ্যয়নের আতিশয্য হলে সাধারণের প্রশংসা লাভ করে, আর মদ্যপানের হলে নিন্দা। মূল উদ্দেশ্যটা যে উভয় ক্ষেত্রেই এক—পলায়ন—এটা আমি জানি বলেই বহু স্বভাবমদ্যপ আমার বন্ধু ও বহু অধ্যাপক আমার শত্রু।”

এই রকমের চমক-লাগানো নতুন কথা আমি সব সময়েই সন্দেহের চোখে দেখি। মনে করি, আমার অপঠিত বিদেশী কোনো গ্রন্থকার থেকে চুরি বুঝি। কিন্তু আশ্চর্য, দেবেশের মুখে কথাগুলো বক্তৃতা বলে মনে হোলো না, বাঁধা বুলির মতো শোনাল না। তার উক্তির সঙ্গে উপলব্ধির নিবিড় যোগাযোগ এমন স্পষ্ট হয়ে আমার কাছে ধরা দিল যে তার সম্বন্ধে কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

'জীবন যার কাছে জীবন্ত নয়,' 'বাঁচা থেকে যারা বঞ্চিত' —সন্দেহের বাষ্পমাত্র রইল না যে, এ ছেলের কোথায় যেন অতিবৃহৎ, অতি গভীর কিন্তু অদৃশ্য একটা আঘাত আছে। ভদ্রতার কথা আমি তখন একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেম, কিন্তু তবু প্রশ্ন করতে সাহস পেলেম না এই কথা মনে করে যে আমার প্রশ্ন বোধ হয় ওকে ব্যথিত করবে আরও বেশি। প্রথম দর্শনেই দেবেশের সর্বাঙ্গীণ পৌরুষ যেমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তেমনই এখনও বুঝতে বাকি রইল না যে, ওর দৃপ্ত কণ্ঠের, বুদ্ধির দীপ্তির ও দৃষ্টির কঠোরতার পশ্চাতে আছে একটি আবেগপূর্ণ অতি-কোমল হৃদয়।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়েই দেবেশ বোধ হয় বুঝতে পারলে আমার কৌতূহল। একটু বিব্রতও বোধ করল বা। একটু হেসে বললে, "এগুলো আমার কথা নয় অবিশ্যি।"

সন্দেহ রইল না যে, প্রতিটি বর্ণ ওর নিজের কথা। হেসে বললেম, "না না, তা হতে যাবে কেন ?"

আলোচনা যাতে অত্যধিক ব্যক্তিগত না হয়ে যায়, সেজন্যে

ব্যবসায়িক কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে যাবো, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন একজন অতি-পরিচিত সাংবাদিক। ভদ্রলোকের সঙ্গে যাঁদেরই পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে এঁর চরিত্রের দুর্মর তারুণ্য প্রৌঢ়ত্বের ভ্রূকুটিকে পরোয়া করে নি, এঁর অন্তরঙ্গতা সামাজিক সকল আইন লঙ্ঘন করে উপচে পড়ে বয়সনির্বিশেষে সকলের উপর, এঁর বাক্‌চাতুরি মূককে বাচাল করে তোলে তাঁর নিজের মতো। ঘরে প্রবেশ করে আমাকে দেখেই বললেন, "কী হে, তোমার তো আর দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল? তোমরা হচ্ছ সব আজকের নব্য বাংলার নব্য জর্ণালিস্ট। আমাদের যতই প্রাচীন ও প্রস্তরীভূত মনে করো না কেন, জর্ণালিজ্‌ম আর সে জর্ণালিজ্‌ম নেই।"

প্রাচীন ও নবীন জর্ণালিজ্‌মের তুলনামূলক আলোচনা সমাপ্ত হলে সাংবাদিক মশাই পুনরায় শ্রোতৃমণ্ডলী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে চতুর্দিকে প্রশংসাভিক্ষু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেবেশকে দেখে সোল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, "আরে আরে, দেবেশ যে! এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি একেবারে!"

অবিলম্বেই তাঁদের কথোপকথন থেকে সংগ্রহ করলেম যে তাঁদের পরিচয় অনেক দিনের। আরও সংগ্রহ করলেম যে সাংবাদিক মশাই দেবেশের গুণগ্রাহী। কিয়ৎক্ষণ নানাবিধ বার্তাবিনিময়ের পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "জানো, দেবেশ তখন সবে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতা এসেছে কলেজে ভর্তি হতে। ১৯৩৬ সালের কথা। একদিন লাজুক একটি বাচ্চা ছেলে আমার আপিসে এসে ঢুকল। এসেই বলে কিনা—"

আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে যাচ্ছিলেম। কিন্তু দেবেশ তাঁকে থামিয়ে দিলে, বললে, "ম্যাট্রিক পাস করাটা জীবনের আর একটি মাত্র কুকীর্তির চাইতে কম লজ্জাকর, সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক ফেল করা। ও-বয়সটার কথা কি কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে আছে?"

সাংবাদিক মশাইয়ের উদার হাস্যরোল আবার রেডিও-স্টেশনের ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোড়িত করে তুলল। হাস্যের উদ্দামতা অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হলে (সেটা একেবারে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া নয়, তাঁর ক্ষেত্রে) বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, বলব না তোমার ছেলেবেলার কথা। বয়স ব্যাপারটাই অদ্ভুত, বৃদ্ধকে প্রৌঢ় বললে খুশি, প্রৌঢ়কে তরুণ বললে খুশি, কিন্তু কিশোরকে বালক বললে আর রক্ষে নেই!" আবার হাস্য। হাসি থামলে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা দেবেশ, অ্যাডোলেসেন্সের কথা না হয় বলতে দেবে না। কতদূর অ্যাডাল্ট হয়েছ তাই দেখা যাক এবার। বিয়ে-টিয়ে করেছ? অ্যাঁ?"

নিমেষে দেবেশ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। রীতিমতো চেষ্টা করে যে তাকে ক্রোধ গোপন করতে হচ্ছিল, তা তার সংযত উত্তরের বর্ণে বর্ণে নির্ভুল প্রকাশ পেল। বললে ইংরেজীতে, "যদি কিছু মনে না করেন, এ প্রশ্নটার উত্তর দেব না।"

সাধারণত-অবিচলিত সাংবাদিক ভদ্রলোকও যেন বেশ অপ্রস্তুত বোধ করলেন। উচ্চহাস্য মৃদু হোলো, আলাপের

গতি মন্থর হোলো, কিয়ৎকাল পূর্বের হাস্যমুখর কক্ষে বিরাজ করতে লাগল কি রকম একটা থমথমে ভাব।

আমার খারাপ লাগতে লাগল। অপ্রশমিত কৌতূহলের চাইতে বেশি মনে লাগল দেবেশের অজ্ঞাত ক্ষতের অদৃশ্য রক্তক্ষরণ। তার বিবাহসম্পর্কিত ঔৎসুক্যের চাইতে প্রবলতর-ভাবে জাগ্রত হোলো অত্যন্ত অহেতুক কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিক অনুকম্পা। ওর ব্যথা যেন আমার ব্যথা হোলো।

কি একটা যেন অজুহাত আবিষ্কার করে আমি তারপরে দেবেশকে নিয়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেম। অযথা কালহরণ না করে সাংবাদিক মশাই অবিলম্বেই অন্যান্য পারিষদদের নিয়ে সোৎসাহে বক্তৃতা পুনরারম্ভ করলেন।

দেবেশ কথা বলতে পারছিল না। শুধু বিষাদশ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জনতা থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্তিতে সহায়তা করবার জন্যে নীরবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছিল। আমি সস্নেহে তার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করে ক্ষীণকণ্ঠে বললেম, "আবার কবে, কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে?"

দেবেশ বললে, "কাল, কিন্তু কোথায়-টা আপনাকে বলতে হবে। আমি তো জানি নে, আজকাল ভদ্র একটা নিভৃত জায়গায় চা খাওয়া যায় কোন্ দোকানে!" স্থান ও কাল উভয়ের সম্মতিতে নির্দিষ্ট হোলো।

বয়সের ব্যবধান, পরিচয়ের স্বল্পতা, পরিবেশের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা বন্ধু হলেম।

তিন

অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব নিবিড় হতে নিবিড়তর হোলো। এর মধ্যে দেবেশ আর আমি বহুবার একসঙ্গে আপিস-পাড়ার হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন করেছি, চৌরঙ্গীতে চা-পান। রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, জীবন, জীবিকা, মৃত্যু (শারীরিক ও মানসিক) প্রেম, সমাজ, বিবাহ, বিজ্ঞান, অহিংসা—এমন বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা হয় নি। ওর কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। তাই আমি অধিকাংশ সময়েই ঠিক ততটুকু বলতেম, যতটুকু দরকার ওকে বেশি—আরও বেশি—বলাবার জন্যে। কোনো বিষয়ে একমত হলেও বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেম, যাতে দেবেশ বলবার—আরও বলবার—সুযোগ পায়। তার অধ্যয়নের বিস্তৃতি আমায় বিস্মিত করত, মৌলিক চিন্তাশক্তি আমায় মুগ্ধ করত। তর্ক করতে ওর ছিল অসামান্য ক্ষমতা আর অপরিসীম উৎসাহ।

দেবেশের সঙ্গে বহুবিধ তর্কের যে-দিকটা আমার সব চাইতে ভালো লাগে, তা হচ্ছে ওর সর্ববিধ আলোচনার পরিপূর্ণ নির্ব্যক্তিকতা। আজ পর্যন্ত কখনও ওকে শুনি নি কোনো বন্ধুর বিরূপ আলোচনা করতে। দেবেশ ব্যক্তির উল্লেখ করে কেবলমাত্র তখনই, যখন কোনো আইডিয়া বা নীতির ব্যাখানে তাকে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। তা নইলে নয়।

দেবেশের সঙ্গে আমার নানাবিধ তর্কের বিস্তারিত বিবরণ যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-সাহিত্য হবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি লিখতে বসেছি উপন্যাস। অধৈর্য হয়ে উঠেছি আমার গল্পের নায়িকার আবির্ভাবের জন্য। স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত নাটক ইস্কুল-মাস্টারদের তাড়নায় পুরস্কার-বিতরণী সভায় অভিনীত হতে পারে। কিন্তু যে উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়েও কোনো স্ত্রীচরিত্রের সন্ধান মেলে না, দিবানিদ্রার তাড়নায় সকল পাঠকই সে উপন্যাস নিশ্চয়ই বিনা দ্বিধায় সরিয়ে রাখবেন। আমার ঔপন্যাসিকতা এত উদ্ধত নয় যে পাঠকের কথা উপেক্ষা করতে পারি।

কিন্তু দেবেশের প্রাথমিক পরিচয়ই যে এখনও শেষ করতে পারলেম না। আর কাউকে আনি কী করে? অথচ দেবেশের পরিচয়, এমন কি প্রাথমিক, পূর্ণ করতে গেলে তার নানাবিধ তর্কের উল্লেখ না করে উপায় নেই।

এদিকে, করলেই কি উপায় আছে? সমালোচকের তর্জনীর ভয়াবহতা বিস্মৃত হতে পারি নে এক মুহূর্তের জন্যেও। তিনি তিরস্কার করবেন এই বলে যে, আমার উপন্যাস সত্যকার উপন্যাস হয় নি, প্রচার-সাহিত্য হয়েছে মাত্র। আমাকে সবিনয়ে, হয়তো সবিনয়েও নয়, স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে যে, উপন্যাসের উদ্দেশ্য উচ্চ দর্শনের তাত্ত্বিক আলোচনা নয়—তার জন্যে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা আছে—সার্থক উপন্যাসের মূল সূত্র হচ্ছে সুসম্বদ্ধ কাহিনীর বিকাশ আর বিভিন্ন চরিত্রের পরিস্ফুটন।

পূর্বে এই চরিত্রের পরিচয়-প্রদান ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজতর ছিল। তখন যদি কারও সম্বন্ধে বলা হোতো যে, অমুক কুলীন ব্রাহ্মণ, তা হলেই তার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যেত। তার উপর যদি যোগ করা যেত যে সে অমুক পরিবারের ছেলে এবং অমুক ইস্কুলে পড়েছে, পরিচয়টা তা হলে একেবারেই পূরো হোতো। জাতিগত, পরিবারগত, পাঠশালাগত বৈশিষ্ট্যগুলি তখনও জীবন্ত ছিল, সত্য ছিল। উনবিংশ শতকের নয়া ধনিকবাদের ষ্টীম-রোলার তখনও নির্বিচারে সমাজের উচ্চ-নীচ আর ইতর-বিশেষকে সমান করে দেয় নি।

কিন্তু তার অবসান হয়েছে একেবারেই। ব্রাহ্মণপুত্র আজ আর যজন-যাজন-অধ্যয়নকেই অবশ্যম্ভাবী জীবিকা বলে জানে না, সস্তায় পেলে সে জুতার ব্যবসায়েও অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। প্রাদেশিক-মন্ত্রিত্ব-প্রয়াসী ধীবরপুত্রের সংখ্যাই কি আজকের দিনে কম? না, ব্যক্তির পরিচয় আজ জাতিতে নেই, ইস্কুলের ছাপেও নেই, পরিবারের মার্কায়ও নেই।

রাজনীতির মার্কায় তবু একটা রকমের পরিচয় মেলে। যদি বলি রাম কন্‌গ্রেসী আর শ্যাম কম্যুনিস্ট, তা হলে এটুকু অন্তত অনুমান করা সঙ্গত হবে যে, প্রথম জন রামরাজ্যে বিশ্বাসী আর দ্বিতীয় জন রাবণ রাজ্যে। যদি বলি, হরি হিন্দুমহাসভা আর গৌর মজদুর-পঞ্চায়েৎ, তা হলেও তাদের চরিত্রগত বৈষম্যের কিঞ্চিৎ আভাস মেলে। আজকের

ঔপন্যাসিকের তাই কিছু-না-কিছু তর্কের অবতারণা করতেই হয়—উপন্যাসেরই প্রয়োজনে।

আরও একটা উপায় আছে অন্তর্নিহিত চরিত্র আবিষ্কারের। মার্কিন সাংবাদিক গান্থার এই উপায় অবলম্বন করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। তাঁরই অনুকরণে আমাদের কোন সাংবাদিক যেন একবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাশ্মীর-ভ্রমণের একটা রিপোর্টে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। তিনি অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে এই কথাটাও উল্লেখ করেছিলেন যে, পণ্ডিত নেহরু ছুটিতে পড়বার জন্যে কী কী বই নিয়েছিলেন। সেই পুস্তক-তালিকায় ছিল মানুষ জওহরলালের সত্যকার পরিচয়, পরিচয় ছিল সেই জিজ্ঞাসু অন্তরের সংস্কৃতির যা গণতান্ত্রিক রাজনীতির চাপেও একেবারে মারা পড়ে নি আজও।

দেবেশ-চরিত্রের এমনই একটা চাবির সন্ধানে একদিন গিয়েছিলেম ওর বাড়িতে। দেবেশ বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজা খুললেন দেবেশের মা। অভ্যর্থনায় আন্তরিকতার নিঃসন্দেহ প্রকাশ ছিল বৃদ্ধার শান্ত মধুর হাস্যে।

"এসো, বসো, দেবু রোজই বলে তোমার কথা। এই একটু আগে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল, এখনই ফিরবে বোধ হয়।"

আমি প্রণাম করে আসন গ্রহণ করলেম। যেখানে কার্ড পাঠিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, সেখানে আমি বড়োই অপ্রস্তুত বোধ করি। মাসীমা সেই দুরূহ

ব্যাপারটাকে একেবারেই সহজ করে দিলেন প্রথমেই চিনতে পেরে।

অথচ তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল বহু বৎসর পূর্বে। তখন তাঁর শরীরের গঠন ছিল তখনকার বয়সানুযায়ী। অনেক বেশি দৃঢ়। স্বাস্থ্য ছিল, শক্তি ছিল। তাঁর কর্মিষ্ঠতা ছিল আপন সংসারে স্বীকৃত, প্রতিবেশে ঈর্ষিত। আজও মনে আছে, আমরা পাড়ার উঁচু ক্লাসের ছেলেরা তাঁকে একদিকে যেমন ভয় করতেম, ঠিক তেমনই সম্মান করতেম। তাঁর ব্যক্তিত্বকে সবাই মেনে নিত সহজে। তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সহজ মহিমায়, চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যে বা কঠোরতায় নয়।

সে অনেক দিনের কথা। আজকের মাসীমার দেহে কাল তার পদচিহ্ন রেখে যেতে ভোলে নি। সব চাইতে আগে চোখে পড়ে তাঁর শুভ্র কেশরাশি, একটাও কালো চুলের কলঙ্ক নেই কোথাও। কিন্তু সেই ঋজু দাঁড়াবার ভঙ্গীটি আজও যায় নি, সেদিনকার শক্তির সঙ্গে আজকের সৌম্য যুক্ত হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও যেন মহিমময় করে তুলেছে। আজ তাঁর উপস্থিতি শুধু সম্মান দাবি করে না, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

নীচের ঘরে চেয়ারে বসতে যাওয়ার আগেই মাসীমা বললেন, "চলো, দেবুর ঘরে বসিগে।" সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, "দেবুর সঙ্গে তুমি সম্প্রতি যে তেনটে প্রোগ্রাম করেছিলে, খুব ভালো হয়েছিল। ইংরেজী তো জানি নে আমি, তাই বুঝি নি কী বলছিলে তোমরা। কিন্তু তবু শুনলে যেন

বুঝি কোন্‌টা ভালো আর কোনটা খারাপ। তোমার বলা ভারি ভালো লাগছিল।”

“ওগুলোতে আমার বিশেষ কিছু ছিল না। সবটাই দেবেশের লেখা ছিল, আমি শুধু কয়েকটা জায়গা ওর শেখানো মতো পড়েছি।”

আপন পুত্রের প্রশংসার মৃদু প্রতিবাদ করলেন মাসীমা, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল যে প্রগাঢ় আনন্দ পেয়েছেন আমার উক্তিতে। আমার সম্বন্ধে পারিবারিক কয়েকটা প্রশ্ন করে মাসীমা বললেন, “একটু বসো তুমি, আমি চা নিয়ে আসছি।”

মাসীমা অন্তর্হিত হলে দেবেশের ঘরটার চার দিকে ভালো করে দেখতে লাগলেম। এটা পড়বার ঘর কি বসবার ঘর কি শোবার ঘর, বোঝবার উপায় নেই। চতুর্দিকে স্তূপীকৃত হয়ে আছে নানা বিষয়ের নানা লেখকের অসংখ্য বই। বেশির ভাগই ইংরেজী। সুসজ্জিত একটা গ্রন্থাগার আশা করেছিলেম; দেখলেম পুস্তকের অরণ্য, উদ্যান নয়।

চা নিয়ে মাসীমা ফিরে আসতেই বই থেকে চোখ সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেম, “দেবেশের আসতে বোধ হয় একটু দেরি হবে। আমার আবার—”

“আগে চা-টা তো খাও, এরই মধ্যে এসে পড়বে বোধ হয়। তোমার চাইতেও বেশি অধৈর্য হয়ে উঠেছে দেবুর বিড়ালটা।”

নিঃশব্দ কিন্তু মধুর হাস্যে পাদপার্শ্বে উপবিষ্ট প্রাণীটার গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন মাসীমা। সত্যি, এত সুন্দর

বিড়াল আমি দেখিনি। দেহে কান্তি, চোখে শান্তি, বুঝতে বিলম্ব হয় না যে তার আদরের অপ্রাচুর্য নেই এ বাড়িতে। সহজেই বললেম, "বাঃ, ভারি সুন্দর তো বিড়ালটা! আপনি পোষেন বুঝি?"

"পাগল নাকি! বিড়াল পোষে তো পাগলে। দেবু ছাড়া এমন সৃষ্টিছাড়া শখ হবে কার? ও বলে—এর চেহারা মেমসাহেবের মতো। আমি বলি—এর স্বভাবটা লাটসাহেবের মতো। দেবু হাতে ধরে খাবার না তুলে দিলে খাবেন না, দেবুর শয্যা ছাড়া শোবেন না, এমনই অনেক গুণ আছে এঁর। নাম রাখা হয়েছে স্যালি।"

মাসীমার ভর্ৎসনা থেকে অনুমান করতে একটুও কষ্ট হোলো না যে, মার্জারসম্রাজ্ঞী তাঁর নিজেরও বিশেষ স্নেহের পাত্রী। এ-ও বুঝতে বাকি রইল না যে, মাসীমার স্নেহ এই শান্ত পশুটির উপর এমন অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে বিশেষ করে এই জন্যেই যে সে দেবেশের এত আদরের। দেবেশের যা ভালো লাগে, মাসীমার তা খারাপ লাগবে কেমন করে?

আমি বলবার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে বললেম, "দেবেশের হঠাৎ এমন আজগুবি শখ হতে গেল কেন? ওর মতো সাহেব মানুষের তো কুকুর পোষাই বেশি স্বাভাবিক হোতো।"

"ওর বাইরেটা অমনই বটে। ওকে সবাই ভুল বোঝে।"

আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেম। আমার নির্দোষ

পরিহাসের একান্ত অনভিপ্রেত একটা অর্থ করে মাসীমা অনর্থক ব্যথা পেয়েছেন। অজ্ঞানকৃত অপরাধের সংশোধনে সত্বর বললেম, "কোনো নিন্দে করবার জন্য দেবেশের সাহেবির কথা বলি নি মাসীমা। ওর ব্রড্কাস্টের ইংরেজী শুনে সবাই ওকে সাহেব বলে ভুল করে কিনা, শুধু সেই জন্যেই বলছিলেম।"

মাসীমা আবার দৃশ্যতই খুশি হলেন। বললেন, "না, বাবা; দেবুর নিন্দে কি আর তুমি করবে? আমি কি জানি নে যে, তোমাদের দুজনে কী রকম বন্ধুত্ব? আমার কথায় তুমি কিছু মনে ক'রো না যেন।"

একটু থেমে, কি রকম যেন অদ্ভুত একটা ব্যথিত স্বরে, প্রায় আপন মনে বললেন, "দেবুর আমার এত গুণ! কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য এমনই যে, ওর জন্ম হোলো আমারই ঘরে। না পারলেম শেষ পর্যন্ত পড়াতে, না পারলেম একবার বাইরে পাঠাতে। ওর রেডিও-বক্তৃতা শুনে যখন লোকে জিজ্ঞেস করে—ও কতদিন বিলেতে ছিল, আমার কান্না পায়।" মাসীমা অশ্রুরোধ করতে আবার বিড়ালটার গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

"এ তো আরও আনন্দের কথা মাসীমা যে, দেবেশ আরও অনেকের মতো সুযোগ না পেয়েও অনেকের চাইতে ভালো করেছে।"

"জানি বাবা সে কথা। ভগবানকে সেজন্যে প্রণামও কম জানাই নে। কিন্তু কেবলই মনে হতে থাকে, সুযোগ পেলে ও

আরও কত অসাধারণ হতে পারত। বিধাতা ওকে এত ক্ষমতা দিলেন, কিন্তু সুখ দিলেন না এক কণাও!"

এবার আর অশ্রু বাধা মানল না।

"সুখ বস্তুটাই বোধ হয় অমন মাসীমা। প্রতিভার সঙ্গে ওর চিরকালের বিরোধ। আমরা, প্রতিভাহীনেরা, দেখুন না, হেসে খেলে আনন্দে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু মাঝে-মাঝে দেবেশকে যে ঈর্ষা করি নে এমন কথাও বলতে পারি নে।" অশ্রুভারাক্রান্ত আবহাওয়াটায় হালকা সুর এনে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেম, কিন্তু নিজেরই কানে কথাটা বেসুরো শোনাল। ভাল কথা গেঁথে যে দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না—এ কথা পরবর্তীকালেও বহুবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। নিঃশব্দ শ্রবণ তার চেয়ে ভালো। চুপ করে রইলেম। মাসীমাও তাই।

কিন্তু ঘরটা ভরে রইল এমন একটা শব্দহীন আর্তনাদে যা কানে শোনা যায় না, কিন্তু মর্মে পৌঁছায়—যেন আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। একবারও এ কথাটা মনে আসে নি যে, যার বেদনার গভীরতা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে তার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো ইতিহাসই আমার জানা নেই। একবারও এই অতি-স্বাভাবিক প্রশ্নটা মনে জাগে নি যে, কী জন্যে শোক করছি? বা কার জন্যে? দেবেশের জন্যে, না, মাসীমার জন্যে? মাসীমার বেদনার না হয় অস্পষ্ট একটু আভাস পেলেম, কিন্তু দেবেশের? কী তার দুঃখ? এ প্রশ্নগুলো তখন মনেই আসে নি। এমন কি, মাসীমাকে

জিজ্ঞেস করবার কথাটা পর্যন্ত মনে হয় নি। শুধু আমার সমস্ত অন্তরটা পরিব্যাপ্ত হয়ে রইল স্বল্পজ্ঞাত সুহৃদের অজ্ঞাত বেদনায়।

মাসীমাই অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করে কি রকম অবাস্তব একটা স্বরে বললেন, "দেবু আমার বড়ো একা। তুমি শুনলে হাসবে, কিন্তু আমি ওর একমাত্র সঙ্গী। কিন্তু আমি তো আর চিরদিন বাঁচব না, তার পরে আমার এই অসহায় ছেলেটার যে কী হবে তাই ভেবে এক মুহূর্ত শান্তি পাই নে।"

"সেটা এমন আসন্ন একটা সম্ভাবনা নয় মাসীমা, যে তাই নিয়ে এখনই অশান্তি পেতে হবে।"

"নয়ই বা বলি কী করে? কবে কখন যে ডাক আসবে, তা তো আর আগে থেকে জানবার উপায় নেই।"

"তা হলে তা নিয়ে আগে থেকে ভাববারও দরকার নেই।"

"মানুষের মন কি আর দরকারের আইন মেনে চলে বাবা? মনে জোর করে ঠিক করতে পারি যে ওই কাজটা করব না; কিন্তু এমন তো হয় না যে জোর করে বলব—ওই কথাটা ভাবব না। তাই দেবুর ভবিষ্যতের কথাটা সারাক্ষণ না ভেবে পারি নে।"

আমার কৌতূহল উদ্দীপিত হোলো। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করতে বাধল। দেবেশ নিজে যা আমায় কখনও বলে নি, এবং সেটা ওমিশন হতেই পারে না, তখন তার মার কাছে জিজ্ঞাসার শোভনতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। মাসীমা নিজেই বললেন, "তোমাকে এত কথা বলছি কেন জানো, দেবুর সঙ্গে

এ নিয়ে একটাও কথা কইতে পারি নে। কথা তুললেই বলে, 'রেডিওটা একটু খোলো মা। বাজে প্রোগ্রামই একটু শোনা যাক। কী দুর্ভাগ্য দেখ, কলকাতার সব চাইতে ভালো প্রোগ্রাম শোনা থেকে আমি বঞ্চিত—বিধান রায়ের অসুখ করলে যেমন তাকে বঞ্চিত হতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারের চিকিৎসা থেকে।' হয় কথা এড়িয়ে যাবে, তা নয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে।"

"উড়িয়ে দিতে পারলেই সুখ মাসীমা।"

"কিন্তু এড়িয়ে গিয়ে যে নিস্তার নেই বাবা। দেবু সেদিন কার যেন একটা ইংরেজী কবিতা আমায় পড়ে আর বাংলা করে শোনাচ্ছিল,—সেই যাতে স্বর্গের কুকুর মানুষকে ধাওয়া করেই চলেছে। স্বর্গের কুকুরের সম্বন্ধে যা সত্য, নরকের কুকুর, দুঃখের কুকুরের সম্বন্ধে তা বোধ হয় আরও সহস্রগুণ বেশি সত্য। তার হাত থেকে রেহাই নেই।"

মাসীমার বাক্‌কুশলতায় বিস্মিত হয়ে গেলেম। অনুচ্চ কণ্ঠে অনিশ্চিত স্বরে বললেম, "ওর জন্যে ভাববেন না, মাসীমা। প্রতিভা তার আত্মরক্ষার জন্যে আপনি দুর্গ রচে, সেই দুর্গের দ্বারে এসে দুঃখের কুকুর চীৎকার করতে পারে, ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।"

"আজ সেটা খুবই সত্য, তাই দেবু আজও হাসে, কাজে মন দিতে পারে, পড়ায় প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু একদিন যদি দুর্গের দেয়াল ধ্ব'সে যায়, সেদিন—।" মাসীমা শেষ করতে পারলেন না। অশ্রু গোপন করতে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার

দিকে যেতে যেতে বললেন, "দেখি, দেবু এলো কি না! ও যদি জানতে পারে যে, আমি ওরই কথা নিয়ে তোমার কাছে কান্নাকাটি করেছি, তা হলে আর রক্ষে রাখবে না আমার।"

অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললেন, "বাণী চলে যাওয়ার পর থেকে দেবু আমার কি রকম যেন হয়ে গেছে। বাড়ির বাইরে কী করে জানি নে, কিন্তু বাড়িতে সর্বক্ষণ বই নিয়ে পড়ে থাকে। পড়াশুনো ও বরাবরই বেশি করে, তাই নিয়েই তো আমার এত গর্ব, কিন্তু এ যেন আগের মতো নয়।"

রেডিও-স্টেশনের প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটা আমার স্মৃতিতে ফিরে এলো—জীবনে বাঁচা থেকে যারা বঞ্চিত ইত্যাদি। আজ কিছুটা যেন বুঝতে পারলেম যে, দেবেশের বেদনাটা কোথায়, কেন না, কী যেন একটা প্রসঙ্গে এই বার্ত্তাটা সংগ্রহ করেছিলেম যে, বাণী দেবেশেরই স্ত্রীর নাম। তার বেশি তখনও জানি নে, কিন্তু বেশি জানবার কৌতূহল দমন করে মাসীমাকে বললেম, "পড়াশুনো তো যত করা যায় ততই ভালো মাসীমা।"

"তা কি আর আমি জানি নে বাবা দেবুর মা হয়ে? কিন্তু আজকাল কেবলই ভয় হয়। বই নিয়ে দেবুকে বসে থাকতে দেখলেই ভাবি, সুখের বদলি হিসেবে বইয়ের মূল্য কত অকিঞ্চিৎকর! আগে ও বই পড়ত পড়ার আনন্দে, আজ যেন পড়ে অন্য কিছু থেকে পালাবার জন্যে। ওর পাণ্ডিত্য আর যাকেই ভোলাক, মাকে কি ভোলানো যায় বাবা? আমি সব বুঝতে পারি।"

আমার কাছে কিন্তু সবটাই প্রায় ধাঁধা হয়ে রইল। এদের বেদনার অংশীদার হলেম, কিন্তু জানতে পেলেম না সেই বেদনার প্রকৃতি। শোভনতার সন্দেহ বিসর্জন দিয়ে বললেম, "কিন্তু বাণী এখান থেকে চলে—"

আমার প্রশ্ন শেষ করবার আগেই দেবেশের পদধ্বনি শোনা গেল। মাসীমা সভয়ে অধরে তর্জনী স্থাপন করে নৈঃশব্দ্যের আজ্ঞা জারি করলেন এবং, দেবেশ যাতে শুনতে পায়, একটু জোরেই বললেন, "ওই দেবু এলো।" কেন জানি না, সচকিত মাসীমার সন্ত্রস্ততা যেন আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হোলো। দরজায় এলেই বললেম, "তুমি ও-রকম জুতো পরো কেন বলো তো, যার শব্দ দু মাইল দূর থেকে শোনা যায়?"

উচ্চহাস্যে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললে, "ইচ্ছে করেই পরি এবং তার কারণ বহুবিধ। মাল্‌টিপ্লিসিটি অব কজেস।"

বিড়ালটা দেবেশের পায়ে মাথা ঘষতে লাগল।

"যথা?"

"প্রথম কারণটা স্বার্থপর। একা যখন পথ চলি এবং নিজের চলার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাই নে, তখন বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করি। ভালো লাগে না। জুতোর শব্দ, নিজের জুতোর হলেও, সঙ্গ দেয়।"

হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেম, "এর আবার পরার্থপর কোনো কারণ আছে নাকি?"

"আছে বইকি। এই দেখ না, আমার জুতোর শব্দ শুনে

তুমি আর মা সতর্ক হতে পারলে এবং আমার বিরুদ্ধে দুজনে মিলে যে ষড়যন্ত্র করছিলে, তার আভাস মাত্র আমায় দিতে হোলো না। বলো, ঠিক কি না, আমাকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল না ?"

"আরে দূর ?" আমি সত্যগোপনকে যতদূর সম্ভব বিশ্বাস-যোগ্য করতে চেষ্টা করলেম,—"আমাদের কথা হচ্ছিল তোমার ওই বিড়ালটাকে নিয়ে।"

"বিড়ালটা বোলো না ভাই, বলো স্যালি।" দেবেশ জন্তুটাকে সস্নেহে কোলে তুলে নিলে। তার গায়ে এমন পরমাদরে হাত বুলোতে লাগল যেন ফোস্কা পড়েছে আমার অসঙ্গত সম্বোধনে।

"বিড়ালকে বিড়াল বললেও দোষ ?"

"না না, দোষ নয়। কিন্তু, ধরো, তোমাকে যদি কেউ 'লোকটা' বলে, তোমার কি ভালো লাগবে ? তা ছাড়া ওর যখন সুন্দর একটা নাম রয়েছে ডাকবার মতো।"

নামতত্ত্বে রন্ধ্রের সন্ধান করলেম দেবেশের বাক্যব্যূহ থেকে, বললেম, "হঠাৎ 'স্যালি' নাম রাখলে কেন ?"

"হঠাৎই বটে। ও যেদিন আমার বাড়ি এলো—তারিখটা পর্যন্ত মনে আছে, পয়লা ফেব্রুয়ারি, তখন আমি ন্যাট গাবিন্‌সের কী যেন একটা পড়ছিলেম। তৎক্ষণাৎ ওর নামকরণ হয়ে গেল—স্যালি। আমার বাড়ি হোলো ওর বাড়ি।"

হঠাৎ গলা খাটো করে দেবেশ বললে, "এখানে পেয়ালা

দেখেই বুঝতে পারছি যে, তোমার চা খাওয়া হয়ে গেছে। আর এক কাপ খাও।”

“থাক্, অত অতিথিসৎকার করতে হবে না।”

“আহা, তুমি কিছুতেই বুঝবে না। এরও কারণ মাত্র অংশত পরার্থপর। স্বার্থপর অংশটা হচ্ছে এই যে, তুমি খেলে আমিও এক কাপ চাইতে পারি।”

হেসে সম্মতি জানাতেই দেবেশ চেঁচিয়ে উঠল, “মা, অতিথিকে এক কাপ চা দাও। আমাকেও আধ কাপ দিয়ো মা, তা নইলে একা একা চা খেতে ওর বোধ হয় খারাপ লাগবে।” অজুহাতটা যে একান্তই খঞ্জ, দেবেশের নিজেরও তা বুঝতে বাকি রইল না।

পুনরায় বিড়ালে মনোনিবেশ করে লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করল। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপনের ত্রস্ততায় বলল, “রাস্‌কিনের একটা দিক ছিল বিদ্বেষে ভরা। আমার অত মানব-বিদ্বেষ নেই। আমি তাই ওর কুকুর সম্বন্ধীয় উক্তিটা কিঞ্চিৎ বদলে নিয়ে আমার স্যালি সম্বন্ধে প্রয়োগ করি, বলি, দি মোর আই সী অব ডগ্‌স্, দি মোর আই লভ মাই ক্যাট।” নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে শিশুর মতো হাসতে লাগল দেবেশ। কিন্তু ওর মস্তিষ্ক যে ততক্ষণ রাস্‌কিন-তথ্য নিয়ে গবেষণা করছিল অচিরেই তা বোঝা গেল।

“ভালো কথা, রাস্‌কিন প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, এফি গ্রে-র নাতি, অ্যাড্‌মিরাল কী যেন, একটা বই লিখেছে—ইতিহাসের কাঠগড়ায় তার দিদিমার নির্দোষিতা প্রমাণ

করতে। বইটা বোধ হয় বেরোয় নি এখনও, তুমি একটু থ্যাকার্সে-নিউম্যানে খোঁজ নিও তো। বইটা ভালো হওয়া উচিত। পুওর রাস্‌কিন!"

না, আর আমার সমবেদনার অপচয় করব না। সারাটা সন্ধ্যা মাসীমা ও দেবেশের অজ্ঞাত দুঃখ নিয়ে ব্যথিত হয়েছি। রাস্‌কিনের জন্যেও যদি অশ্রু বিসর্জন করতে হয় তো না জেনে করব না। এখানে তো আর শোভনতার বালাই নেই, তা ছাড়া দেবেশের কাছে আমার ইংরেজী সাহিত্যে অজ্ঞতা নিয়ে লজ্জা নেই। লজ্জা করলেই লজ্জা। জিজ্ঞাসা করলেম, "হঠাৎ পুওর রাস্‌কিন কেন?" তাঁর কুকুর-প্রীতির কথা স্মরণ করে যোগ করলেম, "কুকুরে কামড়ে দিয়েছিল নাকি?"

আমার পরিহাস ব্যর্থ হোলো। না হেসেই দেবেশ বললে, "না, কুকুর নয়, কুকুর তো শুধু ভেউভেউ করে ভয় দেখায়, কামড়ায় মানুষ।"

"রাস্‌কিনকে কে কামড়েছিল?"

"ঠিক জানি নে এখনও। ও নিজেও হতে পারে। এই অ্যাড্‌মিরাল ভদ্রলোকের বইটা পেলে হয়তো বোঝা যাবে। আমরা এখন পর্যন্ত তো শুধু এক তরফা শুনানী শুনেছি। তারও সবটা জানি নে আমি।"

"অর্থাৎ দেহি।"

"মোটামুটি ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, রাস্‌কিনের বিবাহিত জীবন—"

লক্ষ্য করলেম যে, শেষ দুটো কথা বলেই দেবেশ দরজার

কাছে একবার উঠে গেল দেখতে যে, মাসীমা আসছেন কি না। নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে আবার শুরু করলে, "বেচারীর বিবাহিত জীবনটা আদৌ সুখের হয় নি। মোটামুটি ঘটনাটা আমার যতদূর মনে আছে তা হচ্ছে এই যে, এফি গ্রের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। এফি তখন ছোট্ট মেয়ে, বছর কুড়ি বয়স হবে। বিবাহের প্রথম রাত্রেই রাস্‌কিন আবিষ্কার করলে যে, ওরা তুজন একেবারেই বিভিন্ন তুটো জগতের জীব, বাট ইট ওয়জ টু—টু লেট। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনেই তুজনের জীবনের ছন্দের যে ব্যত্যয় প্রত্যক্ষ হোলো, ক্রমে তা কুৎসিত সংঘর্ষে পরিণত হোলো। বছর সাতেক পরে বোধ হয়, এফি—হু ওয়জ এ পার্‌ফেক্টলি নর্‌ম্যাল্‌ বীয়িং হুইচ হার জন ওয়জ নট—এফি আর সহ্য করতে পারলে না। বিবাহ খারিজ হোলো এবং তার কিছুদিন পরেই সে আবার বিয়ে করলে মিলেই-কে। সে বিয়ে সফল হয়েছিল—ইন মোর সেন্সেস দ্যান ওয়ন, শি রেজড এ লার্জ ফ্যামিলি, এবং তার বাকি জীবন সুখে কেটেছিল।"

"আর রাস্‌কিন?"

"পাগল হয়ে গিয়েছিল। সার্ভ্‌ড্‌ হিম রাইট।"

তু হাতে তু পেয়ালা চা নিয়ে মাসীমা ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে পাগল হয়ে গিয়েছিল রে দেবু?"

"রাস্‌কিনের কথা বলছিলেম মা।"—আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল, "জানো, ভাবছি, একটু সময়

পেলে এই নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব, ঋষিকল্প মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত জীবনের অবিশ্বাস্য নির্দয়তা নিয়ে। এ নিয়ে যে একেবারে লেখা হয় নি তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সেই মহাপুরুষদের ঋষির দিকটা ভণ্ডামি, তা নয় তো অপর দিকটা ক্ষমণীয় স্খলন। আমার কাছে ওগুলো একেবারেই গোঁজামিলন বলে মনে হয়। আমি দেখাব যে, কোনোটাই ভণ্ডামি নয়! দুটো স্পষ্টতই পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু মানবচরিত্রই তো তাই। এমন তো অহরহই দেখছি যে, যে সেনাপতি বাড়িতে একটা পিপীলিকার উপর পদক্ষেপ করে মর্মান্তিক অনুশোচনায় জর্জরিত হন, তিনিই আবার রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র সৈনিককে আদেশ দেন সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্য নিধন করতে। অপর দিকে এমন লোকও নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়, যে সারাদিন অবলা-বান্ধব-সমিতি আর অনাথ আশ্রমে কাজ করে আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে গৃহিণীকে প্রহার করে। অথচ একই লোক কিন্তু। একই মন দুটো কাজেই প্রেরণা যোগাচ্ছে, এক জোড়া হাতই দুটো কাজ করছে। দুটোর কোনোটাই মিথ্যা নয়, কিন্তু দুটোই কী করে সত্য হবে? অথচ সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য। অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্ত্রীর প্রতি রাস্‌কিনের নির্দয় ঔদাসীন্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যাটা নিয়েই লিখব।"

মাসীমা এতক্ষণ মুগ্ধ এবং কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে শুনছিলেন। দেবেশ থামতে বললেন, "তা না হয় লিখবি,

কিন্তু তোর কালকের ব্রড্‌কাস্টের এক লাইনও তো লেখা হয় নি এখন পর্যন্ত।"

"তাই তো! এই স্নান করে খেয়েই লিখতে বসব।" জামাটা খুলতে খুলতে বলল, "বসব তো, কিন্তু লিখব কী? তিনটে বই রিভিউ করতে বলেছে, তিনটেই এত বাজে যে সত্য কথা বললে গ্রন্থকাররা আমায় মারতে আসবে।"

আমি ওদের অলক্ষ্যে ঘড়ি দেখে বললেম, "আচ্ছা দেবেশ, তুমি তোমার কাজ করো। আমি এবার উঠব।"

দেবেশ এরই মধ্যে তার বেতারের পুস্তকালোচনায় কী বলবে, তার চাইতে বেশি কী বলবে না, তাই নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিল। অন্যমনস্ক হয়ে সম্মতি জানাল। মাসীমা আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসতে আসতে বললেন, "দেবু এসে পড়ল, তোমার সঙ্গে তাই আমার কথাটা হতে পারল না। তুমি কাল সন্ধ্যায় এসে এখানেই চা খাও না!"

"কিন্তু কাল তো দেবেশ বাড়ি থাকবে না। ন-টায় না ওর ব্রড্‌কাস্ট?"

"সেই জন্যেই তো আসতে বলছি। তা ছাড়া, বন্ধু ছাড়া মাসীমার কাছে কি আর আসতে নেই?"

"নিশ্চয়ই আসব। সাড়ে ছ-টা থেকে সাতটার মধ্যে।"

সে রাত্রে সারাটা পথ রাস্‌কিনের অভিশপ্ত দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবছিলেম। অর্থাৎ দেবেশের বিবাহিত জীবনের কথা।

আমি শুধু পরের বেলায় সময়ানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলি নে, নিজে তা অভ্যাস করি—যতদূর সম্ভব! পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে মাসীমার সঙ্গে কী কী কথা হয়েছিল আজ সবটা মনে নেই। স্মৃতি তো গ্রামোফোন-রেকর্ড নয় যে, যেমনটি বলা হয়েছিল ঠিক তেমনটি বাজবে যতদিন না তার আয়ু ফুরিয়ে আসে! স্মৃতির প্রাণ আছে, তার মৃত্যুও আছে। তার জীবদ্দশায় তাই তার পরিবর্তন ঘটে। গৃহীত কাহিনী বা ঘটনার উপর সে সম্পাদকের কাঁচি চালায়, চিত্রকরের তুলি বুলায়, কখনও কেটে বাদ দেয়, কখনও বা যোগ করে তার পছন্দসই নানা কথা।

মাসীমার আর আমার সেদিনকার কথাও তেমনি আমার সঠিক মনে নেই। শুধু মনে আছে সেই অসামান্যা শক্তিমতী মহিলার উদ্বেল বেদনা এবং তার প্রকাশ দমন করবার সকরুণ প্রয়াস। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের ব্যর্থ বিবাহে মাতৃহৃদয়ে যে অপরিসীম বেদনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তার নিতান্ত আংশিক একটু আভাস মাত্র সেদিন আমার হৃদয়কে এমন গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল যে মাসীমাকে সান্ত্বনা দেবার সামান্যতম শক্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিল না। তাঁরই অনুরোধমতো শুধু এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেম যে, সুযোগ হলে একদিন দেবেশের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করব। সমাধানের চেষ্টা করব।

নিশ্চয় জানতেম যে, সাফল্যের সুদূরতম সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু মাসীমার কাছে সেদিন আমার চেষ্টা করবার প্রতিশ্রুতি না দেওয়া সম্ভব ছিল না।

আবেগবশে প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত করবার সুযোগ সন্ধান করেছিলেম তার পরে অনেক দিন। সুযোগ হয় নি। প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা ক্রমে দুরূহ থেকে দুরূহতর হতে থাকল। তার গৌণ কারণ হচ্ছে এই যে, দেবেশের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সংখ্যা স্বল্প হতে স্বল্পতর হতে থাকল। মুখ্য কারণটা বিস্তৃততর ব্যাখ্যানসাপেক্ষ।

মনে আছে, আমি যখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শোকাচ্ছন্না মাসীমার কাছে আমার নির্বোধ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেম, তখনই ন-টা বাজল এবং দেবেশের বক্তৃতা শুরু হোলো। বক্তারই বাড়িতে বসে, বক্তারই মার সঙ্গে আমি সেই বক্তৃতা শুনছিলেম। মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেম।

কলকাতা কেন্দ্রের আরও একজন শ্রোত্রী যে আমাদের চাইতেও অনেক বেশি মুগ্ধ হয়ে সেই বক্তৃতাই শুনছিলেন, সে কথা আমার কানে পৌঁছেছিল অনেক দিন পরে।

চার

পরিচ্ছন্ন, বিস্তীর্ণ, কোমল শয্যা সম্মুখেই প্রসারিত ছিল। কিন্তু মালতীর ক্লান্ত দেহ তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল। জামা, কাপড়, জুতো, কোনো কিছু না ছেড়েই বসে পড়ল গদিওয়ালা আরাম-কেদারায়। শ্রান্তিতে চোখ মুদল। কিছু না করার শ্রান্তি, সে বড়ো দুঃসহ। ভূমি কর্ষণ করে চাষী তার ঘর্মাক্ত দেহ বৃক্ষচ্ছায়ায় স্থাপন করে তৃপ্ত হৃদয়ে নিরীক্ষণ করতে পারে শস্যসম্ভবা ধরণীর বিস্তৃতিকে। কিন্তু সে কী দেখবে, যে করেছে শুধু ধূলিকর্ষণ? উষর মরু দেবে কোন্ ফসলের স্বপ্ন?

গত তিনটে মাস তবু ভালো ছিল। মাথার উপর দোদুল্যমান ছিল আসন্ন পরীক্ষার উদ্যত খড়্গ। প্রতিটি জাগ্রত প্রহর ভাগ করে দেওয়া ছিল এম, সেন বা এ, এল, ব্যানার্জি বা সেন অ্যাণ্ড দাসকে। তার একটা মুহূর্ত অবশিষ্ট ছিল না মালতী গুপ্তার জন্যে। সেই বুঝি ছিল ভালো।

কিন্তু কাল শেষ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এখন কী করবে মালতী? কী দিয়ে ভরবে তার অফুরন্ত অবসর, তার নিঃসীম শূন্যতা? কী করে কাটবে সামনের ধূ-ধূ করা দীর্ঘ দিনগুলি? পাঠ্য বই পড়া ঘুচেছে, চোখ দুটো বিশ্রাম অর্জন করেছে। এখনই আবার পড়া, হোক তা গল্পের বই, আরম্ভ করবে না মালতী। লিখবে? পাঠকের জন্যে নয়, নিজের জন্যে। কিন্তু লিখবে কী?

মালতীর আপন অভিরুচি পত্র-রচনায়। দীর্ঘ পত্র, পাতার পর পাতা। তাতে প্রয়োজনীয় কোনো বার্তা থাকতে পাবে না। আর যদি বা থাকতেই হয় তবে তা একেবারে শেষে, 'পুনশ্চ' শিরোনামার তলায়। অনাহূতের মতো অবহেলিত। যখন অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে, তখন লিখবে সেই অকারণ বেদনার কথা। আবার যখন দোলে মন দোলে অকারণ হরষে, তখন সেই অকারণ হরষের কথাই লিখবে। বেদনাই হোক বা হরষই হোক, তাদের অকারণ হওয়া চাইই চাই।

মালতী চিঠি লেখার কাগজ নিয়ে বসল।

কাগজের পাশেই ছিল অনেকগুলো খাম। সেদিকে চোখ পড়তেই মালতীব মন দ'মে গেল। চিঠি লেখা মানেই তো কাউকে-না-কাউকে লেখা। খামের উপর টিকিট না দিলেও চিঠি সব সময় উদ্দেশ্যহীন হয়ে হারিয়ে যায় না, কিন্তু ঠিকানা লিখতেই হয়। ঠিকানাহীন চিঠি একেবারেই ব্যর্থ, যেমন ব্যর্থ অকথিত বাক্য বা অগীত সঙ্গীত।

কার ঠিকানা লিখবে মালতী? কার কাছে লিখবে তার অকারণ আনন্দ-বেদনার কথা? মালতীর মনের দিগন্তে অনেকগুলি নাম-নক্ষত্রের উদয় হোলো। কিন্তু এটাও ঠিক যেন মনঃপূত হোলো না।

সাধারণত বাবাকে চিঠি লিখতে ভালো লাগে মালতীর। কিন্তু আজ যে রকমের কথা লেখবার জন্যে তার মন উতলা হয়েছে, তা বাবাকে লেখা যায় না। মাকে লিখলে মা হয়তো

মনে করবে, মালতীর মানসিক সুস্থতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুলতা, শ্রীলতা, ইলা, এদের লেখা চলত হয়তো; কিন্তু এই ছোট বোনগুলোকে নিয়ে মুশকিল এই যে, ওদের শারীরিক ও মানসিক বয়স এখন কৈশোর ও যৌবনের সেই সন্দেহী সন্ধিক্ষণে আছে, যখন মালতীর ভাবোচ্ছ্বাস ওরা ভুল বুঝবে। তার চিঠিতে ওরা পড়বে ওদের নিজেদের ভীরু ও গোপন বাসনার অভিব্যক্তি। মনোমত অর্থ আরোপ করবে মালতীর পত্রের ছত্রে ছত্রে। তার উপর ইলাটা যা বেহায়া! হয়তো লিখে বসবে, দিদি, লোকটির নাম কী? না, ওদের লেখা চলবে না।

সরোজকে লেখা যেত। কিন্তু সে যে কলকাতায়। এত কাছের লোককে চিঠি লিখে সুখ নেই, তা ছাড়া সরোজকে লেখা আরও দু-একটা কারণে মুশকিল। ওর মনটা এখনও বড়ো অপরিণত। মালতীর চিঠি পেলে সে স্বর্গ পেয়েছে বলে মনে করবে। চিঠিটাকে পূজো করবে সারা রাত ধরে, সারা দিন ঘুরে বেড়াবে বুক-পকেটে নিয়ে। সরোজের পূজোয় মালতীর অরুচি হয়েছে কিছু দিন থেকে। বেচারীর জন্যে মায়া হয় মালতীর। বড়ো অল্পে খুশি ছেলেটা। কেমন আছ? —জিজ্ঞেস করলেই ধন্য হয়। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বড়ো অল্পে ব্যথা পায়। এই তো, আজ সন্ধ্যায় সিনেমা থেকে ফেরবার পরে ক্লান্ত মালতী যে সরোজকে বসতে বলে নি আরও কিছুক্ষণ, ও নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে কাঁদবে সেই জন্যে। মালতীকে দোষ দেবে না, রাগ করবে না মালতীর উপর। এত

মালতীর আপন অভিরুচি পত্র-রচনায়। দীর্ঘ পত্র, পাতার পর পাতা। তাতে প্রয়োজনীয় কোনো বার্তা থাকতে পাবে না। আর যদি বা থাকতেই হয় তবে তা একেবারে শেষে, 'পুনশ্চ' শিরোনামার তলায়। অনাহূতের মতো অবহেলিত। যখন অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে, তখন লিখবে সেই অকারণ বেদনার কথা। আবার যখন দোলে মন দোলে অকারণ হরষে, তখন সেই অকারণ হরষের কথাই লিখবে। বেদনাই হোক বা হরষই হোক, তাদের অকারণ হওয়া চাইই চাই।

মালতী চিঠি লেখার কাগজ নিয়ে বসল।

কাগজের পাশেই ছিল অনেকগুলো খাম। সেদিকে চোখ পড়তেই মালতীর মন দ'মে গেল। চিঠি লেখা মানেই তো কাউকে-না-কাউকে লেখা। খামের উপর টিকিট না দিলেও চিঠি সব সময় উদ্দেশ্যহীন হয়ে হারিয়ে যায় না, কিন্তু ঠিকানা লিখতেই হয়। ঠিকানাহীন চিঠি একেবারেই ব্যর্থ, যেমন ব্যর্থ অকথিত বাক্য বা অগীত সঙ্গীত।

কার ঠিকানা লিখবে মালতী? কার কাছে লিখবে তার অকারণ আনন্দ-বেদনার কথা? মালতীর মনের দিগন্তে অনেকগুলি নাম-নক্ষত্রের উদয় হোলো। কিন্তু এটাও ঠিক যেন মনঃপূত হোলো না।

সাধারণত বাবাকে চিঠি লিখতে ভালো লাগে মালতীর। কিন্তু আজ যে রকমের কথা লেখবার জন্যে তার মন উতলা হয়েছে, তা বাবাকে লেখা যায় না। মাকে লিখলে মা হয়তো

মনে করবে, মালতীর মানসিক সুস্থতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুলতা, শ্রীলতা, ইলা, এদের লেখা চলত হয়তো ; কিন্তু এই ছোট বোনগুলোকে নিয়ে মুশকিল এই যে, ওদের শারীরিক ও মানসিক বয়স এখন কৈশোর ও যৌবনের সেই সন্দেহী সন্ধিক্ষণে আছে, যখন মালতীর ভাবোচ্ছ্বাস ওরা ভুল বুঝবে। তার চিঠিতে ওরা পড়বে ওদের নিজেদের ভীরু ও গোপন বাসনার অভিব্যক্তি। মনোমত অর্থ আরোপ করবে মালতীর পত্রের ছত্রে ছত্রে। তার উপর ইলাটা যা বেহায়া! হয়তো লিখে বসবে, দিদি, লোকটির নাম কী? না, ওদের লেখা চলবে না।

সরোজকে লেখা যেত। কিন্তু সে যে কলকাতায়। এত কাছের লোককে চিঠি লিখে সুখ নেই, তা ছাড়া সরোজকে লেখা আরও ছু-একটা কারণে মুশকিল। ওর মনটা এখনও বড়ো অপরিণত। মালতীর চিঠি পেলে সে স্বর্গ পেয়েছে বলে মনে করবে। চিঠিটাকে পূজো করবে সারা রাত ধরে, সারা দিন ঘুরে বেড়াবে বুক-পকেটে নিয়ে। সরোজের পূজোয় মালতীর অরুচি হয়েছে কিছু দিন থেকে। বেচারীর জন্যে মায়া হয় মালতীর। বড়ো অল্পে খুশি ছেলেটা। কেমন আছ? —জিজ্ঞেস করলেই ধন্য হয়। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বড়ো অল্পে ব্যথা পায়। এই তো, আজ সন্ধ্যায় সিনেমা থেকে ফেরবার পরে ক্লান্ত মালতী যে সরোজকে বসতে বলে নি আরও কিছুক্ষণ, ও নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে কাঁদবে সেই জন্যে। মালতীকে দোষ দেবে না, রাগ করবে না মালতীর উপর। এত

সাহস নেই। এত জোর নেই মনের। শুধু কাঁদবে। না, সরোজকে লেখা হবে না।

সরোজের পরে মালতীর মনে এলো সরোজের দাদার নাম—সকলের শেষে, সেই পুনশ্চর মতো। অনাহূতের মতো অবহেলিত, অনুপায়ে স্মরণীয়। তবে কি রুণুকে লিখতে বসবে? কথাটা মনে হতেই মালতীর পত্ররচনার সকল বাসনা যেন নিমেষে, নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। অথচ, তক্ষুণি মালতীর মনে হোলো, রুণুর নামই কি সর্বাগ্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল না? কিন্তু হয় নি; নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত সত্য এই মনে না-হওয়াটা। তা সে যতই অস্বাভাবিক হোক, অন্যায় হোক, দুঃখের হোক। আর দুঃখের কথাই যদি বলো—মনে যে হয় নি, এটা কি মালতীরই কম দুঃখ?

মালতীর চোখ পড়ল টেবিলের উপরের দশ বছর আগে তোলা জোড়া-ফোটোটার উপর। চিঠি লেখবার উৎসাহ আর রইল না। কাগজ কলম সরিয়ে রাখল। কাজ নেই কাউকে চিঠি লিখে। আলোটা নিবিয়ে দিল। অন্ধকারে বিজলী-পাখাটার একঘেয়ে শব্দটা সুর চড়িয়ে সুর মিলাল মালতীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে। একা, একা, বড়ো একা মালতী!

মালতী বৈচিত্র্যের সন্ধান করলে অন্ধকারে বেশ পরিবর্তনের চেষ্টা করে, জুতোটা খুললে, খুললে আরও যা যা খোলবার। পরল যা রাত্রে পরবার—সব অন্ধকারে, কিছু না দেখে। একটু ক্ষীণ কৌতুক বোধ করছিল মালতী। তারপর সে রেডিওটা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়ল কিছুক্ষণের জন্যে। রেডিওর ক্ষীণ

আলোটার স্তিমিত ভাতি মালতীর চোখকে পীড়া দিল না। একটু আশা দিল, একটু সঙ্গ বা। অন্ধকারের স্নিগ্ধতায় মালতীর বিষাদের তাপ কমল। গভীরতা বাড়ল। অন্ধকারের বিপুল গভীর ভাষা তার মনের মধ্যে মন্ত্রিত হয়ে উঠল; কিন্তু সে তো অন্ধকারেরই ভাষা, মানুষের নয়, মালতীর নয়। মালতী কাগজ-কলম কাছে টানল, কিন্তু আলো জ্বালল না। শুয়ে রইল, শুনতে থাকল অন্ধকারের ভাষা, অনুভব করতে থাকল অন্ধকারের বিপুল ওজন। ভারী, ভীষণ ভারী।

মালতী উঠে আলো জ্বালল। কাগজ-কলম নিয়ে বসল, নামাতে পারে যদি মনোভার। না, চিঠি নয়, অর্থাৎ চিঠিই, তবে বাইরের কারও কাছে নয়, নিজের কাছে। আর কারও পড়বার দরকার নেই। নিজেই লিখবে এবং নিজেই পড়বে। হ্যাঁ, পড়তে দিতে পারে, মনের মতো মন মিললে, মনের মতো মানুষ মিললে। মনে-মনে একবার তার পরিচিতির নাতিহ্রস্ব তালিকাটার দ্রুত পর্যালোচনা করলে, কিন্তু একজনকেও অমন মানুষ বলে মনে হোলো না। সমগ্র পুরুষ জাতিটার প্রতি মালতীর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হোলো।

মালতীর রচনায় রুচি আছে, স্বচ্ছন্দ গতি আছে। এ সম্বন্ধে সে সচেতন। নিজে এমন সুন্দর করে লিখতে পারে বলেই অন্যের কাছ থেকে অগোছালো চিঠি পেলে মালতীর বড়ো খারাপ লাগে। ভালো চিঠির ভালো উত্তর না পেলে কি ভালো লাগে? ধ্বনি কি খুশি হয় বিকৃত প্রতিধ্বনিতে?

রুণুকে নিয়ে এই বিপদ! লোকটার চিঠি পড়া এক শাস্তি! কু-বানান-কণ্টকিত সেই পত্রগুলিতে না থাকে কাজের কথা, না থাকে পড়বার মতো বাজে কথা। সামনের জোড়া-ফোটোটা সরিয়ে ঘুরিয়ে রাখল মালতী।

লিখল। প্রাণ ভরে লিখল আপন দুঃসহ শূন্যতার কথা। সর্বশেষ অনুচ্ছেদে উপসংহারে লিখছিল, সুরেন, সুরেশ, নির্মল, দীনেশ, সরোজ, রুণু—এরা সবাই বিভিন্ন। কিন্তু এদের সকলের সবগুলো গুণ যোগ করলেও যোগফল এক হয় না—অর্থাৎ এমন একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয় না, যাকে শ্রদ্ধা করতে পারি, ভালোবাসতে পারি। সত্যি, আমার আর সব বান্ধবীদের কথা ভাবি মাঝে মাঝে। ওদের তো বেশ ভালো লাগে অনেককে। ওরা বলে, আমার অহঙ্কার বড়ো বেশি। কি জানি! যাকগে, ছাব্বিশটা বছর এই ভালো-না-লাগা নিয়েই কেটেছে। আজ জীবনের (উঃ ভগবান! রুণুকে কতবার বলেছি যে জীবন লিখতে দীর্ঘ ঈ, জিবন নয়!) অপরাহ্নে (পঁচিশকে আমি মধ্যাহ্ন বলি) এসে আর পূর্বাচলের দিকে তাকিয়ে 'হায় হায়' করব না। এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে। বিধাতা যদি আবার আমায় এই পৃথিবীটায় পাঠাতে চান, তবে এর পরের বার আসবার আগে তাঁর কাছে এই একটি দাবি জানাব, যেন—

কে? মালতীর যেন মনে হোলো কেউ ডাকছে। দরজায় কে যেন ঘা দিল।

মালতীর হাত থেকে কলম খ'সে পড়ল। উঠে বসল।

তারপর দাঁড়াল। স্বপ্নাবিষ্টের মতো, স্পষ্টত কিছু না ভেবে, এগিয়ে গেল। দরজার দিকে নয়, মালতী জানত যে আর যেখানেই কেউ ঘা দিয়ে থাক্, ঘরের দরজায় দেয় নি। মন্ত্র-চালিতের মতো অবশ, শ্লথ হস্তে একটু জোরে করে দিল রেডিওটা। রেডিওটার উপর আস্তে হাত রেখে একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল। ঈষদুষ্ণ যন্ত্রটাকে জীবন্ত বলে মনে হল; সে যেন হাত রেখেছে একটা চলন্ত জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ডের উপর। কী নিয়ে বক্তৃতা হচ্ছিল মালতী বুঝতে পারলে না, বিশদভাবে শোনবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। কে বলছিল, তাও জানে না মালতী তখনও, ঘোষণাটা শোনে নি। কিন্তু বক্তার কণ্ঠোত্থিত প্রতিটা শব্দ সেই নিঃসঙ্গিনীর ক্ষুদ্র শয়নকক্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে এমন অদ্ভুত একটা পরিবেশের সৃষ্টি করলে যে মালতী আচ্ছন্ন ও অভিভূত বোধ করল। এ যেন বক্তৃতা নয়, আহ্বান। স্বর নয়, সুর। আলোচনা নয়, আলোড়ন।

বক্তৃতাটা শেষ হলে মালতী রেডিওটা বন্ধ করে দিল। আলোটা নিবিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। স্তব্ধ কণ্ঠের মুখর নৈঃশব্দ্য তখনও গুঞ্জন করছে মালতীর মনে। যেন একটা চেনা গানের সুর, যার কথাগুলো মনে নেই। বার বার তা মনে মনে গুনগুন করতে হয়, যদি কথাগুলো ফিরে আসে।

কে এই দেবেশ মুখোপাধ্যায়? বয়স কত? পঁচিশ, না, পঁচাশি? কণ্ঠে যার পঁচিশের তারুণ্য আর পঁচাশির গাম্ভীর্য? ভাষায় যার পঁচিশের সরসতা আর পঁচাশির পাণ্ডিত্য?

মালতী নামটাকে মনে মনে আবৃত্তি করলে একাধিকবার, না, এর আগে শোনে নি কখনও নামটা। তবু কেন কেবলই মনে হতে লাগল যে, এ দেবেশ মুখোপাধ্যায় আমার অপরিচিত নয়? আমার সঙ্গে চেনা এর বহু যুগের, বহু জন্মের?

প্রোষিতভর্তৃকার শূন্য দিগন্তের অন্ধকার ভেদ করে সে রাত্রে যে নক্ষত্রের উদয় হোলো, মালতীর শীর্ণা নদীতে সে আনল ভরা স্রোতের প্রতিশ্রুতি।

কে এই দেবেশ মুখোপাধ্যায়?

মালতীর সমগ্র সত্তাকে অভিভূত করে দিয়ে তার হৃদয়কে বিকশিত পদ্মের মতো ভ্রমরপিয়াসী করে তুলল যে, সে একটি ব্যক্তি নয়, দেহহীন কণ্ঠ মাত্র।

কে এই দেবেশ?

বহুদিনের বিস্মৃত তৃষা ও নিদ্রিত ক্ষুধা জাগ্রত করে দিয়ে যে-স্বর স্তব্ধ হোলো, তার গুঞ্জন মালতীকে অনাহত বীণার মতো মূর্ছনাব্যাকুল করে তুলল।

কে এই লোকটা?

মালতীর মন স্বরসন্ধান করতে থাকল বাকি রাতের অনেকগুলি অনিদ্রাক্রান্ত প্রহর।

পাঁচ

দেবেশের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও তার মার মনে এ ধারণা আজও দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে তার খাওয়ার সময় তিনি উপস্থিত না থাকলে সে অর্ধভুক্ত থাকবে। আজকাল আর প্রতিবাদ করে না দেবেশ। লাভ নেই। বলে, মা, তুমি আইনস্টিনের সবচেয়ে বড়ো শিষ্যা। সময়ের রিলেটিভিটিতে তোমার মতো বিশ্বাসী আর নেই। তোমার বেলায় সময় এমনই জোরে তোমায় তাড়া করছে যে তুমি রোজই বলবে—আমি আর ক'দিন? আমার বেলায় সময় দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। তোমার কাছে আমি বোধ হয় কখনোই মেজরিটি-প্রাপ্ত সাবালক হব না।

মা আর ছেলে একসঙ্গে হেসে উঠে।

আপিস-ফেরত দেবেশ একদিন সন্ধ্যায় যথারীতি বই পড়তে পড়তে চা পান করছিল। সামনের খাবারের থালাটা যেন হস্তদ্বারা স্পৃশ্য নহে। মা জানেন ছেলেকে খাওয়াবার কৌশল। বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমীর কাহিনী আজকাল আর তেমন কার্যকরী নয়। কিন্তু কথা ক'য়ে গল্প ব'লে দেবেশকে অন্যমনস্ক করে দেওয়া আজও তাকে খাওয়াবার শ্রেষ্ঠ উপায়। মা টেবিল গোছাবার ছলে থালাটা চায়ের পেয়ালার একেবারে কাছে স্থাপন করে দিয়ে বললেন, "আজ গিয়েছিলেম রুনুদের বাড়ি।"

"তাই নাকি ?" দেবেশ অন্যমনস্ক ছিল। অর্থাৎ অধ্যয়ন-মনস্ক। মার সে কথা জানতে বাকি রইল না।

"রুনু কে বুঝলি তো ?"

"রুনু ? কই, মনে পড়ছে না তো !"—ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জিত হোলো দেবেশ।

"তোর অবিশ্যি মনে না থাকবারই কথা। তুই তখন অনেক ছোট, আমরা তখন ডুমকায়। আমাদেরই বাড়ির পাশে ছিল ডেপুটি-কলেক্টরের বাংলো। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে 'দিদি' ডাকতুম। প্রায় সাত বছর আমরা একসঙ্গে ছিলেম ডুমকায়। তারপর অনেক দিন দেখাশোনা নেই, কোনো খবরও জানতুম না। সেদিন হঠাৎ কালীবাড়িতে দেখা হয়ে গেল। অনেক করে বললে একদিন ওর বাড়ি যেতে, লেক প্লেসে। আজ তাই গিয়েছিলেম একবার।"

দেবেশের কৌতূহল ছিল না এত বিশদ ইতিহাসে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, "রুনু কেমন আছে ?

"বলতে পারল না ওরা। অনেকদিন নাকি চিঠি আসে নি।"

"ও, এখানে নেই বুঝি ?"

"না, শেষ চিঠি এসেছে কায়রো থেকে।"

"কায়রো কেন ?"

"রুনু যে আর্মিতে কর্নেল এখন, কর্নেল রণেন গুপ্ত।"

"রণেন যার নাম, রণাঙ্গনই তো তার যোগ্য স্থান।

বিদেশে বড়ো চাকরি, ভাগ্যবান বটে।" ঈর্ষামুক্ত নির্লিপ্ততায় শেষ কথা বলে দেবেশ আবার বইয়ে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করল। মার গল্প কিন্তু শেষ হয় নি।

"ভাগ্যবানই হোক, আর যাই হোক, বেচারী বউটির জন্যে বড়ো কষ্ট হয় কিন্তু। ভারী ভালো মেয়ে মালতী। সারা দিন একা-একা থেকে এমন মনমরা হয়ে গেছে যে দেখলে মায়া হয়। শ্বশুর থাকেন আপন মনে—যক্ষ আরও টাকা করবার জন্যে আইনের বইয়ের নোট না কী যেন লিখছে। এদিকে শাশুড়ী আছেন তাঁর পূজো-আর্চা নিয়ে। তাদের কারুরই সময় নেই আর কিছুর জন্যে। বাড়িতে আর একটা প্রাণী নেই, যার সঙ্গে মালতী একটু কথা কইতে পারে বা গল্প করতে পারে। নীচের ছোট ঘরটায় বেচারী একা-একা থাকে। রেডিও শোনে আর বই পড়ে।"

শেষ কথাটা শুনে দেবেশ কৌতূহলী হোলো, কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করল না।

"আমি বেশির ভাগই মালতীর ঘরে বসেছিলেম। বেচারী এমন একা-একা থাকে যে কেউ গেলে আর আসতে দিতে চায় না। ভারি ভালো লাগল মেয়েটিকে। আসতে বলেছি একদিন।"

দেবেশের চোখ ছিল বইয়ের পাতায়, কিন্তু কান ছিল মায়ের দিকে।

"ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে একটা।"

দেবেশ বুঝল, এবারে একটু কৌতূহল প্রকাশ না করা অন্যায় হবে। বলল, "কী ব্যাপার?"

"মালতীর সঙ্গে রেডিও নিয়ে কথা হচ্ছিল। ঘরের রেডিওটা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলেম, 'তুমি খুব রেডিও শোনো বুঝি?'

'কী আর করব? কিন্তু সারা দিনই এত বাজে প্রোগ্রাম হয় যে শুনতে ইচ্ছে করে না।'

'কোনো প্রোগ্রামই ভালো লাগে না বুঝি?'

'রবীন্দ্র-সঙ্গীত মাঝে মাঝে বেশ ভালো হয়। হেমন্ত, সুচিত্রা—এদের গান বেশ লাগে।'

'বক্তৃতা বুঝি একেবারেই শোনো না?'

'খুব কম। বেশির ভাগই এত বিশ্রী বলে যে শুনলে মাথা ধরে।' একটু থেমে বললে, 'তবে সেদিন হঠাৎ খুব সুন্দর একটা ইংরেজী বক্তৃতা শুনছিলেম। অদ্ভুত ভালো লাগছিল। এত ভালো যে লোকটাকে নিশ্চয়ই ওরা আর প্রোগ্রাম দেবে না।' খুব হাসছিল মালতী। আমি তখনও তোর কথা কিছু বলি নি, কিন্তু মনে মনে ঠিক জানতুম কার কথা বলছে। জিজ্ঞেস করলেম, নাম কী বলো তো? মালতী বললে, 'নতুন কেউ, এর আগে কখনও শুনি নি এর গলা। দেবেশ মুখোপাধ্যায় বোধ হয় নামটা। এত সুন্দর ভয়েস্ আগে কখনও শুনি নি!'

মার মুখে মহৎ গৌরবের মৃদু হাসি।

দেবেশ এক অপরিচিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় নিরতিশয় খুশি হোলো। হেসে বলল, "মহিলার রুচিটা ভালোই বলতে হবে।"

"তোর বক্তৃতা ভালো না লাগলেই বুঝি রুচি খারাপ ?"

—মা প্রতিবাদের ছদ্মবেশে প্রচণ্ড সমর্থন ঘোষণা করলেন।

দেবেশ বইয়ে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু মনে থাকল অপরিচিতা অনুরাগিণীর কথা। মা তাকে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। হয়তো এমন সময় সে আসবে যখন দেবেশ বাড়ি নেই। দেবেশের একটা প্রিয় থীসিস্ হচ্ছে এই যে, বিশ্বকর্তা বিধাতার ক্ষমতা এবং করুণা অসীম হতে পারে—তাঁর রসবোধ, বিশেষ করে ড্রামাটিক সেন্‌স্ বড়ো অল্প। যখন যেটা ঘটা দরকার, যখন যা হলে জীবনটা সুপরিকল্পিত নাটকের মত সুষ্ঠু রূপ পেতে পারে, তখন তা কিছুতেই হবে না। ঠিক ঘটনা ঘটবে ভুল সময়ে বা ভুল ঘটনা ঠিক সময়ে। বিশ্বসৃষ্টির ও বিশ্বশাসনের ব্যাপারে ঈশ্বর দেবেশকে অবৈতনিক উপদেষ্টার পদে নিয়োগ করেন নি বলেই যে পৃথিবীর যা কিছু ত্রুটি, দেবেশের মনে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সেই সন্ধ্যায় মালতীর অনুপস্থিতি ঈশ্বরের অরসিকতার আরো একটা অকাট্য প্রমাণ বলে মনে হোলো দেবেশের কাছে।

ঈশ্বরকে দেবেশ বহুদিন পূর্বেই 'ইনকরিজিব্‌ল' বলে আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে সে আশা ছাড়ে নি এখনও। ঈশ্বরকে সে অমানুষ মনে করত, তার সম্বন্ধে তাই গবেষণা করে বৃথা কালক্ষয় আর সে করবে না। কিন্তু মানুষের প্রতিশ্রুতি অপরিসীম, নিখুঁত দেবতা হবার যোগ্যতা আছে তারই। ত্রিশ কোটি ত্রুটিশীল দেবদেবীর পূজো করার চাইতে চল্লিশ কোটি নিখুঁত ভারতীয় তৈরি করা অনেক বেশি

জরুরী। সেই মহতী প্রচেষ্টায় দেবেশের প্রতিজ্ঞা, ‘আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।’

সে চেষ্টা একক হতে হবে—ইণ্ডিভিডুয়্যাল সত্যাগ্রহের মতো। পুঞ্জীভূত অশুভের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। ভ্যাটিকান আর ক্রেমলিন তুইই ব্যর্থ। নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করতে হবে। দল বাঁধলেই গোল বাধে। একা যে ভালো, একত্রে সে-ই মন্দ। একটা মানুষ আর একটা মানুষের যোগফল তুটো মানুষ নয়। গণিতের আইনের পরোয়া করে না মনুষ্যচরিত্র। জোট বাঁধলেই জট পড়ে। সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। একলা চল রে, আর কাউকে ডেকেই কাজ নেই।

দেবেশের::চিন্তাধারা সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে প্রবাহিত হোলো না। আপন চিন্তা স্থগিত রেখে পরের ।চন্তার ভাগ নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু মন বসল না। বই খোলা রইল, কিন্তু মন রইল বিমনা। দেবেশ ভাবতে থাকল, প্রশংসার মতো শত্রু আর নাই। স্তুতি মানুষের বিচারবুদ্ধি শেষ করে দেয়। তা নইলে জনসন বস্‌ওয়েলের মত ‘বোর্’কে সহ্য করত কী করে? রবীন্দ্রনাথ কী করে :সহ্য করতেন তাঁর পারিষদ্‌দের, গান্ধী প্রশ্রয় দিচ্ছেন নানা ভণ্ড ভক্তদের? দেবেশ নিজের মধ্যেও অনুরূপ তুর্বলতা আবিষ্কার করে অনুতপ্ত হোলো। অপরিচিতা মালতীর প্রশংসায় সে যে কিছুক্ষণের জন্যে পুলকিত হয়েছিল, সে জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিল।

অথচ দেখ,—দেবেশ কোনো প্রশ্নেরই সব দিক বিবেচনা

না করে ছাড়বে না,—মালতী যদি তার বক্তৃতার প্রশংসা না করে নিন্দা করত, তবে সে প্রথমে একটু দুঃখিত হোতো। তারপর প্রশ্ন তুলত মালতীর বিচারক্ষমতার পরিমাপ নিয়ে। তারপর সন্দেহ করত তার বিদ্যার গভীরতা এবং অবশেষে সদর্পে ঘোষণা করত যে মালতীর মতো অর্ধশিক্ষিতাদের যে তার বক্তৃতা ভালো লাগে না এইটেই তার উৎকর্ষের বৃহত্তম প্রমাণ। কিন্তু যেহেতু মালতী নিন্দা করে নি, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, দেবেশের মনে সে সকল প্রশ্নের উদয়ই হয় নি। ধরেই নেওয়া হয়েছে যে মালতীর মতো রসজ্ঞা, রুচিশীলা, বিদুষী আর নেই। *A priori* এবং *ex-hypothesi* সে অসামান্যা বুদ্ধিমতী এবং তার প্রশংসা অতিশয় মূল্যবান।

দেবেশের হাসি পেল নিজের ইদানীন্তন নির্বুদ্ধিতায়। নিজেকে নিজের কাছে নির্বোধ প্রতিপন্ন করে সান্ত্বনা পেল, খুশি হোলো। বইয়ে পুনরায় মনোনিবেশ করবার পূর্বে, নিতান্ত অনিচ্ছায়, ঈশ্বরকে পাসমার্কা দিল এই কথা ভেবে যে মালতী যে তখনই এসে পড়ে নি সে ভালোই হয়েছে।

কিন্তু বিধির বিধান জানবে তুমি এমন বুদ্ধিমান, তুমি কি এমনি বুদ্ধিমান?

দশ মিনিট যেতে না যেতেই মা যাকে নিয়ে উপরে এলেন, তাকে দেবেশ আগে কখনও দেখে নি, তার চেহারার কোনো বর্ণনা শোনে নি। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিপাতেই দেবেশের মনে সন্দেহের বাষ্পমাত্র রইল না যে, ইনিই মালতী। দেবেশ

বইটাকে হাত থেকে প'ড়ে যেতে দিল। প্রসারিত পা ছু'টো গুছিয়ে ভদ্র হয়ে বসল, জামাটার বোতামগুলো লাগাতে শুরু করল, তারপর উঠে চেয়ারটা এগিয়ে দিতে গেল।

মনে-মনে ঈশ্বরকে এক শ নম্বর দিল।

এই আকস্মিক কর্মতৎপরতায় মা বিস্ময় বোধ করলেন। সাধারণত দেবেশ থাকে তার উপরের ঘরে, এবং নীচের তলায় কোনো অতিথি এলো কি এলো না তার খবরই রাখে না। উপরে কেউ চলে এলে তাকে ট্রেস্‌পাসার বলে মনে করে। কিন্তু আজ? পরিচয়ের জন্যে পর্যন্ত অপেক্ষা নেই। এমন উৎসাহে অভ্যর্থনা জানাল, যেন সে মালতীরই প্রতীক্ষায় বসে ছিল।

সত্যি যে ছিল, তা মা অবশ্য জানবেনই বা কী করে? দেবেশ নিজেই কি জানত?

নীচের তলা থেকে ঠিক সেই মুহূর্তেই ডাক আসতে মাকে উঠতে হোলো, বললেন, "তুমি ব'স মালতী, আমি চা নিয়ে আসছি।"

দেবেশ চেয়ার এগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু নিজে তখনও আসন গ্রহণ করে নি। মালতীর উপবেশন-ব্যবস্থাটায় যেন উন্নতির অবকাশ আছে, বিচক্ষণ ব্যবস্থাপকের মত তাই পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ বলল, "আপনার চেয়ারটা ঠিক জায়গায় পড়ে নি। আমার ফ্যানটার অ্যাপিয়ারেন্স বৃহৎ কিন্তু পারফরম্যান্স বড় পুয়ার। ঠিক তলায় না বসলে হাওয়া পাওয়া যায় না। আপনি যদি একটু—"

মালতী নিতান্ত সংকুচিত হয়ে চেয়ারে বসে ছিল। একটু বিব্রত বোধ করছিল মাসীমার অত ত্বরিত অন্তর্ধানে। দেবেশের অনুরোধের উত্তরে বললে "না, না, বেশ হাওয়া পাচ্ছি। আপনি মিছিমিছি অত ব্যস্ত হবেন না।"

মালতীর উক্তিতে দেবেশ তৎক্ষণাৎ আত্মসচেতন হয়ে উঠল। গত কয়েক মিনিটের আতিশয্য পর্যালোচনা করে লজ্জিত হোলো। চুপ করে বসে পড়ল তার খাটের উপর। বড়ো লজ্জিত বোধ করল। কিছু একটা বলবার প্রয়োজন বোধ করল, কিন্তু ঠিক কী বললে লজ্জা এড়াতে পারবে ভেবে উঠতে পারল না।

"না, না, আমাকে স্বভাবতই সার্ রজার ডি কভার্লি বলে মনে করবেন না যেন, তবে কিনা—" দেবেশ বাক্যটা শেষ করতে না পেরে আরও বেশি অপ্রস্তুত বোধ করল।

অসহায়ের মতো মালতীর দিকে তাকিয়ে যখন দেখল যে, তার দীর্ঘায়ত নয়ন এতক্ষণ নির্নিমেষে তাকেই নিরীক্ষণ করছিল, দেবেশ আরও বেশি বিব্রত বোধ করল। নিরুপায় হয়ে, আর কিছু ভাবতে না পেরে, বলল, "একটু বসুন আপনি —এই বইটা ওলটাতে থাকুন ততক্ষণ। আমি দেখে আসি চায়ের কতদূর হোলো!"

বই যে জীবন্ত মানুষের সবষ্টিট্যুট নয়, দেবেশের তখনও সে শিক্ষা হয় নি। একবারও তার মনে হোলো না, অভ্যাগতাকে এমন ফেলে যাওয়ায় কোনও সামাজিক অসঙ্গতি আছে কি না! নীচে গিয়ে সে ভাববার সময় পেল।

মালতীর সেই অবকাশের দরকার ছিল আরও বেশি। আজই এমন করে চলে আসাটা ঠিক হয় নি বোধ হয়।

দেবেশ তার সম্বন্ধে কী ভাবছে কে জানে?

তার চেয়েও মর্মান্তিক, হয়তো কিছু ভাবছেই না। হয়তো মনে করছে, মালতী তার অগণিত শ্রোতার অন্যতম একজন অনুরাগী, তার বেশি কিছু নয়। সে কী করে জানবে সেই রাত্রের ইতিহাস, যখন তার বাণী মালতীর তৃষিত হৃদয়ে বর্ষণ করেছিল তৃষ্ণার জল, বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনে ব'য়ে এনেছিল শ্রাবণের আমন্ত্রণ?

আর, নাই যদি জানে, তবে কাজ নেই জানিয়ে।

মালতী যথা সত্বর সম্ভব বিদায় নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

মাসীমা চা নিয়ে দরজার কাছে আসতেই মালতী চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে পেয়ালা দু'টো নিজের হাতে নিল। মালতীকে বসতে বলে নিজের আসন গ্রহণ করতে করতে মাসীমা বললেন, "দেবু ওর নিজের চা নিয়ে আসছে। এমনিতেই রাত্তিরে ঘুমুতে পারে না, তাই বেশি চা ওকে দিই না।" হেসে যোগ করলেন, "তাই তো আমি আসবার আগেই নিজে-নিজে নীচে গিয়ে হাজির!"

মৃদু তিরস্কারের অন্তরালে যে অপরিসীম স্নেহ প্রচ্ছন্ন ছিল, মালতী তা লক্ষ্য করল। ভালো লাগল। নিজের মার কথা মনে পড়ল। দশ বছর আগে মালতী পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে সব কিছুই তার স্বভাবের

এমন প্রতিকূল যে তার মনের মূল আজও থেকে গেছে বাপের বাড়ির জমিতে। বিবাহিতার জীবনে চিত্তের ও অস্তিত্বের এই দ্বিমুখী বিক্ষেপের মতো অভিশাপ আর নেই।

অতিথি-অভ্যর্থনার প্রচেষ্টায় পরাজয় স্বীকার করে দেবেশ পশ্চাদপসরণ করেছিল। মঞ্চে পুনরবতরণে তাই সংকোচ ছিল। এবারে অবিশ্যি মা থাকবেন। (হ্যাঁ, মাকে বলতে হবে যে, সামাজিকতার, আতিথেয়তার কর্তব্যগুলি যেন তার হয়ে মা-ই সম্পন্ন করেন, তার এ বিষয়ে উৎসাহও নেই, দক্ষতাও নেই ; সর্বোপরি, সময় নেই।)

দেবেশ কিঞ্চিৎ ভরসা পেল। চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে প্রবেশ করে মনে-মনে ঠিক করল যে, এবার আর নির্বোধের মতো নিজে থেকে কিছু বলবে না। মা বা মালতীর প্রশ্নের উত্তর দেবে মাত্র, কখনও বা তাদের কথার উপর মন্তব্য করবে। নিজে থেকে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করবে না।

মা মালতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বি. এ. তো হোলো, কিসে এম. এ. পড়বে ?"

"পাস করি আগে, তবে তো এম. এ. পড়ার কথা ভাবব।" মালতীর হাসিতে মধুর বিনয় ছিল।

এ আলোচনায় দেবেশ একেবারে অনধিকারী নয়, বলল, "পাস করবেনই। কিসে এম. এ. পড়বেন ঠিক করে ফেলুন।"

"পাস যে করবই তা কী করে জানলেন ?"—পরম লজ্জার সঙ্গে প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম মালতী গোপন করল তার হাসির মাধুর্য দিয়ে।

"ভয়ানক শক্ত কলকাতা য়ুনিভারসিটির বি. এ. পরীক্ষায় পাস না করা। আমিও না করে পারি নি!"

মালতী হেসে উঠল।

দেবেশ আরও একটু ভরসা পেল, কিন্তু পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করল না। সেইখানেই থামল। সামনের টেবিলের উপর ছড়ানো বিদেশী সাময়িক-পত্রগুলির পাতা ওলটাতে লাগল।

"পড়বই যে, তাও ঠিক করি নি এখনও।"

"সে কী কথা? পড়বেন না তো সময় কাটবে কী করে?"

তার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটার অসংলগ্নতা সে নিজে লক্ষ্য করেনি। মালতী ঠিক কী বলবে ভেবে পেল না। মাসীমার দিকে তাকাল। আবারও তিনিই উদ্ধার করলেন, বললেন, "পড়াশুনো ছাড়া অন্য কাজ করেও যে মানুষের সময় কাটতে পারে সে কথা ওর জানা নেই!"

মালতীর কাছে বলা উক্তির উত্তর দিল দেবেশ, "মা তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি একটা চাকরি করি।"

দেবেশের গাম্ভীর্যহ্রাসে মালতী সাহস পেল, বলল, "আমাকেও একটা চাকরি করতে বলেন নাকি?"

"আপনি এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন, যেন এমন একটা মহাপাতক আর নেই!"

মা বললেন, "শোনো কথা একবার! যার স্বামী এত বড়ো চাকুরে, বাপের এত টাকা, শ্বশুরের এত সম্পত্তি—সে মেয়ে চাকরি করতে যাবে কোন্ দুঃখে?

"তারই তো দরকার সবচেয়ে বেশি। সময় কাটানোর সমস্যা তো ঐশ্বর্যেরই দণ্ড"—দেবেশ তার মার প্রশ্নের উত্তর দিল মালতীর দিকে তাকিয়ে।

বক্তৃতাটা এক মুহূর্ত পরেই দেবেশের নিজের কাছে বক্তৃতা বলে মনে হোলো। কিন্তু মালতীর কাছে নয়। তার হৃদয়ের ঠিক তারটিতে কথাগুলি ঘা দিল। তার সম্বন্ধে কথাটা যে মর্মান্তিক রকম সত্য। মালতীর মনে মৃদু বিস্ময়ের অস্পষ্ট একটা ভাব এলো এই কথাটা ভেবে যে, দেবেশ জানলে কী করে মালতীর মনের বেদনা? আর কেউ যেন বোঝে নি তার ব্যথা এমন করে।

মালতী আর একবার তাকাল দেবেশের দিকে। সে দৃষ্টিতে যা বলা হোলো না, তা আর বলল না।

আবারও মাসীমাকেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করতে হোলো। মালতীকে বললেন, "পরীক্ষা হয়ে গেল, এবার মা-বাবার কাছে যাবে না?"

"আজই তো যাবার কথা ছিল। এক বিছানা ছাড়া আর সব জিনিসপত্তর বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সকালে দাদা টেলিফোন করে বললে ওর আপিসে কি কাজ আছে। আসছে সোমবারের আগে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"উঃ এই সস্‌পেণ্ডেড্ অ্যানিমেশনের মতো অসহ্য অবস্থা আর নেই। থাকা আর যাওয়ার মাঝখানে এই নো ম্যান্'স্ ল্যাণ্ড—আমি একেবারে ভীষণ ভয় পাই। এ যেন বন্ধ একটা ঘর, যাতে পাখাও নেই, এয়ার-কণ্ডিশনিং প্ল্যাণ্টও

গেছে খারাপ হয়ে। তাই নয় ?” দেবেশ মালতীর সমর্থন ভিক্ষা করল।

মালতী নীরব রইল, মনে মনে বললে, এ লোকটা এমন আমার মনের সবগুলি কথা জানলে কী করে ? কিছুক্ষণ পরে মাসীমার অন্য প্রশ্নের উত্তরে বললে, “যাই তো একবার, তারপর ফেরবার কথা ভাবা যাবে। মা-বাবার ওখানে গেলে কি আর আসতে ইচ্ছে করে ? প্রত্যেকবারই তো মা জোর করে পাঠিয়ে দেয়।” মালতী হাসছিল।

দেবেশ কি একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিষয়টা একেবারেই পারিবারিক বলে ভরসা পেল না।

এই রকম আরও কিছুক্ষণ সাধারণ ব্যাপারে কথাবার্তা চলল। মালতী তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিল। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল যখন মাসীমা উঠে আলো জ্বাললেন। আলোটা জ্বলতেই দেবেশের পুরু চশমা চক্‌চক করে উঠল। মালতী আর একবার তাকাল দেবেশের দিকে। দেবেশ অপ্রস্তুত বোধ করছিল। কিন্তু শুধু অপ্রস্তুত নয়।

“এবার উঠব মাসীমা।”

“হ্যাঁ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এর বেশি দেরি করলে তোমার শাশুড়ী হয়তো ভাববেন।”

“না, সে ভয় নেই। তিনি কখনও খবর নেন না।”—মালতী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। দেবেশের দেওয়া বই হাতেই ছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার সময়

কাটানোর সমস্যা নিয়ে যা বললেন তারপর এই বইটা ধার নিতে চাইলে কি আপত্তি করবেন ?”

বই নিয়ে কেউ এতটুকু উৎসাহ প্রকাশ করলেই দেবেশ খুশি হয়। তার উপর মালতীর গুছিয়ে কথা বলবার ভঙ্গীটি বড়ো ভালো লাগল। বেশ আর আসবাবে দেবেশ অগোছালো। কিন্তু চিন্তায় বা বাক্যে অযত্ন-অগোছালো ভাবটা সে সহ্য করতে পারে না কারও মধ্যে। পরম উৎসাহের সঙ্গে বলল, “দি প্লেজার ইজ এন্‌টায়ারলি মাইন।”

মাসীমা বললেন “সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন তোমায় একা পাঠালে তোমার শাশুড়ী আমায় আস্ত রাখবে না। চলো, তোমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসিগে।

দেবেশ বলল, “দাঁড়াও একটু। আমিও বেরুব। গৌরের কাছ থেকে একটা বই আনতে হবে।”

দেবেশ তৈরী হয়ে নিলে হঠাৎ মালতী বলল, “আপনি আর তা হলে মিছিমিছি বেরুবেন কেন মাসীমা ? আমি তো ওঁর সঙ্গেই চলে যেতে পারি।”

মাসীমা বললেন, “তাই ভালো, আমার রান্নাঘরে একটু কাজও রয়েছে।”

দেবেশ আর মালতী একসঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে দেখতে পেলে যে, কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে রাস্তা ভিজে আছে। রাস্তার আলো সেই সিক্ততাকে করেছে উজ্জ্বল।

রাত্রের ভিজে পীচের রাস্তার নিজস্ব একটা রূপ আছে। সন্ধ্যার আর বৃষ্টির পরের সেই নির্জন পথে পাশাপাশি চলতে

চলতে দেবেশ ভাবছিল অতীতের দু-একটা কথা। মালতী ভাবছিল ভবিষ্যতের দু-একটা আশা।

বলা বাহুল্য, দুজনেই একেবারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিল।

"আপনার বেতার বক্তৃতা আবার কবে ?"

"জানি নে ঠিক। আসলে আমার কিন্তু বেতারে বলবারই কথা নয়। দিল্লী থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তবে এখানে বলতে পারছি।"

"বারে, আমি তো ভেবেছিলুম, আপনার কাজই বলা।"

"তা নয়। কাজ হচ্ছে বলানো।"

"এ তো ভারি অদ্ভুত! যে এত সুন্দর—"

সামনেই একটা জায়গায় অনেকটা জল দাঁড়িয়ে ছিল। দেবেশ তা আবিষ্কার করে বললে, "দেখবেন, সামনেই জল কিন্তু।"

মালতী তার কথাটা শেষ করতে পারে নি। কিন্তু দেবেশের বুঝতে কষ্ট হয় নি যে তার সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রশংসাসূচক কিছু বলা হচ্ছিল। সন্ধ্যায়, নির্জনতায়, বৃষ্টির পরের মৃদু আমেজে—সব কিছুতে মিলে দেবেশের মনে অদ্ভুত একটা পুলকের সঞ্চার হয়েছিল।

রাস্তার জলের প্রসঙ্গে বলল, "সার্ ওয়াল্টার র‍্যালে কে ছিল জানেন ?"

"কোন্ র‍্যালের কথা বলছেন ?"

"তা হলে আর দরকার নেই। এখনই বুঝতে পারবেন

কার কথা বলছি। তাঁর সম্বন্ধে একটা গল্প হচ্ছে এই যে, রাণী এলিজাবেথ একদিন চলছিলেন ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে। সামনে ছিল কাদা। তৎক্ষণাৎ সার্ ওয়াল্টার তাঁর বড়ো কোট খুলে কাদার উপর বিছিয়ে দিলেন মহারাণীর পদস্থাপনের জন্যে।”

মালতীর মৃদু হাস্যে দেবেশের জন্যে উৎসাহ নিহিত ছিল। সে যোগ করল, “আমার গায়ে কোট থাকলে কি আর আপনাকে জল এড়িয়ে ঘুরে যেতে বলতুম ?”

রীতিমতো জোরে দুজনে হেসে উঠল। অনেক দিন দেবেশ এমন প্রাণ খুলে হাসে নি।

ট্রাম-লাইন পর্যন্ত এসে দুজনে দাঁড়িয়ে আরও কথা বলছিল। একটা ট্রাম আসতে দেখে দেবেশ বললে, “ঐ আপনার ট্রাম আসছে।”

মালতীর ভালো লাগল না খবরটা।

যে ট্রামটা এলো, তাকে আজকাল আর কেউ ভর্তি বলে না। মাত্র জন দশেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েদের বেঞ্চির তিনটেতেই ছ'জন নরাধম বসে ছিল। মালতী উঠলে বসবার জায়গার একটুও অভাব হোতো না। তবু মালতী বললে, “বড়ো ভিড় এ গাড়িটায়। এটাকে ছেড়ে দেব।”

দেবেশ কিছু না বুঝে বললে, “হ্যাঁ, ট্রামের ভিড়ে আমারও বড়ো খারাপ লাগে।”

একটু পরেই যে ট্রামটা এলো, সেটাকে খালিই বলা চলে। একজনও লোক দাঁড়িয়ে তো ছিলই না, বেঞ্চিও অনেকগুলো

শূন্য ছিল। বিশেষ কিছু মনে না করে, নিতান্ত পরিহাসচ্ছলেই, দেবেশ বললে, "এটাতেও যে ভীষণ ভিড় !"

সম্মিলিত উচ্চহাস্যে মালতী বললে, "তা হলে আপনার কথাই মেনে নেওয়া যাক। এটাকেও ছেড়ে দেব।"

দেবেশ ছেলেমানুষের মতো খুশি হোলো এবং ছেলেমানুষের মতোই হাসল।

তৃতীয় একটা ট্রাম যখন দূরে দেখা যাচ্ছিল, তখন মালতী বললে, "আপনার বইটা কবে ফেরত দিতে হবে ?"

"কিছুমাত্র তাড়া নেই। ওটা আমার শিগগির দরকার হবে বলে মনে হয় না।"

"দরকার হলে কিন্তু আমাকে টেলিফোন করতে সংকোচ করবেন না, তখনই পাঠিয়ে দেব।"

"দরকার হবে না, তবে হলে তাই করব।"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মালতী আবার বললে, "কী করে টেলিফোন করবেন ? নম্বর জিজ্ঞেস করলেন না যে ?"

"ও, তাই তো ! কত নম্বর ?"

"দেখুন, আমি না বললে তো আপনি নম্বরটাও জিজ্ঞেস করতেন না। বই শত দরকার হলেও টেলিফোন করতে পারতেন না।" মালতী হাসছিল। "এখন যদি নম্বরটা বলি তাও হয়তো বাড়ি পৌঁছোবার আগেই ভুলে যাবেন।"

"আপনি দেখছি আমাকে আমার মার চাইতেও বেশি অকর্মণ্য বলে মনে করেন।"

মালতী হাসতে হাসতে বললে, "আচ্ছা, দেখি আপনার মনে থাকে কিনা। নম্বর হচ্ছে পি. কে. ডাবল—"

মালতীকে ট্রামে তুলে দেবার পরে দেবেশের আর গৌরের বাড়ি বই আনতে যাওয়ার কথা মনে রইল না। টেলিফোন-নম্বরটা মনে জপ করতে করতে পথ চলতে থাকল বাড়ি-ফেরার মুখে। আর ভাবতে লাগল মালতীর কথা। সোমবারে বাবার কাছে চলে যাবে? না গেলেই নয়? কী দরকার এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার?

টেলিফোন নম্বরটা বলবার সময় কী রকম ভাবে যেন তাকিয়েছিল মালতী দেবেশের দিকে। একেই কি রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় বলেছেন—ভাবগর্ভ চাহনি? কিন্তু ভাবখানা কী? দেবেশ কিছু হদিস পেল না, যদিও বেশ বুঝতে পারছিল যে অদ্ভুত ভালো লাগছে।

আর যা বুঝতে পারছিল না তার জন্যে নিজেকে সান্ত্বনা দিল সংস্কৃত বচন একটুখানি বদলে। মনে মনে বলল, দেবু ন জানন্তি।

ব্যাকরণের কথা মনে আনল না।

ছয়

দেবেশ পুরোপুরি সেই জাতের ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল নয় যাদের কাছে কোনো কিছু পুরোপুরি ভালো লাগাই যেন একটা নিতান্ত নিম্নভ্রূ রুচিহীনতা। কিন্তু ওর স্বভাবে আছে অতি তীব্র একটা আত্মসমালোচনার লোভ। খুঁত না বের করতে পারলে যেন ওর মনটা খুঁত খুঁত করে। ওর ফুল ভালো লাগে, কিন্তু তার কাঁটাটাও নিয়তই বিঁধতে না থাকলে যেন ওর বিদগ্ধ উপভোগ পরিপূর্ণ হয় না।

মালতীকে ট্রামে তুলে দিয়ে এসে ঘরে ফিরতেই মনে হতে লাগল যে, সে অনেকখানি অমূল্য সময়ের অপব্যয় করেছে। মনকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও সে বিক্ষিপ্ত হতে দিয়েছিল, সেজন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারল না। তারপর র‍্যালের গল্পটা বলে বোধ হয় ভালো করে নি।

সেটা যে একেবারেই রসিকতা, আর কিছু নয়, তা কি মালতী বুঝেছে? সে হয়তো কি না কি মনে করেছে। হয়তো মনে করেছে প্রেমনিবেদন বলে। ছি ছি, দেবেশের সে কথা তো একবারও মনে হয় নি! মালতী নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে দেবেশের নির্লজ্জতায়।

টেলিফোন করে ক্ষমা চাইবে? না, তা হলে বোধ হয় আরও বেশি লজ্জার কারণ হবে। ছি ছি, মালতী নিশ্চয়ই দেবেশকে অত্যন্ত লঘুচিত্ত ও লঘুভাষী বলে মনে করেছে।

রূঢ় বললেও দেবেশ ততটা দুঃখিত হয় না, যতটা তাকে লঘু মনে করলে। তাকে বলো অসামাজিক, বলো অভদ্র, বলো পেড্যাণ্ট—কিছু বলবে না। একটু খুশিও হবে বা। কিন্তু কেউ তাকে লঘু বা হালকা মনে করেছে, এইটে তার একেবারেই অসহ্য। তবে কি টেলিফোন করে মালতীর ভুল ভাঙবে? পি কে……থাক্।

টেলিফোন করলে জটিলতা বাড়বে হয়তো।

হঠাৎ দেবেশের মনে হোলো, মালতী কী ভাবছে না ভাবছে তাই নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন তার? নিজের আর একটা দোষ ধরতে পেরে মনটা আরো একটু তৃপ্ত হোলো; স্থির করল, মালতী যা খুশি ভাবুক। সে আর তার সময় নষ্ট করবে না সেই কথা ভেবে।

এই প্রসঙ্গে দেবেশের আর একটা জিনিস চোখে পড়ল। চেষ্টা করে একটা কথা মনে রাখা যায়—যেমন মালতীর টেলিফোন-নম্বর। কিন্তু চেষ্টা করে একটা কথা কি মন থেকে সরানো যায়—যেমন মালতীর ভাবনা? উহুঁ, মনে রাখাটা একটা সচেতন ক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু ভোলাটা জোর করে হয় না। বিস্মৃতি আপনি যা গ্রাস করে তাই বিস্মৃত হয়, সেখানে মানুষের হাত নেই। দেবেশেরও না। সে বই নিয়ে বসল।

কিন্তু যতই নানা যুক্তির জোরে মালতী-প্রসঙ্গ মন থেকে নির্বাসিত করতে চেষ্টা করতে থাকল, ততই যেন সে চিন্তা তার মনকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রইল।

আর, এই মল্লযুদ্ধই বা কেন নিজের মনের সঙ্গে? দেবেশ তার খাট ছেড়ে উঠে চেয়ারটায় বসল, যেখানে মালতী বসেছিল কিছুক্ষণ আগে। মনে পড়ল মালতীর ঋজু বসার সুন্দর ভঙ্গিটি। ভালো লাগল। মনে পড়ল মালতীর স্নিগ্ধ হাসিটি, যাতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, কিন্তু তেজ নেই। খুব ভালো লাগল। চেয়ারে বসে রইল দেবেশ।

চোখ মুদে দেখল যা চোখ খুললে দেখতে পেত না।

স্বপ্ন ভাঙল মার প্রশ্নে,—"কী রে, গৌরের ওখানে বই আনতে যাস নি?"

"না মা, কাল সকালেই ওর বাড়ি হয়ে যাব, আপিস যাওয়ার পথে।"

কিছুক্ষণ পরে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর খাবার দেব এখন?"

"এত শিগগির খাব না মা। স্নান করব তার আগে।"

স্নান সেরে উপরে এসে দেবেশ দেখল, মা মেঝের উপর শুয়ে আছেন। তাঁর ক্লান্তিহরণের প্রয়াসে বলল, "শুয়ে পড়লে কেন মা?"

"অমনি। উনুনের আঁচ আজকাল আর সইতে পারি নে। একটু বেশিক্ষণ রান্নাঘরে থাকলেই মাথাটা কি রকম করতে থাকে।"

দেবেশের বুঝতে বাকি রইল না যে, কথাটা অংশত মাত্র সত্য। কি রকম করাটা মাথায় নয়, মনে।

"কী ভাবছ মা?"

"নতুন কিছু নয় দেবু।"

পুরানো কিছুটা যে কী তা দেবেশের বুঝতে বাকি রইল না। মাও বুঝলেন যে, দেবেশ বুঝেছে। আজ আর হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত কথা খুঁজে পেল না দেবেশ। বই খুলে পড়বার ভান করল। মা সে ফাঁকিতে ভুললেন না।

"দেবু!"

"কী মা ?"—দেবেশ চমকে উঠল। ভয় পেল।

"আমি ভাবছিলেম কি, আমি বরং কিছুদিনের জন্যে কাশী ঘুরে আসি।"

দেবেশ ঠিক এই রকমই একটা কিছু আশঙ্কা করছিল কিছুদিন থেকে। মার কথা শুনে মালতীর কথা মন থেকে অন্তর্হিত হোলো, সেই সঙ্গে সন্ধ্যার ভালো-লাগাটুকু। তবু করুণ হাসির চেষ্টা করে বললে, "হঠাৎ এত পুণ্যলোভ কেন হোলো মা ? কলকাতার কালীঘাট কি যথেষ্ট নয় ?"

দেবেশ নিজেও জানত যে, পুণ্য করবার জন্যে মা কাশী যাওয়ার কথা বলেন নি। তবু আশা করল, যদি এই সুযোগে অন্য কথা তুলে আলোচ্য বিষয়টা চাপা দেওয়া যায়। নিরাশ হতে হোলো।

মা বললেন, "পুণ্যে আর লোভ নেই দেবু। আমি ভাবছিলেম কি, প্রায় পাঁচ মাস হতে চলল বাণী চলে গেছে। ও যদি আমারই জন্যে ফিরে আসতে না চায়, তা হলে—সত্যি তো আমি তো আর চিরকাল থাকব না—"

"চিরকাল কেউই থাকবে না মা।"

"তবু, আমি আর ক দিন ? আমি বলি কি, ও-ই বরং ওর সব বুঝে নিক।"

"শোনো মা, বাণী কেন গেছে আমি জানি নে। আমাকে নিজে থেকে বলে নি, আমিও জিজ্ঞেস করি নি। তবে যদি এই হয় যে বাণী থাকলে তুমি থাকবে না এবং তুমি থাকলে বাণী থাকবে না, তা হলে তার সমাধান তো সরল অঙ্ক।"

"সরল অঙ্ক মানে ?"

"মানে, তোমাকে আমি জানি সাতাশ বছর থেকে, বাণীকে দু বছর পাঁচ মাস থেকে। সাতাশ থেকে দু বছর পাঁচ মাস বিয়োগ করলে থাকে চব্বিশ বছর সাত মাস। অতএব বাণীর হোলো, বাংলা কাগজে যাকে বলে—শোচনীয় পরাজয়।"

নিজের যুক্তিচাতুর্যে খুশি হয়ে দেবেশের উত্যক্তির কিঞ্চিৎ উপশম হোলো।

মা হাসলেন পাগল ছেলের ছেলেমানুষি শুনে। অতি দুঃখেও হাসি পেল। জীবনের সমস্যার সমাধান করতে চায় যোগ-বিয়োগের অঙ্কে, এমন ছেলেকে রক্ষা করবে কে ? পুত্রের অসহায়তার নতুন প্রমাণ পেয়ে মাতৃহৃদয় স্নেহসিক্ত শঙ্কায় ভ'রে উঠল। একটু ভেবে বললেন, "তোর অঙ্কের আরও একটা দিক আছে দেবু। আমি বাঁচব আর পাঁচ বছর, তুই চল্লিশ বছর।" (মা হাত তুলে নমস্কার জানালেন বিধাতার উদ্দেশ্যে)। "চল্লিশ থেকে পাঁচ গেলে থাকে পঁয়ত্রিশ। সেই বছরগুলি তোকে দেখবে কে ?"

মার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে দেবেশের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু

এটা আশা করে নি। তার নিজের কাছে যা অকাট্য যুক্তি বলে মনে হয়েছিল, তাই যে এমন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে—এ কথাটা একবারও মনে হয় নি দেবেশের।

কৌশলের দোষই এই, তার পরেই আছে প্রতিকৌশল। যুক্তির ত্রুটিই এই যে, তার পাশেই থাকে প্রতিযুক্তি।

মনে মনে তর্কে হার স্বীকার করল দেবেশ। উত্তরে যা বলল তা এলোমেলো, "তোমার সবগুলো প্রেমিস্ই হাই-পথেটিক্যাল। কেউ কি জানে, কে কত বছর বাঁচবে? আর তা ছাড়া আমি কি এমনই অকর্মণ্য যে সারা জীবন কাউকে না কাউকে আমাকে আগলে থাকতে হবে?"

উত্তরটা নিজেরই মনঃপূত হচ্ছিল না। আলোচনা থামিয়ে দেবার অব্যর্থ অস্ত্রও জানা ছিল দেবেশের। হেসে বললে, "আর তুমি থাকতেই বা দেখছে কে? এই যে দারুণ ক্ষুধা নিয়ে দুঘণ্টা থেকে বসে আছি, খাবার পাচ্ছি কই?"

"এখনি আনছি।"—বলে মা দ্রুতপদে নীচে নামলেন খাবার আনতে।

বাণীর কথা কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেই দেবেশের খারাপ লাগতে থাকে। সে নিজে এই চিন্তাটাকে মন থেকে এমন নিরঙ্কুশভাবে সরিয়ে দিয়েছিল যে তার জীবনযাত্রায়, আলাপে, আলোচনায় কোথাও এতটুকু আভাস ছিলনা তার বিবাহের। স্বভাব-চঞ্চলতা ব্যতীত ব্যাচিলরত্বের আর সব ক'টি বৈশিষ্ট্য দেবেশে বর্তমান ছিল। কেন বিয়ে করেছিল—এই প্রশ্নটার সঙ্গত একটা উত্তর সে আজও ভেবে বের করতে

পারে নি। ঠিক করেছে একদিন একটা ছোট গল্প লিখবে এই নিয়ে। কিন্তু বাইশে মাঘের পরে যা যা ঘটেছে, তার এমন একটা ব্যাখ্যা সে নিজের মনে দাঁড় করিয়েছিল যা যুক্তিনৈপুণ্যে ছিল নিখুঁত। সে ব্যাখ্যাটা সে অনেককে বলে নি, কিন্তু যাদেরই বলেছে তারা কেউই সেটা গ্রহণ না করলেও খণ্ডন করতে পারে নি। সেই জয় নিয়েই দেবেশ তুষ্ট ছিল।

নিজের মনকে শান্ত করেছিল এই বলে যে, যে-মালার ফুলগুলি শুকিয়ে ঝ'রে গেছে তার সুতোটাকে সে গলায় জড়িয়ে রাখবে না দড়ির মতো। সব কিছু বলা হলেও এ-সত্যটা সে নিজেও অস্বীকার করতে পারবে না যে, তার বিবাহটা মারাত্মক একটা ভুল হয়েছিল। বাণীকে দোষ দেয় না দেবেশ, রাণী হলেও অন্যথা হত না। তার মনটাই নদীর মতো প্রবহমানা, পুকুরের পার দিয়ে তাকে বাঁধা শক্ত।

জীবনের আর সব ভুলের সংশোধনের পন্থা খোলা আছে। নেই কি শুধু বিবাহের বেলায়, যেখানে ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থাটাই একেবারে প্রতিকূল ?

দেবেশ যদি আর্টসের বদলে সায়েন্সে ভর্তি হয়ে সেকেণ্ড-ইয়ারে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করত যে, সে ভুল করেছে, য়ুনিভার্সিটি কি তখন বলত যে, একবার যখন ভুল করেছ, আর উপায় নেই ?

দেবেশ যদি রেডিয়োর বদলে কোনো তেলের কলে কাজ নিয়ে কিছু দিন পরে বলত, তেলের কলে আমি জল, এ ছুয়ে

মিশবে না—তা হলে কি সমাজ তাকে বাধ্য করত বাকি জীবনের জন্যে তেলেরই ঘানিতে থাকতে? কখনোই না।

অথচ দেখ, শিক্ষা আর জীবিকা এই দুটো ব্যাপারেই ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কতগুণ সহজ জীবনের তুলনায়। তবু সেই সব-চাইতে কঠিন পরীক্ষার বেলায়ই কড়াকড়ি সব-চাইতে বেশি! দেবেশ তার নিজের ভুলের সাফাই গাইছে না। কিন্তু সমাজের বর্বরতার পায়ে আর যে-ই সংকোচে বা ভয়ে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করুক, দেবেশ করবে না।

দেবেশ নিজেও জানত যে, এগুলি তার তর্কচতুর বুদ্ধির যুক্তি মাত্র। বাণী চলে যাওয়ার ফলে তাকে যে সমস্যা-সমুদ্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার উপর দিয়ে সে যে হাঁসের মতো অবলীলাক্রমে সাঁতরে আসতে পেরেছিল তা এই জন্যেই যে, বাণীর জন্যে সত্যকার মমত্ববোধ তার জন্মে নি একটুও। বাণীর রূপ কতটুকু বা গুণ কতটুকু, তা সে এক মুহূর্তের জন্যেও বিচার করতে বসে নি, তেমন প্রেরণাই অনুভব করে নি কখনও। বাণী চলে যাওয়ার পর থেকেই দেবেশ এমন একটা মুক্তির আনন্দে দিন যাপন করছিল যে, অনায়াসে সে একটা স্বসর্বস্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে তাইতে মগ্ন ছিল আপন অধ্যয়নে। ভাবছিল, এইবারে সুযোগ পাওয়া গেছে জীবনটাকে আপন প্রতিভা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী গুছিয়ে তোলবার। পড়বে যা সে পড়তে চাইবে, লিখবে যা সবাই পড়তে চাইবে।

উপমাটাও ঠিক ছিল, মনে মনে বলল, আমার মনের

ডার্ক-রূমে এবার নিজেকে ডেভেলপ করব, আর বাইরের হস্তক্ষেপের ভয় নেই।

তাই ভয় পেল মার কথায়। তার বাণী-মুক্ত জীবনকে ভাবসমৃদ্ধ করে তোলবার সাধনায় আবার বুঝি আসে বাধার সংকেত। তার একাকিত্বের দুর্গে আবার বুঝি হয় আক্রমণ।

মা খাবার এনে পুত্রকে চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখে বাণী-প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করেন নি। দেবেশই আবার কথা তুলল আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছনায় শুয়ে, “মা, আর কাউকে তো বলতে পারি নে। তোমায়ই বলি। আমার জীবনটাকে ঠিকভাবে গ'ড়ে তুলতে চাই। ঠিকটা যে ঠিক কী, সেটা স্থিরভাবে জানি নে এখনও। আমার জীবনাদর্শের একটা সুস্পষ্ট ছবি এখনও আমার মনে গ'ড়ে ওঠে নি। সেই আদর্শকে খুঁজব বাকি জীবন ধ'রে।

“নিশ্চয়ই এমন একটা বাঁচবার রীতি আছে যা নিখুঁত। যাতে পৃথিবীও অর্থহীন মনে হবে না, এদিকে পৃথিবীকেই সব-কিছু মনে হবে না। যাতে রক্তমাংসের ছোঁয়াচ থাকবে অথচ রক্তের দাগ থাকবে না, থাকবে না মাংসের স্থূলতা। যে-জীবনে বুদ্ধি এবং আবেগ, যুক্তি এবং অনুভূতি, বাস্তবতা এবং কল্পনা নির্বিরোধে মিলবে গঙ্গা-যমুনার মতো। যেখান দিয়ে সেই দ্বিধারা ব'য়ে যাবে, সেখানেই ফুটবে ফুল, ফলবে ফসল।

“আমি সেই সার্থক পরিপূর্ণ জীবনের স্বপ্নকে সত্য করতে চাই, মা। সেখানে বাণীর স্থান নেই। তাকে থাকতে দাও যেখানে সে স্বেচ্ছায় গেছে।”

মা কিছু আর বললেন না। অন্ধকারে দেবেশের গম্ভীর কণ্ঠের গভীর উক্তি দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হোলো। আর দেবেশ মনে মনে বাণীর উদ্দেশে বলল, বুদ্ধকে এমনই নিশীথের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে হয়েছিল যশোধরাকে ফেলে। নিমাইকে এমনই রাতে শয্যাত্যাগ করে যেতে হয়েছিল নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে কিছু না বলে। আমাকে তুমি সেই অপরাধ থেকে বাঁচিয়েছ। তুমি নিজে চলে গেছ। তোমাকে ধন্যবাদ।

সাত

সেদিন সেই দেবেশের বাড়ি থেকে ফেরা অবধি মালতীর মনে বিরাম ছিল না। কী যেন একটা অনির্দেশ্য ভাবনার ভ্রমর কেবলই গুঞ্জন করে ফিরছিল।

কিছুদিন আগে একটা ইংরেজী ছবি দেখেছিল মালতী। তার নায়িকার স্বপ্নগুলিকে পরিচালক দেখিয়েছেন নানা রকমের আবছায়া অনেকগুলি দৃশ্যের অবতারণা করে। কখনও নায়িকা তার স্বপ্নের নায়কের বাহুলগ্না হয়ে বিচরণ করছিল বিরাট এক প্রাসাদের বিস্তীর্ণ অলিন্দে। কখনও বা তারা দুজনে মিলে দ্রুতবেগে স্কেট্ করছিল সুইট্জারল্যাণ্ডের শুভ্র তুষারের বন্ধুর ব্যাপ্তিতে। কখনও তারা ছুটছিল ছাদখোলা গাড়িতে বিদ্যুদ্বেগে সেই পথের উপর দিয়ে, যার শেষ দেখা যায় না।

একটা দৃশ্য ছিল জ্যোৎস্নাস্নাত সরোবরের। তার তীরে উপবিষ্ট নায়ক-নায়িকার পৃথক প্রতিবিম্ব কেবলই মিলিত হয়ে যাচ্ছিল স্বচ্ছ জলের মৃদু কম্পনে।

ঠিক তেমনই মালতীর কম্পিত অবচেতনে অস্পষ্ট কতগুলি ছবি ভাসতে লাগল। সে ছবিতে কতবার যে মালতীর ছায়ার উপর দেবেশের ছায়া প্রক্ষিপ্ত হোলো তার সংখ্যা নেই।

কোনো কাজে কোনো ত্রুটি হয় নি তাই বলে। বরং

কতগুলি কাজে তার অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ্য করে সদারুষ্টা শ্বশ্রূমাতা পর্যন্ত মৃদু বিস্ময়ের হাসি হেসেছেন মালতীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে। সেই বিদ্রূপের হাসিকেও মালতী ক্ষমা করল। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে যেমন ঘর সাজাচ্ছিল তেমনই সাজাতে থাকল।

যে-ঘরটাকে এতকাল কয়েদখানা বলে মনে হয়েছে, আজ তাতে যেন বইছে মুক্তির নিশ্বাস। মালতী বইগুলিকে ধূলিমুক্ত করে নতুন ভাবে সাজাল। বিয়েতে উপহার-পাওয়া 'সঞ্চয়িতা' আলমারি থেকে বের করে আলাদা করে রাখল— আজ অনেক দিন পরে সেটাকে নিয়ে বসবে আবার। তারপর আর সব কিছু পরিষ্কার করে নতুন চাদর বিছিয়ে আর বালিশের অড় পরিয়ে শয্যার করল আমূল সংস্কারসাধন। ঘরটায় যখন পরিচ্ছন্নতা বিধান সম্পন্ন হোলো, তখন চেয়ারে বসে সমস্ত ঘরটার সদ্যোলব্ধ সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করল পরম পরিতৃপ্তিসহকারে।

'সঞ্চয়িতা'-র প্রচ্ছদপট উলটেই প্রথম সাদা পাতাটায় দেখল লেখা আছে—রণেন ও মালতীর শুভ পরিণয়ে মামীমার আশীর্বাদ। আর পাতা উলটাবার উৎসাহ রইল না। তাকাল টেবিলের উপরের সেই ফোটোটার দিকে। গুনগুন গান থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছবিটার ঠিক সামনে সশব্দে স্থাপন করল ট্যাল্‌কম পাউডারের বিরাট অস্বচ্ছ টিনটা। তারপরে মামীমার আশীর্বাদের পাতাটাকে সজোরে বই থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল জানালা দিয়ে। আপদ গেল।

গেল না, এলো। ঠিক সেই সময়ে পর্দা সরিয়ে সশরীরে প্রবেশ করলেন উপহারদাত্রী মামীমা স্বয়ং।

"কী গো মালতীরাণী? কার লাগি মিথ্যা এ শয্যা?"

সদা-হাস্যময়ী এই মহিলা প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে বার্ধক্যের প্রারম্ভে উপনীত হয়েছেন, কিন্তু প্রথম যৌবনে পড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ভোলেন নি। অর্থাৎ, তাদের অর্থ ভুলেছেন, কিন্তু লাইনগুলি ভোলেন নি। মালতী জানত এই দুর্বলতার কথা।

"না মামীমা, শয্যাটা মিথ্যা নয়। মিথ্যা হচ্ছে আপনার সন্দেহটা।"

স্থূল ঘর্মাক্ত বপু পাখার তলায় স্থাপন করে মামীমা বললেন, "অর্থাৎ রুণুর চিঠি আসে নি?"

"না।"

"না?"—মামীমার বিশ্বাস হোলো না।

"না।"—মালতী তাঁর সন্দেহের পরিপূর্ণ নিরসনের জন্যে আবার আরও স্পষ্ট করে বলল।

"তবে?"

"তবে আবার কী?"

"না কিছু নয়, কি জানি বাবা, আমরা প্রাচীনা—বুদ্ধি-বিহীনা।"—আপন রসিকতায় হেসে লুটিয়ে পড়লেন মামীমা।

"বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার কিছু নেই মামীমা। ঘরটাকে সাজিয়েছি একেবারে নিজের মনের আনন্দে আর কোনো কারণ নেই।"

"তা না হয় হোলো, কিন্তু আমি ভাবছি এই আনন্দের উৎস কোথায়? মিড্‌ল ঈস্টের মরুভূমিতে কি?"—আবার আপন রসিকতায় হেসে উঠলেন মামীমা। মালতী বিরক্তি গোপন করল, কিন্তু হাসল না।

"বসুন, মামীমা, আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।"

আজ সকাল থেকে মালতীর কোনো কাজে ভৃত্যদের আহ্বান করা হয় নি। তারা দূরে ছিল, মালতীকে তাই জোরে ডাকতে হোলো। কিন্তু তার আগেই মামীমা আপত্তি জানালেন, "না রে মালতী, চা খাব না এখন। তোর শাশুড়ীখানা যে আবার আমার হিন্দী গানের ননদিনী, একবার যদি জানতে পারে আমি এসেছি, তাহলে আর রক্ষে নেই। শুরু হবে হাজারো রকমের জেরা। তার আগেই পালাব। জানিস মালতী, একেবারে সময় নেই আমার। কোথাও যেতে পাই না। কাজ, কাজ আর কাজ। আর পারি নে। এক ছাত্রী পড়াতে এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেম, ভাবলেম, দেখে যাই একবার নিঃসঙ্গিনী বিরহিণী ভাগ্নে-বউয়ের সুন্দর মুখখানি। আমি আবার সুপারস্টিশাস্ কিনা।" মামীমা হাসলেন মেদ এবং মেদিনী কাঁপিয়ে। মালতী লজ্জায় লাল হোলো।

মামীমা বিদায় নিলে মালতী আবার চেয়ারে বসে 'সঞ্চয়িতা' পড়তে চেষ্টা করল। মনে মনে পড়তে ভালো লাগল না। জোরে আবৃত্তি শুরু করতেই কানে এলো নিজের স্বর। মনে এলো আর একজনের স্বর। অমন গলা না থাকলে সুখ নেই জোরে কবিতা পড়ে। কাজ নেই পড়ে। মালতী

বইটা বন্ধ করে টেবিলের উপর রাখল। তখনই চোখ পড়ল টেলিফোনটার উপর।

টেলিফোনটা কি বোবা হয়ে গেছে ?

নম্বরটা মালতী প্রায় অযাচিত ভাবে অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেবেশকে জানিয়ে দিয়েছিল। সে-পাগল বুঝি বাড়ি যাওয়ার আগেই তা ভুলে বসে আছে। না, ভুলে গেছে, এ কথাটা ভাবতে ভালো লাগল না মালতীর। মনে আছে নম্বরটা, কিন্তু হয়তো লজ্জা পাচ্ছে টেলিফোন করতে। তবে কি…? না, সে নিজে কিছুতেই ডাকবে না। কী ভাববে দেবেশ তাহলে ? না না, কিছুতেই না। কিন্তু দেবেশ ডাকছে না কেন ? যে বইটা মালতী নিয়ে এসেছে দেবেশের কাছ থেকে সেটারও কি দরকার নেই দেবেশের ?—মালতীকে যদি দরকার না-ও হয় !

কিন্তু টেলিফোনটা এমন বোবা হয়ে গেল কেন ?

এ পারে মুখর হোলো কেকা ঐ, ওপারে নীরব কেন কুহু হায় ?

ক্রী—ঈং, ক্রী—ঈং…

মালতী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবে কি—?

"হ্যালো।"—মালতী কণ্ঠে স্বাভাবিকতার সুর এনে উৎসাহ গোপন করতে চেষ্টা করল।

"হ্যালো।"

"ওঃ! সরোজ।" মালতী কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর এনে নৈরাশ্য গোপন করতে চেষ্টা করল।

"বউদি, আজ তোমার জন্মদিনে তোমাকে কী দেব বলো ? গত দশ দিন এ ছাড়া আর কোনো কথা ভাবি নি, তবু এমন একটা জিনিসের কথা ভাবতে পারলেম না, যা তোমাকে দেওয়ার যোগ্য।"

"তাই নাকি ?"—মালতীর মনে পড়ল না যে, গত বছর এদিনে ঠিক এমনই ধরনের কথা সরোজের কাছে শুনে কী অপরূপ সান্ত্বনা পেয়েছিল সে। কেনই বা পড়বে ? গত জন্মের কথা কি কারও মনে থাকে ? মালতীর যে নবজন্ম হয়েছে ! বললে, "না ভাই সরোজ, এ কোনো কাজের কথা নয়। যখন খুশি যে কোনো অজুহাতে আমাকে কতগুলো প্রেজেন্ট দিয়ে তুমি টাকা নষ্ট করবে, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।"

মালতীর স্বরের সুস্পষ্ট উষ্মায় সরোজ বিস্মিত হোলো, আহত হোলো তার চেয়ে বেশি। বিশেষ কিছু বলতে সাহস পেল না, বলল, "বউদি, তোমাকে যা দিই তা তো তোমার প্রয়োজনে দিই না, দিই আমার প্রয়োজনে। কিছুই নেবে না আমার কাছ থেকে তোমার জন্মদিনে ?"

মালতীর মায়া হোলো, আহা, বেচারী আঘাত পেয়েছে বোধ হয়। ব্যথা দিতে বড়ো ব্যথা পায় মালতী। বললে, "ভুল বুঝো না ভাই, আমি তোমারই ভালোর জন্যে বলছিলেম।"

বেদনায় স্বভাবভীরু সরোজের সম্পূর্ণ বাক্‌রোধ হয়েছিল। কিছু বলতে পারল না। মালতীই আবার বললে, "সরোজ, আমার হাতে একটা কাজ রয়েছে এখন। তুমি বিকেলে এলে

তোমার সঙ্গে বেরিয়ে তখন ঠিক করা যাবে কী কেনা যায়, কেমন ?”

সরোজ এর বেশি চায় না। একটু আত্মীয়তা, একটু মিষ্টি কথা। তাহলেই খুশি। সরোজকে খুশি করার চাইতে গুরুতর কারণ অবশ্য ছিল মালতীর তাড়াতাড়ি টেলিফোন রেখে দেবার। কারও সঙ্গেই কথা বলতে ভালো লাগছিল না। মনে মনে সে এক-তরফা কথা বলে যাচ্ছিল অনুপস্থিত একজনের সঙ্গে। প্রত্যক্ষ কারও সঙ্গে কথা কইতে গেলে সে কথায় ব্যাঘাত ঘটে। সামান্যতম বিক্ষেপে সে সংলাপ ব্যাহত হয়। স্তব্ধ হয়ে যায় সেই অরূপ গুঞ্জন।

‘সঞ্চয়িতা’ আর খুলল না মালতী। নানা অপ্রীতিকর স্মৃতিতে জড়ানো ও-বইটা। তা ছাড়া এই কাব্যসংগ্রহে অবিচ্ছিন্ন একটা ধারা নেই। কয়েকটা গভীর কবিতার পরেই শুরু হয়ে যায় একেবারে ভিন্ন রসের কবিতা। এ যেন একটা ফুলের তাড়া, তোড়া নয়। মালতী ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’ও শেষ পর্যন্ত কেনে নি এই জন্যে। সেখানেও সেই ধারার অভাব—যে খণ্ডে ‘ব্যঙ্গ-কৌতুক,’ সে খণ্ডেই হয়তো ‘মানুষের ধর্ম’। মালতী তাই যখন যেমন খুশি ছাড়া ছাড়া বইগুলি কিনেছে। তারই একটা তুলে নিল মালতী চোখ বুজে। এইটে তার অত্যন্ত প্রিয়, যখনই সে নিজে থেকে ঠিক করতে পারে না, তখন সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেয় অদৃশ্যের হাতে। লটারিতে যে বইটা উঠল সেটা নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’।

মালতীর গানের কান আছে, কিন্তু গলা নেই। সুরগুলি

মনে থাকে নির্ভুলভাবে, কিন্তু শোনাতে পারে না কাউকে, নিজেকে ছাড়া। নিউ এম্পায়ারে যখন 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয় হয়েছিল, তখন সে সরোজের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল। খুব ভালো লেগেছিল। আজ নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' হাতে করে তার অনেকগুলি সুর বিস্মৃতি থেকে ভেসে এলো মালতীর মনে। গুনগুন করে গাইল অনেকগুলি গানের লাইন। গাইল "মোহিনী মায়া এলো", গাইল "বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে"। দ্বিতীয় গানটার পরের কয়েকটা লাইনও একটু একটু মনে ছিল, গাইল—

ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি—
যুগে যুগে দিন-রাত্রি ধরি,
ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে, জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।

কোনো গানের বা প্রথম লাইন মনে নেই, আছে শুধু মাঝের দু-একটা জায়গা। মালতী গাইল—

আজি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে,
দেওয়া হোলো না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে লাগে॥

না, এটা আজকের গান নয়। তবে কী গাইবে আজ? মালতী বইয়ের পাতা নিয়ে খেলতে থাকল, কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে রইল টেলিফোনের একটা ডাকের জন্যে। গত তিন দিন থেকেই আছে। ঘর ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকে নি, খাওয়ার জন্যে ন্যূনতম সময় নিয়েছে, স্নানকে করেছে সংক্ষেপ।

সকল চেতনা দিয়ে এই যে অধীর প্রতীক্ষা, একটা ডাকের জন্যে, এর প্রতিটি মুহূর্ত মালতীকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল দেবেশের দিকে। তার এমন সম্ভাবনার কথা একেবারেই মনে আসে নি যে, অপর পক্ষের অনুরূপ উদ্বেলতা না হয়ে থাকতে পারে। মালতী যে অন্তত অংশত ঠিকই ভেবেছিল তার প্রমাণ পেতে দেরি হালো না।

"হ্যালো"—মালতী নিশ্চয় জানত যে, দেবেশ টেলিফোন করেছে। তা সত্ত্বেও পুলকিত বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হোলো যখন অদৃশ্য অপর দিক থেকে শুনল সেই অসাধারণ কণ্ঠস্বর।

এটা কি পি. কে.—?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি—!" দেবেশ কথা খুঁজে পেল না।

"আপনি!" মালতী আর কিছু বলবার প্রয়োজনই বোধ করল না।

"কিন্তু আপনি কী করে জানলেন যে আমি বলছি?"

দেবেশের কণ্ঠে বিস্ময় ছিল, আনন্দ ছিল। মালতী তা থেকে সাহস সঞ্চয় করল।

"আপনিই বা কী করে জানলেন যে আমি বলছি?"

"তাই তো!"—দেবেশ হেসে উঠল সশব্দে। মালতী সে হাসিতে যোগ দিল সোৎসাহে। কোনো একটা অনুভূতি—হোক তা কৌতুকের মতো লঘু অনুভূতি—যে একই সময়ে দু'জনে মিলে উপভোগ করছিল, এই অস্পষ্ট চেতনা একজনকে

অপরের অনেকখানি কাছে এগিয়ে আনল। হাসি থামলে মালতী বলল, "হঠাৎ ?"

"হঠাৎ মানে ?"

"মানে, হঠাৎ টেলিফোন করার কথা মনে হোলো যে ?"

"কেন করেছি বলব না। যদি নিতান্তই জানতে চান তো বলি, কেন করি নি।"

মালতী হাসতে হাসতে বলল, "তাই বলুন তবে !"

"বই ফেরত চাইতে টেলিফোন করি নি।"

মালতী অনির্বচনীয় আনন্দে নির্বাক রইল। দেবেশ একটু থেমে বলল, "টেলিফোন করবার জন্যেই টেলিফোন:করা—এটা মীনস্ নয়, এণ্ড্।" সাধারণ কথারও সাহিত্যিক বা দার্শনিক রূপ না দিয়ে দেবেশের শান্তি নেই।

"বই ফেরত চাইলেও দিতুম না। আমার পড়া হয় নি এখনও।—" মালতী বললে কণ্ঠে কপট প্রত্যাখানের সুধা ঢেলে। দেবেশের কর্ণেও তা সুধা বর্ষণ করল। সে কি জানত যে আপত্তিতে, অবাধ্যতায় এত সুধা আছে ?

"বইটা যদি আপনি একেবারেই ফিরিয়ে না দেন, তাহলে খুশি হব সব-চাইতে বেশি।"—দেবেশ বললে কথাটা শুনতে ভালো বলে।

মালতী এতটা আশা করে নি। আশাতীত প্রাপ্তিতে কিছু বিব্রতই বোধ করল বুঝি, বলল, "কেন টেলিফোন করলেন তা কিন্তু বলেন নি এখনও।"—জেরাকে মধুর করল হাসি দিয়ে।

"বলেছি তো, বিশেষ কোনো কারণে নয়। টেলিফোন করবার জন্যে। বলার জন্যে।"

" 'বলা' কিন্তু সকর্মক ক্রিয়া—একটা অব্‌জেক্ট চাই তার, ব্যাকরণ অনুযায়ী।"

দেবেশ মুগ্ধ হোলো। তার পরিচিত এমন একজন মেয়ের কথাও ভাবতে পারল না যে এমন একটা উত্তর দিতে পারত। তার মনে সন্দেহ রইল না যে, মালতী অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে তুলনীয়া নয়। পরাজয় স্বীকার করল। পরাজয়ে যে এত আনন্দ, তাই কি জানত দেবেশ এর আগে?

"আপনাকে অকারণে যে টেলিফোন করেছি, এটাই তো বাংলা ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। আপনাকে আমার এমন টেলিফোন করাটাই যে নিপাতন। তাই নয়?"

মালতী দেবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পরে এই প্রথম আত্মসচেতন হোলো। যে কাঁটাতার দিয়ে তার জীবন ঘেরা ছিল, তার কাঁটাগুলি আবার চোখে বিঁধল। দশ বছর আগে যে কারাকক্ষে হাত-পা বাঁধা হয়ে সে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, এই প্রথম সেই কারাপ্রাচীরের অনতিক্রমণীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হোলো। মর্মান্তিক দুর্দৈব এই যে, নীরন্ধ্র বন্দীজীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিল সে, যে মালতীর জীবনে এনেছিল মুক্তির আশ্বাস।

দেবেশ মালতীর নৈঃশব্দ্যে নিরাশ হোলো। কারণ বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হোলো। মনে মনে ঠিক করল শুনতে ভালো বলেই কোনো কথা বলবে না আর কখনও। আর সত্যি,

কথাটা শুনতেও যে ভালো তাও তো নয়, মালতীরই তো ভালো লাগে নি!

অনেক কথা, অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র আছে, যারা সাহিত্যে উপাদেয় এবং উপভোগ্য; কিন্তু বাস্তবে তারা কখনো আপত্তিকর, কখনো বা শুধু বিরক্তিকর। দেবেশ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

"আবার কবে আসছেন বলুন?"

"আপনি বলুন!"—মালতী আর কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

"যদি বলি আজ?"

"যদি জিজ্ঞেস করি আজ কেন?"

"আজ নয় কেন?"

"তা তো হতে পারে না। আপনি বলেছেন আজ, তাই আজ কেন তা বলবার 'ওনাস' আপনার উপর।"

শুধু মাত্র ব্যাকরণ নয়, আইনও? দেবেশ আগে মুগ্ধ হয়েছিল, এবার অভিভূত হোলো। যে উত্তরগুলি সে নিজে দিতে পারলে খুশি হোতো, সেগুলি অন্য আর একজন এবং সে মেয়ে, দিচ্ছে এ কথা তার বিশ্বাস করতে যত কষ্ট হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছিল। সে আনন্দ গোপন করল না। হাসতে হাসতে বলল, "আপনার শ্বশুর দিগ্বিজয়ী জজ, আপনি দুর্ধর্ষ উকিল।"

মালতী উল্লাসে হেসে উঠল, "উহুঁ, আমি আসামী, যদি—" মালতী আর বলবে কি না ভেবে পেল না।

"যদি ?"

"থাক্, আজ বলব না। দেখা হলে বলব।"

"এ দুটো তো পরস্পরবিরোধী নয়—অর্থাৎ আজ এবং দেখা হওয়া।"

"না, আপনার শব্দতত্ত্বের হিসেবে নয়, কিন্তু—"

"কিন্তু নেই আর, শব্দই ব্রহ্ম।"

মালতী সানন্দ বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। এ লোকটা এমন জোর দিয়ে কথা বলে কিসের জোরে ? কেন ওর অনুরোধ শোনায় অমোঘ আদেশের মতো ? মালতী এ প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পেল না। কিন্তু আদেশ না-মেনেও পারল না।

"আচ্ছা, যাওয়ার কারণ না হয় বলবেন না। একটা অজুহাত দিন অন্তত।"

"তা দিতে পারি।"—দেবেশের উল্লাস উপচে পড়ছিল, "অজুহাত আবিষ্কার করতে আমি বিশেষ কুশলী।"

"দেখা যাক।"

"আজ আমার জন্মদিন।"

মালতীর নিশ্বাস রুদ্ধ হোলো অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে। এমন কী করে হতে পারে যে, আজ দেবেশের জন্মদিন ? এ কি একান্তই আকস্মিক সাদৃশ্য ? না, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পূর্বপরিকল্পিত সামঞ্জস্য ? মালতী ভেবে কূল পেল না। অদৃশ্য কোন অঙ্গুলিনির্দেশ আছে এই অদ্ভুত আকস্মিকতায় ?

মালতী কিন্তু বলল না যে, আজ তারও জন্মদিন। টেলিফোনে বলার মতো কথা নয় ওটা। এমন কথা বলতে

হয় মুখোমুখি। তার চেয়েও ভালো কানে-কানে (টেলিফোনের তার দিয়ে নয় তাই বলে)। এখন তাই বললই না সে কথাটা, কিন্তু খুব ভালো লাগল এই নতুন আবিষ্কারটা। কপট অবিশ্বাসে বলল, "সত্যি আজ আপনার জন্মদিন?"

সত্য-মিথ্যার উল্লেখে, হোক তা পরিহাসপরম্পরায়, দেবেশের সকল সেন্‌স্ অব হিউমর অন্তর্হিত হয়। বিধবার শুচিবাইয়ের মতো তার আছে সত্যবাই। সত্য ওর কাছে সত্যই, আর মিথ্যা মিথ্যাই। এ দুটোর মধ্যে আর কিছু নেই। এ দুয়ে নেই সন্ধি। দেবেশ শুধু ছেলেবেলায়-পড়া কদাচ মিথ্যা বলিবে না—এইটেই মেনে চলে না, অনেক সময় অদরকারী সত্য বলেও অত্যন্ত পরিহার্য গোলযোগের সৃষ্টি করে। মালতীর কথা শুনে তাই একবার দেবেশের মনে হোলো যে টেলিফোন রেখে দেয় এ কথা জানিয়ে দিয়ে যে, দেবেশ মুখোপাধ্যায় পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা বলে না। ক্রোধ সম্বরণ করে বলল, "আপনি এলে কোষ্ঠী খুলে দেখাব যে, আজ থেকে সাতাশ বছর আগে বারোই আষাঢ়, ইংরেজী ২৬এ জুন আমার জন্ম হয়েছিল।"

"কী বার ছিল?"—মালতী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল।

"শনিবার।"

মালতী বিস্ময়ে আর আনন্দে আর কথা বলতে পারছিল না, বলল, "কখন যাব বলুন?"

"সন্ধ্যার সময় আসুন।"

"সন্ধ্যা তো বিশেষ একটা মুহূর্ত নয়, যা ঘড়ি দেখলে

বোঝা যায়। আরও ঠিক করে বলুন, কখন এলে আপনার অসুবিধা হবে না।”

দেবেশ এমন প্রত্যুত্তরপন্ন কারও সঙ্গে কথা বলে নি এর আগে। এমন লোকের সঙ্গেই তো টেনিস খেলা যায় যে সার্ভিস ফিরিয়ে দেবে। প্রতিপক্ষ যদি বল ধরে রাখে, তা হলে কি খেলা হয়? না, কথা হয় এমন লোকের সঙ্গে যে উত্তর দিতে পারে না? দেবেশ কথা বাড়াবার জন্যেই বললে, “আপনাকে যখন সন্ধ্যা বলি, তার মানে এ. এ. বি-র লাইটিং আপ টাইম—আজ যা ছটা পঁচিশ মিনিট।”

মালতী সমস্ত বিস্মৃত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রতিশ্রুতি দিল, “তাই যাব।”

টেলিফোন রেখে দিয়ে মালতী রেডিওটা খুলে দিল। সরোজ যে সাড়ে ছটায় আসবে, সাতটায় যে দাদাকে টেলিফোন করতে হবে নৈনিতাল যাওয়ার তারিখ নির্ধারণ করতে, সাড়ে আটটায় যে শ্বশুরের খাবার সময় উপস্থিত থাকতে হবে—এই সব কিছু মনে হওয়ার আগেই কে, যেন রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে উঠল, ‘জীবনে পরম লগন করো না হেলা, করো না হেলা, হে গরবিনী।’

এই রকমের নানাবিধ আকস্মিকতা নিয়ে মালতী যে স্বপ্নের জাল বুনল, তাতে স্বেচ্ছাবন্দিনী হয়ে সে পরম আনন্দ লাভ করল। নানা করণীয়ের দীর্ঘ তালিকা কোথায় যে হারিয়ে গেল, মালতী তার সন্ধান পেল না। সন্ধান করলও না।

আট

ভোর না হতেই মা আজ কালীবাড়ি গিয়েছিলেন ছেলের জন্মদিনে পূজো দিতে। এমনিতেই কালীবাড়ি যেতে তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু আজ যে বিশেষ একটি দিন। দেবুর জন্মদিন। দেবু তো শুধু ছেলে নয়, এমন কি বড়ো ছেলে মাত্র নয়। দেবু তাঁর সকল আশা সকল আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। দেবু তাঁর জীবনের সকল ক্ষতের, সকল ক্ষতির উদার পূরণ। দেবু বড়ো হয়ে উঠেছে মাকে ঘিরে, মা আজও বেঁচে আছেন দেবুকে ঘিরে।

সকালেই পূজো দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তৃপ্তি হয় নি, যেন। সব কথা বুঝি বলা হয় নি কালীমাকে। সারাদিনই তাই ভাবছিলেন যে, সময় পেলেই সন্ধ্যার দিকে আর একবার যাবেন কালীবাড়ি। বড়ো ভিড় থাকে তখন। কিন্তু পরিচিত সেই পুরোহিতটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বোধ হয় আর তেমন অসুবিধা হবে না। ভিড় সত্ত্বেও সে হয়তো তাঁকে নিয়ে যেতে পারবে মায়ের মন্দিরের অভ্যন্তরে। প্রবেশ লাভ করতে পারলে দেবীর পা ছুঁয়ে বলবেন, মা, তুমি এত দিয়েছ আমাকে, আরও চাইতে লজ্জা হওয়াই উচিত আমার। আমার দেবুকে তুমি বিদ্যা দিয়েছ, বুদ্ধি দিয়েছ, দিয়েছ দুর্লভ প্রতিভা। সে সব তো আমাকেই দেওয়া। আরও একটু দেবে না মা?

দেবে না আমার দেবুর মনে একটু শান্তি, জীবনে একটু স্বস্তি ? দেবে না ?

গরদের শাড়িটা পরে এসে মা অধ্যয়নরত পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, "তুই কি বেরুবি দেবু ?"

"না মা, তুমি বেরুচ্ছ বুঝি ?"

"যাই একটু ঘুরে আসি। আমার একটু দেরি হলেও হতে পারে। বাহাদুর বাড়ি রইল। তুই বেরুলে ওকে বলে যাস, ও নীচের দরজাটা বন্ধ করে দেবে।"

"আচ্ছা মা।"

দেবেশের জানতে বাকি ছিল না যে মা কালীবাড়ি যাচ্ছেন। বিশেষ উদ্দেশ্যটাও অজ্ঞাত ছিল না। সন্দেহ ছিল না যে মা দেবতার কাছে যা কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন তার সব কিছুই তার জন্যে, নিজের জন্যে কিছু নয়।

এই যে একান্তভাবে আর একজনের জন্যে বাঁচা, পৃথক সত্তাবিশিষ্ট অপর একজনকে এমন পরিপূর্ণভাবে আপন করে জানা, এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা নেই দেবেশের।

দেবেশ তার অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার কথা ভাবছিল। সে জানে, মাকে ভালবাসা কী অনুভূতি। জানে ভ্রাতৃস্নেহ, জানে বন্ধুপ্রীতি। অনাত্মীয়া নারীর প্রেমের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা নেই তার, কিন্তু সাহিত্যের পক্ষপাতিত্বের কল্যাণে এর পাঠ্য বিবরণ আছে ভূরি ভূরি। তা থেকে এই বিশেষ সম্বন্ধটার বিষয়ে অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু সন্তানকে ভালোবাসা ? আপন সৃষ্টিকে দিনের পর দিন আপন হাতে গড়ে তোলা ? নিজেরই

একটা স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্ন অংশকে নিজকে অতিক্রম করতে সাহায্য করা ? তারপর তাকেই একদিন অপরা নারীর হাতে সঁপে দেওয়া ? এ সবের কিছুই জানে না দেবেশ। নিজের অভিজ্ঞতার অপূর্ণতায় সে নিরাশ হোলো।

দেবেশ দোতলা থেকে নেমে এসে মাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। এটা স্বাভাবিক নয়। দেবেশ সাধারণত অভ্যাগতদের বেলায়ও এত লৌকিকতা করে না। কিন্তু আজ সে যেন নিজের মাকে আবিষ্কার করল নতুন করে, সদ্য উপলব্ধ নতুন এক স্নিগ্ধ অনুভূতির উদ্ভাসিত পরিপ্রেক্ষিতে।

মা চলে গেলে দেবেশ তখনই উপরে চলে এলো না। নীচের ঘরে বসে রইল। একা। অর্থাৎ তার সহস্র অসম্বদ্ধ চিন্তার অদৃশ্য সাথীত্বে। হঠাৎ চোখ খুলে দেখল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে নীচের ঘরটায়। উঠে আলোটা জ্বালতে যাবে, ঠিক এমনই সময় মালতী ঘরে ঢুকল ঘর আলো করে। দেবেশের মনে পড়ল যে মালতীকে সে আসতে বলেছিল।

মালতী প্রবেশ করেই একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। নীচের ঘরে শুধু ওরা দু'জন—দেবেশ আর মালতী। তায় আলো জ্বালা হয় নি। মালতীর সঙ্কোচের আর সীমা রইল না।

ভাবতে ভালো লাগল যে, দেবেশ বোধ হয় তারই প্রতীক্ষা করে নীচের ঘরে বসে ছিল। না, সে যেন too good to be true ! তবে কী ? মালতীর মন নানা আশা-আশঙ্কায় ভরে উঠল।

মালতী ভেবেছিল, দেবেশের জন্মদিনে ছোটখাটো কোনো

উৎসব বা নিমন্ত্রণের আয়োজন হবে বুঝি। টেলিফোনে আসতে স্বীকার করে তার পরে একটু বিড়ম্বিত বোধ করেছিল তাই নিয়ে। কেন:না, নিমন্ত্রণের মত নৈর্ব্যক্তিক একটা জনসমাগমে মালতী বড়ো অস্বস্তি বোধ করে। তাই সে যায় না বড়ো একটা কোন নিমন্ত্রণে। আজ নিমন্ত্রণের কোনো আয়োজন না দেখে আশ্বস্ত হোলো। কিন্তু অসংখ্য 'কিন্তু' রইল।

দেবেশ যখন বলল, 'চলুন উপরে গিয়ে বসা যাক' তখন মালতীর বিব্রত অবস্থা বাড়ল বই কমল না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অগ্রবর্তী দেবেশকে মালতী জিজ্ঞাসা করল, "মাসীমা কোথায়? উপরে বুঝি?"

"না, মা একটু বেরিয়েছে। আপনি আসবার অল্প কিছুক্ষণ আগে বেরুল।" একটু থেমে যোগ করল, "মা অবিশ্যি জানত না যে আপনি আসছেন।"

"আপনি বলেন নি বুঝি?"

"না তো!"

না তো? দেবেশ এমন সহজ নিরুদ্বেগ সুরে উত্তর দিল, যেন না বলাটাই একান্ত স্বাভাবিক। যেন মাসীমাকে বলাটাই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত হোতো। এই যে সমগ্র বাড়িটাতে এখন দেবেশ এবং মালতী ছাড়া আর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই—বাহাদুর এ ব্যাপারে গণনীয় নয়,—এই যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এখন যদি অকস্মাৎ কেউ দেবেশের বা তার মার সন্ধানে এসে পড়ে এবং এই দুজনের অবস্থিতি দেখে অশোভন বিস্ময় প্রকাশ করে, কিংবা তার চাইতেও মারাত্মক,

প্রকাশ স্থগিত রাখে—তাই যেন অভাবনীয় 'পরিস্থিতি'। সম্ভাব্যতার বিস্তৃত দিগন্তের সুদূরতম কোণেও যে এমন আশঙ্কা ছিল, দেবেশের নিশ্চিন্ত ও সহজ গতি থেকে তা অনুমান করবার উপায় ছিল না। মালতী ভীরু পদক্ষেপে দেবেশের অনুগমন করে উপরে উঠল। কিন্তু অজানা ভয়ে তার বুক কাঁপতে থাকল।

উপরে এসে আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বলল, "আপনার বইটা আনতে ভুলে গেছি কিন্তু।"

"গুড, ভালো হয়েছে। বইটা আনেন নি, মানে—ওটা ফেরত দিতে আপনাকে অন্তত আরও একদিন আসতে হবে। অর্থাৎ আমার একটা দুরূহ সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে গেল।"

মালতী অনিশ্চিতভাবে খুশি হোলো, কিন্তু দেবেশের সব কথা স্পষ্ট বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, "সমস্যাটা কী আবার?"

"সমস্যা হচ্ছে কন্‌টিনিউটি, ধারারক্ষা। আমি আর যাই পারি, সীরিয়াল উপন্যাস লিখতে পারব না কখনও। এই যে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের শেষে 'ক্রমশ' লিখে পাঠকের উৎসাহ ও কৌতূহল জীইয়ে রাখা, এ আমি কখনোই পারব না। তাই বেশির ভাগ লোকের সঙ্গেই আমার প্রথম সাক্ষাৎই শেষ সাক্ষাৎ হয়, কেননা, প্রত্যেকটা দেখাই আপনাতে সম্পূর্ণ, কম্‌প্লিট একটা এপিসোড। পরের দেখার জন্যে কিছু বাকি রাখা, হাতে রাখা, এই সঞ্চয়ের প্রতিভা নেই আমার।

দ্বিতীয়বার দেখাতেও তাই আমাকে শুরু করতে হয় আবার প্রথম থেকে—প্লীজ্‌ড টু হ্যাভ মেট ইউ থেকে।”

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। কিন্তু মালতী মোটেই নিরাপদ বোধ করছিল না। সে এখন তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু মাসীমার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া কি ঠিক হবে? মাসীমা এসে যখন শুনবেন যে, মালতী এসেছিল, তখন তিনি কী মনে করবেন? তাঁর জন্যে অপেক্ষা করাই ভালো তাহোলে।

কিন্তু এসে যখন দেখবেন, দেবেশ ও মালতী উপরের ঘরে একা, তখনই বা কী মনে করবেন?

এসব ভীতির কথা অল্প-পরিচিত পুরুষের কাছে উল্লেখ করলে অশোভন শোনায়। কেউ হাসে, কেউ বা এই ভীতিকে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত মনে করে তৎপর হয়। দুইই মারাত্মক।

মালতী চুপ করে বসে রইল।

দেবেশ অতিথিসৎকারের কর্তব্যের কথা স্মরণ করে লৌকিকতার কপট গম্ভীর স্বরে সমারোহ করে বলল, “বাহাদুরকে যদি অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে সে আপনার জন্যে এক কাপ চা করবে এবং ভৃত্যজনোচিত পরিমিতি-বোধহীনতাবশত এক কাপের জায়গায় দ্বিগুণ জল দিয়ে ফেললে উদ্বৃত্তটুকু দিয়ে আমাকেও এক কাপ চা দেবে। আমি অতীব তৃষ্ণার্ত।”

চা মানেই তো আরও দেরি। মালতী দেবেশের পরিহাস

উপভোগ করল, কিন্তু দুশ্চিন্তা বিস্মৃত হোলো না। মৃদুহাস্যে প্রত্যাশিত উত্তর দিল, বলল, "বলুন।"

স্বভাবত দেবেশ স্বল্পভাষী। কিন্তু আজ তার কথা বলতে ভালো লাগছিল। বলল, "আমি অবিশ্যি এখন চায়ের বদলে কফি পেলেই বেশি খুশি হতেম।"

কফি মালতীরও প্রিয় পানীয়, বলল, "আমিও কফিই বেশি পছন্দ করি।"

মালতীর মতৈক্যে দেবেশ বিব্রত হোলো, বলল, "কিন্তু এই দীনের কুটীরে কফির আয়োজন নেই তো। যদি অপেক্ষা করেন তো বাহাদুরকে কফি-হাউস থেকে নিয়ে আসতে বলতে পারি।"

"যাক, মাদ্রাজ বা সিংহল থেকে আনিয়ে দেবেন যে বলেন নি, তাও ভালো। কাজ নেই অত হাঙ্গামায়। চা-ই করতে বলুন বাহাদুরকে।"

চায়ের জন্যে জল গরম হতে থাকল। মালতী ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, ভগবানের কাছে কী প্রার্থনা করবে, মাসীমার তাড়াতাড়ি এসে পড়া, না, তার আগে মালতীর চলে যেতে পারা? মালতীর নির্দেশের অভাবে বিধাতা আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করলেন।

মাসীমার আসতে দেরি হোলো অনেক। দেবেশ নানা রকমের আলোচনা শোনাল মালতীকে, একবারও খোঁজ নিল না যে সে সকল বিষয়ে মালতীর কৌতূহল কতখানি। মালতীর শুনতে ভালো লাগছিল দেবেশের কথা। মাঝে মাঝে

সপ্রশংস হাসি হেসে প্রচুর প্রেরণা যোগাল মালতী। দেবেশ কেবলই ভাবতে থাকল, এমন শ্রোতা পেলে তবেই তো কথা ক'য়ে সুখ।

হঠাৎ দেবেশের মনে হোলো যে, আলোচনা বড়ো অ্যাকাডেমিক হয়ে পড়ছে বোধ হয়। ব্যক্তিগত একটা কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্যেই বলল, "আপনি খুব ছবি দেখেন বুঝি?"

"খুব নয়।"

"আপনার ভাষায় 'খুব নয়' মানে বুঝি সপ্তাহে সাতটা?"

মালতী সশব্দে হেসে উঠল। তারপর কি একটা বিশেষ বাংলা ছবির কথা উঠল যেন। মালতীর ছবিটা ভালো লেগেছিল। দেবেশও ছবিটা দেখেছে। মালতীর উল্লেখের ভঙ্গী থেকে বুঝতে বাকি রইল না যে, এ সম্বন্ধে দুয়ের মত এক নয়। দেবেশ তার মতামত সম্বন্ধে সাধারণত অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, প্রায় রূঢ়ভাষী। কিন্তু আজ পারল না কঠোর মন্তব্য করতে, বলল, "তা ঠিক, আরও ভালো হতে পারত, কিন্তু আরও খারাপ যে হতে পারত না তাও নয়।"

মালতী তার নিজের বিচারশক্তি সম্বন্ধে সাধারণত অত্যন্ত নির্ভীক। পরের মতের সঙ্গে না মিললেই নিজের মতটাকে প্রত্যাখ্যান করে না। আজ কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত বোধ করল না। দেবেশের সমর্থন না পেয়ে মনে মনে বলল, তাই তো, কী এমন ছিল ছবিটাতে?

এমনই আরও অনেক কথা হোলো। কিন্তু চায়েরও দেখা নেই, মাসীমারও না। মালতী মিনিট গুনল আর গুনল

প্রমাদ। দেবেশের নৈঃশব্দ্যের সুযোগে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওরে বাবা, আটটা বেজে গেছে!"

দেবেশও ঘড়ি দেখে বলল, "তাই তো!" মালতীর উক্তির ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করল না, ব্যস্ত রইল আপন বিস্ময় নিয়ে যে, এত তাড়াতাড়ি আটটা বেজে গেল! বলল, "সত্যি তো, কত তাড়াতাড়ি পুরো দুটো ঘণ্টা কেটে গেল দেখুন!"

মালতীর তাড়া ছিল। সময় তখন তার কাছে একটা দুর্জ্ঞেয় বিস্ময় নয়; দুর্যোগ, বিপদ। বলল, "সময় তাড়াতাড়ি যায় নি এবং যদি অমিত রায়ের মতো সময়ের রিলেটিভিটি নিয়ে বক্তৃতা না করেন তাহলে বলি যে, গত দু ঘণ্টার প্রত্যেকটা মিনিটেই ষাট সেকেণ্ড ছিল, পাঁচ, এমন কি পঞ্চাশ সেকেণ্ডও নয়।"

কোনো একটা থিয়োরিতে এসে গেলেই দেবেশের আর কথার অভাব হয় না, বলল, "অমিত রায় আইন্‌স্টিনের আবিষ্কার সম্বন্ধে আমার চাইতেও অজ্ঞ ছিল। আসল গল্পটা হচ্ছে এই যে, আইন্‌স্টিন যখন তাঁর দুরূহ থিয়োরি ঘোষণা করলেন, তখন নানা দিক থেকে নানা জিজ্ঞাসা এলো। সবাই বলে, তোমার অঙ্ক বুঝি নে, অত বিদ্যে নেই; সহজবোধ্য ভাষায় বলো, কী বলতে চাও? বৃদ্ধ বিজ্ঞানী তখন তাঁর সেক্রেটারিকে বলে দিলেন যে, এর পরে যে টেলিফোন করে রিলেটিভিটি জানতে চাইবে তাকে বলবে—জ্বলন্ত স্টোভের পরে পা রেখেছ কখনও? চার সেকেণ্ডকে তখন চার যুগ মনে হয় নি? আর প্রিয়জনের পাশে বসেছ কখনও? চার

ঘণ্টাকে তখন মনে হয় নি চারটে সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত বলে? এই যে প্রভেদ, এই হচ্ছে আমার আবিষ্কার। এই বলেই টেলিফোন রেখে দেবে।"

কাহিনীটার প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য বুঝতে পেরে মালতী সলজ্জ হাসি হেসে বলল, "যাক, আপনি জ্বলন্ত স্টোভের উপর বসে নেই তা হলে!"

বাহাদুরের হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে নিজে সেটা মালতীর সামনে রাখতে রাখতে দেবেশ বলল, "না, এবার বলুন তা হলে, তার্কিক বিয়োগ-পদ্ধতির প্রয়োগ করে, আমি কোথায় আছি।"

মালতীর দৃষ্টি এড়াল, উত্তরও।

দেবেশ আর একবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, শুনতে ভালো বলেই কোনো কথা আর বলবে না। বাক্যের চাতুরীকে কেউ বোঝে না চাতুরী বলে। শ্রুতিপ্রিয় হলে সব উক্তিই গৃহীত হয় আন্তরিক বলে। সব ভুল বোঝার শুরু তো সেই থেকে।

চা খাওয়া শেষ হতেই দেবেশ বলল, "এবারে আপনাকে ধরে রাখব কী অজুহাতে?"

"কোনো অজুহাত নেই। আমার ওঠবার বরং অজস্র সঙ্গত কারণ আছে।"

"দেরি হয়ে গেছে, এই তো?"

"তা ছাড়াও একটা আছে। আর একটু বাদেই আপনার বাড়ি আর একজন অতিথি আসবেন। তখন তো আপনিই

আমাকে উঠতে বলবেন। তার চাইতে নিজে থেকে আগেই যাওয়া ভালো।”

“কে আবার আসবে? কারও সঙ্গে এমন কোনো কথা নেই তো!”

“তবু আসবে।”

“বিশ্বাস করুন, স্বয়ং ভগবান যদি এখন তাঁর কার্ড পাঠান বাহাদুর:কে দিয়ে, তা হলেও বলব, সাব্‌কো দুস্‌রা কিসি বখ্‌ত্‌ আনে বোলো!” দেবেশ একটা উর্দু কথা ব্যবহার করতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হোলো।

মালতী যুক্তপ্রদেশবাসিনী। হিন্দুস্থানী ভাষার সঙ্গে পরিচয় তার শৈশব থেকে। দেবেশের হিন্দীতে সে মুগ্ধ হোলো না, কিন্তু খুশি হোলো আতিথ্যের তুলনামূলক মূল্যবিচারে ঈশ্বরের শোচনীয় পরাজয়ে। কিন্তু উঠতে তাকে হবেই। মামীমা যে বলেছিলেন, আজ সন্ধ্যায় দেবেশের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন! এসে যদি দেখেন মালতী এখানে, তা হলে আর রক্ষা নেই। মামীমাকে কিছু জানানো আর রয়টারের আপিসে কোনো খবর রেখে আসা তো একই কথা! মালতী উত্থানের উদ্যোগ করল।

কে আসবে কে না-আসবে, তা নিয়ে দেবেশের আর কৌতূহল ছিল না। মালতী যে এখনই চলে যাবে, তারই আসন্নতায় তার মন ছিল আচ্ছন্ন। কী করে ধরে রাখবে? আবার কবে দেখা হবে? দেখা হলে তারপর? তারপর? প্রশ্নগুলি দেবেশের মনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত

অশোভন এবং অভূতপূর্ব তড়িদ্‌বেগে ইতস্তত সঞ্চরণ করতে থাকল, কিন্তু দেবেশ তার একটাকেও প্রকাশ করবার মত উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেল না।

অনেক ভেবে বলল, "কিন্তু আপনার মামীমা এলেই আপনাকে তার আগে পলায়ন করতে হবে এমন বিধান দিলে কে?

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। মালতী বলল, "সে আপনি বুঝবেন না, এবং বুঝবেন না যে তা ভালোই।"

দীর্ঘনিশ্বাস গোপন না করে, দেবেশ কিছু বলবার আগেই, মালতী যোগ করল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে, আপনি বাংলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মান নি!" মালতী মুখ লুকোতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বাংলা দেশের মেয়ের করুণ ভাগ্যহীনতার উল্লেখ শুনলেই দেবেশের মনে হয় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কথা। এই উর্বরা উপন্যাস প্রসবিনীর কোন লেখাই মন দিয়ে পড়ে নি দেবেশ। তাই বিরূপ সমালোচনার অধিকার নেই তার। কিন্তু বালবিধবার নিঃসহায়তা আর স্বামীকুলের হৃদয়হীনতার সর্বজনীন নিন্দাবাদ—যা হয়তো বহুলাংশে প্রাপ্য—শুনলেই দেবেশ বিব্রত ও শঙ্কিত হয়। বাঙালী মেয়ের দুঃখের সত্যি অন্ত নেই, কিন্তু প্রভাবতী দেবী তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল কি না তা নিয়ে দেবেশের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দেবেশ বলল, "ডেস্‌টিনি-কে রোধ করতে চেষ্টা করে লাভ নেই। বরং দার্শনিকেরা বলেন,

তাকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আনাই বুদ্ধিমানের কাজ। চলুন তাহলে, আপনাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।”

দেবেশের কণ্ঠে এমন একটা অপরিমেয় হতাশার সুর পাওয়া গেল, যা মালতীর হৃদয় স্পর্শ করল। কিন্তু মালতীকে যেতেই হবে। মামীমা এসে পড়লে যে রসিকতার বন্যা শুরু হবে, তাতে মালতী যোগ না দিলে দেবেশ দেখবে তার রূঢ়তা। আর যোগ দিলে দেখবে তার রুচিহীনতা। না, তার আগেই যাওয়া ভালো। বলল, “চলুন।”

আবার তুজনে একসঙ্গে বেরুল রাস্তায়। ট্রাম-লাইনের পারে এসে আজ আর পুনরভিনীত হোলো না আগের দিনের ট্রাম ছেড়ে দেওয়ার খেলা। দেবেশের মনে ছিল অভিমান। মালতীর লজ্জা।

ট্রামটা ছাড়তেই মালতীর মনে হোলো, হায়, কিছুই যে বলা হোলো না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেবেশ ভাবলে, মুক্তি কোথায় আমার? মুক্তি? মালতী যে মন জুড়ে রয়েছে, যে মনে স্থান করতে হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শত সহস্র জটিল সমস্যার?

সেই সন্ধ্যার সাক্ষাতের পর্যালোচনা করে দেবেশের মনে হোলো, না, এ তো শুধু কথা নয়।

আর মালতীর মনে হোলো, হায়, এ যে শুধু কথা।

নয়

কথা। কথা। শুধু কথা।

কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত কথার উপর দেবেশের ছিল অচলা ভক্তি। কথার উপাসক ছিল সে। কথাস্বাধীন চিন্তা বা অনুভূতির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তার গভীর সন্দেহ ছিল। মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দেওয়া মানেই সেই সব মনে অনুভূতি দেওয়া। যার ভাষা নেই, তার ভাবও নেই; অর্থাৎ মূর্তি নেই, আকার নেই। অর্থাৎ অস্তিত্বই নেই। এই ছিল দেবেশের যুক্তি এবং বিশ্বাস।

আজকের সাহিত্যিকরা মজদুর-মার্কা গল্পে চাষী মজুরের যে দুঃখের কথা লেখেন, দেবেশ তা পড়ে চিন্তিত হয়। ওদের দুঃখ দেবেশের অজানা নয়। পথে একজন ভিখারী দেখে এলে সেদিন তার খাদ্য রোচে না, নিদ্রা ঘোচে। নিজেকে কেবলই বলে, এতে আমার কী অধিকার যা ওদের নেই? কিন্তু মাঝে মাঝে দেবেশের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই দুঃখগুলি সত্যি আছে কি না।

দুঃখের উৎস তো মন। সেই মনই যদি না জানল, তা হলে দুঃখই বা কোথায় আর সুখই বা কোথায়? যে সিগারেটই খায় না, সে কি কাঁচি-মার্কা সিগারেটের বিজ্ঞাপন পড়ে বিলাপ করবে? কখনোই না। আমি যা জানি নে, তা আমি হারাই কেমন করে? যে বিলাস আমার আছে এবং

প্রোলিটারিয়টের নেই, তা নিয়ে শেষোক্তের অজ্ঞ শান্তির ব্যাঘাত তো ঘটবে শুধু তখনই, যখন তার অজ্ঞতার অবসান হয়েছে। তার আগে নয়।

সেই বিলাসগুলির অনবিমিশ্র আশীর্বাদের কথা শ্রমিকদের গোচরীভূত করা উচিত কি উচিত নয়, সে আলাদা তর্ক। হয়তো উচিত, হয়তো উচিত নয়। মোহমুক্ত হলে পরিশ্রম-জীবী-শ্রেণী যে যন্ত্রসভ্যতার বিলাস পরিহার করতে উন্মুখ হয়ে উঠবে বলে দেবেশ নিশ্চিত জানে, তার প্রলোভনে শ্রমিক-চাষীকে উন্মত্ত না করবার পক্ষে নিশ্চয়ই অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু সে আলাদা তর্ক। আসল কথা হচ্ছে, শ্রমিক-চাষী যে দুঃখ সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন তা নিয়ে আজকের সাহিত্যরচনা অসাধুতার সামিল নয় কি? শ্রমিককে দিয়ে অননুভূত দুঃখের কথা বলানো কি পরোক্ষে অনৃতভাষণ নয়?

কলকাতার পথে দেখা যায়, লৌহকণ্টকের শয্যায় শায়িত সন্ন্যাসীদের। দিব্য আরামে শুয়ে আছেন। ব্যথা লাগলে নিশ্চয়ই অমনভাবে শুয়ে থাকতেন না, কেন না কোনো আইন নেই অমন শয্যায় শুতে কাউকে বাধ্য করবার জন্যে। তাঁদের দেখে কি অশ্রু বিসর্জন করতে হবে? আর অশ্রু বিসর্জন করলে সে কি পাঞ্জাবী শিখের পাগড়ী দেখে সদয়া বিদেশিনীর অনুকম্পার মতো অলীক ও হাস্যকর হবে না? কাঁটা সেই সন্নাসীর কাছে কাঁটা নয়, পাগড়ী নয় শিখের মাথার ব্যাণ্ডেজ।

দেবেশ বলত *Cogito ergo sum*-এর চাইতে সত্য হচ্ছে *Dico ergo sum*। আমি ভাবি, তাই আমি আছি নয়।

দেবেশ বলত, আমি বলি, তাই আমি আছি। বেতারবক্তার জীবিকার প্রশ্ন নয় এটা,—যদিও ওর উক্তির এই হাস্যকর দ্বিতীয় অর্থ ওর দৃষ্টি এড়ায় নি, - প্রশ্ন হচ্ছে ভাষাহীন ভাব আছে কি নেই। দেবেশ বলত, নেই। আমাদের সকল চিন্তার বাহন ভাষা। বাহন বাদে ভাব অচল।

বস্তুত আজকের জীবনই তো বাক্‌সর্বস্ব।

মুশকিল হচ্ছে এই যে দেবেশের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় অত্যন্ত পরিমিত। এ কথা আমি দেবেশকে বহুবার বলেছি। সে মানে নি। তবু কথাটা সত্যি। আমি বললে তখন, নিরুপায় হয়ে, দেবেশ বলবে, "আচ্ছা, আধুনিক উপন্যাসের দিকে তাকাও একবার। দেখবে, একমাত্র ম'ম এবং গ্রেহাম্ গ্রীন্ ব্যতীত দ্বিতীয় পাঠযোগ্য কোনো লেখক নেই, যার উপন্যাসে কথা ছাড়া আর কিছু আছে। ওয়র্ডস, ওয়র্ডস, ওয়র্ডস।"

কথাটা যে মিথ্যা নয়, তা এই দেবেশ-মালতী কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে বসে মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছি।

ঘটনা বলে কোনো বস্তু নেই আজকের নাগরিক জীবনে। আছে শুধু কথা। বৃহৎ কোনো বিপদ এখানে নায়ককে এনে দেয় না নায়িকার সান্নিধ্যে, বৃহৎ কোনো বিপদ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় না চিরদিনের জন্যে। পথিক এখানে পথও হারায় না, আর কেউ এসে হাত ধরে জিজ্ঞাসাও করে না, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?'

সত্য বলতে কি, এখানে এমন কিছুই ঘটে না যাকে ঘটনা বলতে পারি।

এখানে একজন ভালো কথা বলে আর অপর জন তার ভালো উত্তর দেয়, তাই নিয়ে হয় প্রেম। পরে অপর জন ভালো কথা বলে এবং প্রথম জন তার ভালো উত্তর দেয় না, তাই নিয়ে বিচ্ছেদ।

কথা। শুধু কথা।

সম্প্রতি কিন্তু দেবেশের একটা বিষয়ে একটু সন্দেহ জেগেছে। সে যেন অত্যন্ত গভীর অনমুমোদনের সঙ্গে এমন কয়েকটা অনুভূতির আভাসের সন্ধান পাচ্ছে, যার যথাযথ কথারূপ সে খুঁজে পাচ্ছে না। ভাষা নেই, তবু ভাবগুলিকে কিছুতেই যেন অস্পষ্টভাবে স্বীকার না করে পারছে না।

দশ

বাড়ি ফিরে দেবেশ অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, সময় দিল মালতীকে বাড়ি পৌঁছোবার। তারপরেই টেলিফোনে ডাকল মালতীকে।

মালতী তার ঘরে প্রবেশ করতে না করতেই শুনল টেলিফোনের ডাক। সে ফিরেছিল নৈরাশ্যের বোঝা নিয়ে। নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা মালতীর ভালো লাগে, কিন্তু সে রেডিওর বক্তৃতায় বা মুদ্রিত রচনায়। জীবন্ত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত হলে সে চায় না মৃত চিন্তানায়কদের মৃত গবেষণার মৃত ফলাফল নিয়ে কথা বলে সময়ের অপচয় করতে।

অথচ দেবেশ কি তাই করে নি? একবারও দেবেশ বলে নি নিজের কোনো কথা, জিজ্ঞাসা করে নি মালতীর কোনো কথা। মালতী তো কলেজের ক্লাসে যায় নি, গিয়েছিল আকাঙ্ক্ষিত এক পুরুষেব আহ্বানে সাড়া দিতে। অথচ ফিরতে হোলো তাকে এক রাশি বক্তৃতা নিয়ে। আর কিছু নয়।

মালতী টেলিফোন তুলল। অপরিসীম অনিচ্ছা গোপন করবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করে বলল, "হ্যালো!"

"হ্যালো!"

মালতীর হাত থেকে টেলিফোন যে খসে পড়ল না, তার জন্যে মালতী দায়ী নয়। একবারও সে কল্পনা করে নি যে,

বুদ্ধিসর্বস্ব ওই বাগ্‌যন্ত্রটা সহসা হৃদয়বান হয়ে এখনই তাকে টেলিফোন করবে। আর কিছু ভেবে না পেয়ে আপন কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে মালতী আবার বলল, "হ্যালো।"

দেবেশ ট্রাম-লাইন থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অনেক ভেবেছে। সে জানত, সে কী করছে। তার কণ্ঠে ছিল সন্দেহমুক্ত নিশ্চয়তার সুর। মালতীর নির্ভুল স্বর শুনেই বলল "আপনাকে এত বাজে কথা বলে বিরক্ত করলেম এতক্ষণ ধরে ; অথচ সব চাইতে জরুরী, সব চাইতে আগে যেটা জিজ্ঞেস করবার কথা, সেই কথাটাই ভুলে গেছি।"

মালতীর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না, অজ্ঞাতসারে তার কণ্ঠ থেকে যে উত্তর এলো, তার একমাত্র মুদ্রণযোগ্য রূপ—"?"

দেবেশ আর কিছুর জন্যে অপেক্ষা করল না, বলল, "সেই কথাটা হচ্ছে কাল আপনি কী করছেন?"

কাল মালতীর অনেক কাজ। নৈনিতাল যাবার ব্যবস্থাটা পাকা করতে হবে দাদাকে টেলিফোন করে। তার পরে কিনতে হবে নানা ছোটখাট কিন্তু অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র। ছোট ভাইবোনদের জন্যে কিনতে হবে তাদের মনোমত উপহার। কিনতে হবে মার জন্যে শাড়ি, বাবার জন্যে একটা পাইপ আর কিছু বিশেষ একটা ব্র্যাণ্ডের তামাক। ঝি-চাকরদের কথাও ভুললে চলবে না। এত দিন পরে দিদিমণি ফিরবে শ্বশুরবাড়ি থেকে, ওরা পথ চেয়ে থাকবে কত আশা

নিয়ে। তারপর যাবার আগে দেখা করে যেতে হবে বহু আত্মীয় এবং তার চাইতেও বেশি বান্ধবীদের সঙ্গে। কলেজের পালা ঘুচল, আবার কবে কোথায় কার সঙ্গে দেখা হবে বা আদৌ হবে কি না, কে জানে। এবারেই তাই দেখা করে যেতে হবে। কাজের অন্ত ছিল না মালতীর। তবু বলল, "বিশেষ কিছু নয়, কেন বলুন তো?"

দেবেশ তার আগের দিন একটা ছবি দেখতে গিয়েছিল। রেডিওতে তার চিত্র-সমালোচনা করতে হবে, সেইজন্যেই। তা নয়তো সাধারণত ছবি দেখে না দেবেশ। ভালো লাগে না। সিনেমাকে এখনও সে সীরিয়স্ আর্ট ফর্মের মর্যাদা দেয় না। আর দেবেশের আনন্দ তার শিক্ষা এবং সংস্কৃতি থেকে এমনই অভিন্ন এবং অবিভাজ্য যে, ওই দুটো জিনিস বিস্মৃত হয়ে সে আনন্দ আহরণ করতে জানে না চলচ্চিত্রের বুদ্ধিবিরহিত তথাকথিত প্রমোদপরিবেশন থেকে। কিন্তু তার অভিজ্ঞতার পরিমিতি সম্বন্ধে সে সজাগ। ইংরেজি এবং মার্কিন ছবি ছাড়া বড়ো একটা দেখে নি সে। শুনেছে যে, ফরাসী এবং রুশ ছবি অনেক উচ্চ স্তরের। তাই দক্ষিণ কলকাতার একটা ঘরে যখন নামকরা রুশ ছবি Road to Life দেখাবে বলে জানল, দেবেশ তখনই স্থির করল তার পরবর্তী চিত্রসমালোচনায় সেই ছবির অন্তর্ভুক্তি।

আগের দিনের ছবিটা দেবেশের ভালো লাগে নি। শুধু তাই নয়, তার সম্বন্ধে বলবার ও বিশেষ কিছু ভেবে পাচ্ছিল না দেবেশ। তার চেয়েও যা বিস্ময়কর, দেবেশের ছবিটা

দেখবার সময় নিজেকে ভয়ানক একা, নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছিল। তার সামনের সারিতেই বসেছিল একটি তরুণ আর একটি তরুণী। দেবেশের উপায় ছিল না মাঝে মাঝে তাদের দিকে না তাকিয়ে। তাদের কারও চোখ ছিল না পর্দার দিকে। দুজনে সম্পূর্ণ ব্যস্ত ছিল দুজনকে নিয়ে। পর্দায় যা প্রদর্শিত হচ্ছিল, তার তুলনায় চোখের সামনের অভিনয় অনেক বেশি উপাদেয় ছিল। দুজনের হাত ছিল দুজনের মুঠির মধ্যে, দুজনের আনন্দোদ্ভাসিত আননের মধ্যে দূরত্ব ছিল সংক্ষিপ্ততম। দেবেশের তখনই মনে হোলো, সত্যি, একা ছবি দেখার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। বিশেষ করে যদি বাজে ছবি হয়, যেমন ছিল আগের সন্ধ্যার ছবিটা।

তাই আজকের টেলিফোন।

দেবেশ বললে, "বিশেষ কিছু যখন করবার নেই, তখন, তখন—" অনেক ইতস্তত করে, ইংরেজী-বাংলায় মিশিয়ে শেষ করলে, "তখন, কাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে একটা রুশ ছবি দেখে আমাকে সম্মানিত করবেন কি? আপনি নিশ্চয় এর আগে কোন রুশ ছবি দেখেন নি, যেমন আমিও দেখিনি।"

"না, দেখিনি।" মালতা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিল সহজেই, কিন্তু প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। দেবেশ চুপ করে রইল, টেলিফোনটা কানের সঙ্গে চেপে ধরে।

"কিন্তু···" মালতী ভেবে পেলে না কী বলবে।

যা চাই, যখন তা দ্বারে এসে নাড়া দেয়, তখন কেন দ্বার খুলে দিতে পারি নে বিনা দ্বিধায়? তখন কেন নানা চিন্তা,

নানা ভাবনা এসে ভিড় করে মনের মধ্যে? চাইবার আগে কেন মনে আসে না সে সব কথা?

"কিন্তু…"—মালতী বিপদে পড়ল।

দেবেশ নিরতিশয় নিরাশ হোলো। আহত হোলো। বলল, "অবিশ্যি আপনার যদি কোনো অসুবিধে বা আপত্তি থাকে, তাহোলে জোর করব না। আপনাকে বিরক্ত করলেম বলে ক্ষমা করবেন। নমস্কার।"

মালতীকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে দেবেশ খট করে সজোরে টেলিফোন রেখে দিল। সেই সঙ্গে মালতীকে মন থেকে ঝেড়ে ফেললে সর্বকালের জন্যে। অন্তত দেবেশ তাই ভাবল। শোপেনহাওয়ারের রচনা-সঞ্চয়ন নিয়ে বসল। এখানে মতে না মিললে তা নিয়ে মনোমালিন্য হয় না। অনৈক্য এখানে মনকে মুষড়ে দেয় না, সতেজ করে। পড়াই ভালো। মালতী থাক তার আপন জগতে, কাজ নেই দেবেশের সেখানে প্রবেশ ভিক্ষা করবার। প্রয়োজনও নেই। দেবেশ জোর করে হাত দিয়ে মালতীকে সরিয়ে দিল তার মন থেকে, হাত মিলাল শোপেনহাওয়ারের সঙ্গে। নারী-জাতির বুদ্ধিগত দৈন্য নিয়ে লেখকের তিক্ত উক্তিগুলিকে দেবেশের অত্যুক্তি বলে মনে হোলো, কিন্তু সেগুলি পাঠ করে তার সাম্প্রতিক নৈরাশ্য বহুলাংশে শান্ত হোলো।

আর মালতী? টেলিফোন রেখে দেওয়ার উগ্র শব্দটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে তার বেশ খানিকটা সময় লাগল। প্রথমে সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল

না। সত্যি কি কেউ এমন অভদ্র হতে পারে? বিশেষ করে দেবেশ? মালতীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। নিজেকে মনে হোলো অপমানিত বলে। আর, এ অপমান মালতী তো যেচে নেয় নি। দেবেশ টেলিফোন করেছিল, মালতী নয়। তবে সে টেলিফোন রেখে দিল কোন অধিকারে? মালতীর একবার মনে হোলো, তখনই সে আবার টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করে দেবেশের এই অভদ্রতার অর্থ। আবার ভাবল, থাকগে, কী হবে জানতে চেয়ে? কাজ নেই অমন অভদ্রের সঙ্গে খামকা কথা বাড়িয়ে।

মালতী চেষ্টা করল অন্য দিকে মন দিতে। রুণুর শেষ চিঠিটার জবাব দেওয়া হয় নি। বসবে কি এখন তাই নিয়ে? ভালো লাগল না। তবে কি মামীমার ছেলের জন্যে ওই পুলোভারটা বুনে শেষ করে ফেলবে? কাঁটা দুটো নিয়ে বসল, অমনই কোল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল উলের বলটা। সেটাকে তুলে নেবার ধৈর্য আর রইল না। মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধে আছে দেবেশের অপমান। হাতের কাঁটা অচল হোলো। সরিয়ে রাখল বুনবার সরঞ্জাম।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে, দেবেশের দোষ নেই, সে টেলিফোন রাখে নি, টেলিফোন হঠাৎ কেটে দিয়েছে। টেলিফোনের মেয়েগুলি যা হয়েছে আজকাল, কিছুই বিশ্বাস নেই ওদের। হয়তো ওরাই কেটে দিয়েছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই।—মালতী নিজেকে বলল বারবার।

কিন্তু, মালতীর নিশ্চয়তা শিথিল হোলো, সেই কেটে দেওয়া

ঠিক দেবেশের 'নমস্কার' বলবার পরেই হবে, এটা কি একটু বিস্ময়কর নয় ? না, এই অদ্ভুত সাদৃশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। দেবেশই টেলিফোন রেখে দিয়েছে। মালতীর অপমানাহত মন টেলিফোন-অপারেটারদের দোষ দিয়ে সান্ত্বনা পেল না।

কিন্তু কেন ? কী অপরাধ করেছে মালতী ? সে তো 'না' বলে নি। তবে কেন ? মালতীর দেবেশকে দোষ দিতে ভালো লাগছিল না। সন্ধান করতে লাগল নিজের দোষ হয়েছে কি না। তার মনে হোলো, 'না' সে বলে নি, সে কথা সত্যি. কিন্তু 'হ্যাঁ' তো বলে নি। পরদিন সন্ধ্যায় তার বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, এ কথা তো মালতী নিজেই জানিয়েছিল দেবেশকে। অতএব, অসুবিধার প্রশ্ন অবান্তর। বাকি থাকে আপত্তি। সত্যি, মালতী যে বারবার 'কিন্তু' বলে ইতস্তত করেছে, তাইতে দেবেশ নিশ্চয়ই মনে করতে পারে যে, মালতীর আপত্তি আছে। আর তাহোলে অপমানিত বোধ করবার কথা তো দেবেশের, মালতীর নয়। তারপরে যদি দেবেশ টেলিফোন রেখে দিয়ে থাকে—যদি অপারেটররা সত্যি কিছু না করে থাকে—তার জন্যে দেবেশের দোষ কী ? দোষ তো মালতীর। মালতী নিজেকে নিঃসংশয়ে বোঝাল যে, দেবেশ তাকে অপমান করে নি, বরং সে-ই অক্ষমণীয় অভদ্রতা করেছে।

তবে কি টেলিফোন করবে আবার ? মালতী মন স্থির করতে পারল না। আচ্ছা, যদি টেলিফোন কেটে গিয়ে থাকত তাহলে দেবেশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে আবার ডাকত

মালতীকে। কই, ডাকে নি তো! না, অপারেটরদের অপরাধ নেই। অপরাধের সবটাই মালতীর। এখন টেলিফোন করবার কথা তারই। করল।

"হ্যালো।"

দেবেশ বই থেকে চোখ তুলে সাড়া দিল। শোপেন-হাওয়ারকে সরিয়ে বার বার তার মনে এই আশা জাগছিল যে, হয়তো মালতী তার অসৌজন্য ক্ষমা করবে, হয়তো সে আবার টেলিফোন করবে। করা উচিত তার নিজেরই। কিন্তু পৌরুষে বাধল যেন। অন্যায়ের স্বীকারে অপৌরুষ নেই, এই কথাটা নিজেকে বোঝাতে পারবার আগেই টেলিফোন বাজল।

"হ্যালো।"

মালতীর স্বর শোনা মাত্র দেবেশের ক্ষমা চাইবার সব চিন্তা মন থেকে অন্তর্হিত হোলো। শোপেনহাওয়ারের সহায়তায় যে নৈরাশ্য বিরক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তারই সুর ছিল তার উত্তরে। বলল, "হ্যালো?"

মালতী বলল, "তখন হঠাৎ অমন করে টেলিফোন রেখে দিলেন যে?"

দেবেশের একটা দুর্বলতা ভালো কথা বলবার; আর একটা চতুর কথা বলবার। দুটোর সমন্বয় সম্ভব হলে ভালো, কিন্তু একটাকে বেছে নিতে হলে চতুরতার উপরই তার পক্ষপাত। মালতীর প্রশ্নের উত্তরে বলল, "ভারত-সরকারের টেলিফোন বিভাগের যে নির্দেশ আছে—বি ব্রীফ্ অন দি টেলিফোন—তার জন্যে রেখে দিই নি।"

মালতীর এই উত্তরটা ভালো লাগল না। উষ্মা গোপন করে বলল, "এটা তো নেগেটিভ কারণ হোলো। আসল কারণটা কী? কী অপরাধ করলেম আমি?"

অপরাধের উল্লেখেই দেবেশের সকল তিক্ততা, সকল কঠোরতা দ্রবীভূত হয়ে গেল। অপরাধ যে তার নিজের? নিতান্ত বিব্রত হয়ে বলল, "না, না, আপনার অপরাধ কোথায়? অপরাধ তো আমার।"

এই পর্যন্ত এসেও দেবেশ স্বীকার করতে পারল না যে, খট করে টেলিফোন রেখে দেওয়াটা অভদ্রতা হয়েছে। বলল, "অপরাধ তো আমার যে আপনাকে টেলিফোন করে অন্যায় অনুরোধ করে বিরক্ত করেছি।"

পূর্বেকার রূঢ়তার পরে এমন অপ্রত্যাশিত বিনয়ে মালতী বিস্মিত হোলো। বলল, "বিরক্ত মোটেই করেন নি। আমার টেলিফোন-নম্বর আমিই আপনাকে দিয়েছিলেম, নইলে টেলিফোন করবার কথা মনেও আসত না আপনার।"

"তাহলেও আপনাকে এমন অনুরোধ তো করেছি, যা আপনি রাখতে অনিচ্ছুক। সেটা তো অপরাধ।"

"অনিচ্ছা আর অক্ষমতা বুঝি আপনার কাছে সমার্থক?"

"না, তবে—"

"থাক, আর ব্যাখ্যায় কাজ নেই। কোন ঘরে কী ছবি বলুন। কোথায়, কখন দেখা করব?"

"আপনার উপর অন্যায় জোর করা হচ্ছে—"

"টেলিফোন রেখে দেওয়ার সময় বুঝি মনে ছিল না

অন্যায়ের কথা? বলুন, কোথায় আর কখন।"—মালতী অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটার দ্রুততম সমাপ্তি ঘটাতে চাইল।

"কিন্তু আপনি যে আপত্তি—"

মালতী দেবেশের কথা শেষ হতে দিল না। বলল, "আপত্তি নয়, ইতস্তত। এবং তা কেন করছিলেম তা যখন এখনও বোঝেন নি, আর বুঝে কাজ নেই। বলুন, কোথায় এবং কখন।"

দেবেশ বলল। টেলিফোন রেখে দিয়ে গবেষণা করতে বসল মালতীর মৌলিক আপত্তির উৎপত্তি নিয়ে। ভেবে পেল না কিছু। অচিরেই আদি আপত্তির নৈরাশ্য নিমজ্জিত হোলো পরবর্তী স্বীকৃতির আনন্দের সাগরে। সেই সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হোলো শোপেনহাওয়ার। মনে আর কানে বাজতে থাকল মালতীর কণ্ঠের সুর। সে সুরে ঝর্ণার গতি আছে, আছে সরোবরের স্থিতি। দেবেশ চোখ মুদে অবগাহন করল সেই সরোবরে, ভেসে চলল সেই ঝর্ণার সঙ্গে।

এগারো

দেবেশ মালতীকে সোজা সিনেমায় যেতে বলেছিল। ভেবেছিল, নিজেও আপিস থেকে সোজা যাবে। কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেল ছটার অনেক আগে। তাই বাড়ি ফিরল পাঁচটার কাছাকাছি।

মাকেও বলা ছিল যে, দেবেশ সন্ধ্যায় ছবি দেখতে যাবে। তাই ছেলেকে বাড়ি ফিরতে দেখে মা বললেন' "কী রে দেবু, তোর না ছবিতে যাবার কথা ?"

"এই একটু বাদেই বেরুব।"

"এই দিকেই কোথাও ছবি দেখবি বুঝি ? না কি আবার এসপ্ল্যানেডের দিকে যেতে হবে ?"

"না মা, এই দিকেই।"—দেবেশ আর কিছু বলল না। বলার প্রয়োজন ছিল না। মা কিছু জিজ্ঞাসাও করেন নি। কিন্তু দেবেশের অভ্যাস মাকে সব কথা বলা, কী ছবি, কোথায় হচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে, ইত্যাদি সব কিছু। আজও দেবেশ বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কেন যেন থেমে গেল। মাও কিছু না বলে চা আনতে গেলেন। দেবেশ হাত ধুতে গেল।

খাবার কিছু খেল না দেবেশ। চা-পানেও অত্যধিক ত্বরা দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "এ দিকেই যখন যাচ্ছিস, তখন এত তাড়া কেন ? সময় আছে বেশ।"

দেবেশ আবার বিব্রত বোধ করল। কিন্তু কিছু বলল না।

চা-টা শেষ করে কোটটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, "আসি মা।"

সিনেমায় যখন পৌঁছল, তখন ছটা বাজতে অন্তত পঁয়ত্রিশ মিনিট বাকি। বিদেশী ছবি। ভিড় নেই বেশি। রাশিয়ার নামোল্লেখমাত্র যাদের কর্ণে দেবদূতগণের সঙ্গীতসুধা বর্ষিত হয়, তাদের ছবিটা দেখা হয়ে গেছে। বাকি কারও বিশেষ কৌতূহল নেই বিদেশী পুরানো ছবি নিয়ে। দেবেশ তাই সিনেমার বাইরে দাঁড়িয়েছিল প্রায় একা। একা থাকলেই, বিশেষ করে কারও জন্যে অপেক্ষা করতে হলে, সময় চলে অসহ্য ধীর গতিতে। সামনের ঘড়িটার কুঁড়েমি যন্ত্রণা দেয়। মনে হয়, যেন ঘড়িটার হাতগুলির পায়ে বাত হয়েছে!

ঘড়ির হাতের পায়ে বাত! অতি আধুনিক গদ্য কবিতা থেকে উদ্ধৃত উৎকট একটা লাইন যেন! দেবেশের হাসি পেল। টিকিট কিনে এনে আবার যখন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ঘড়ির দিকে তাকাল, তখন আর গদ্য কবিতার কৌতুক রইল না। মালতীর দেরিতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সিনেমার সামনে প্রত্যেকটা ট্রাম এসে থামছে, আর দেবেশ খুঁজছে তার আকাঙ্ক্ষিত যাত্রীকে। অথচ মালতীর দেখা নেই। তবে কি মালতী আসবে না? দেবেশের মন দমে গেল এমন সম্ভাবনার কথা ভাবতেই। না, আসবে নিশ্চয়ই—দেবেশ নিজকে বলতে থাকল ট্রামের দিকে আর না তাকিয়ে।

হঠাৎ পিছন থেকে মালতী বলল, "আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, না?"

মালতীর মধুর হাসিতে দেবেশের সকল বিরক্তি মুহূর্তে অপনীত হলো, বলল, "তেমন বেশি নয়, কিন্তু দেরি করলেন কেন?"

"বা রে, দেরি কোথায়? এখনও তো পাঁচ মিনিট বাকি।"

"তা বটে। চলুন।"

দুজনে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করবার অল্পক্ষণের মধ্যেই আলো নিবল এবং ছবি শুরু হোলো। দেবেশ মন দিল পর্দায়। মালতী চেয়ারের বাঁ দিকে ব্যাগটা রাখতে চেষ্টা করছিল। অন্ধকারে ভালো দেখতে না পাওয়ায় তার হাতটা চলে এসেছিল দেবেশের চেয়ারে। দেবেশ তড়িৎ স্পৃষ্টের মত চমকে উঠে তার আসনের অন্তিম বামে আড়ষ্ট হয়ে বসল। মালতীর ভালো লাগল না।

দেবেশের একা ছবি দেখে অভ্যাস। তার নিয়তই চেষ্টা করে মনে রাখতে হচ্ছিল যে, আজ সে একা আসে নি। কিন্তু সবাক চিত্র দেখতে গিয়ে কথা বলতে দ্বিধা করছিল। হয়তো মালতী বিরক্ত হবে। হয়তো তার ছবি দেখায় ব্যাঘাত ঘটবে। দেবেশ ছবি দেখতে গেলে ছবিই দেখে, ছবিঘরটা তার কাছে অন্তরঙ্গতাবর্ধনের পটভূমি নয়। কেউ কথা বললে দেবেশ বিরক্ত হয়। আজ কি সে তাই করবে? কিন্তু পুরানো নিউজ রীল দেখতে ভালো লাগছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল, আস্তে আস্তে মালতীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলবার। অনিচ্ছায় এবং চেষ্টা করে দেবেশকে নীরব থাকতে হোলো।

মালতী প্রচুর ছবি দেখে। বেশির ভাগই সরোজের সঙ্গে। দুজনের কাছেই ছবিটা উপলক্ষ্য মাত্র, একান্ত গৌণ। মালতীর উদ্দেশ্য সময় কাটানো, সরোজের বাসনা মালতীর কাছে আসা। ওরা তাই ছবিতে গেলেই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে না, অনেক কথা বলে, বিশেষ করে মূল ছবি শুরু হবার আগে পর্যন্ত। মালতী তাই অস্বস্তি বোধ করছিল চুপ করে থেকে। বলল, "আমার আর একটু দেরি হলেই আপনি বুঝি চলে যেতেন, যেমন সেদিন টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন ?"

দেবেশ সেদিনের অসৌজন্যের কথা স্মরণ করে আবার লজ্জিত হোলো, বলল, "সেদিনের কথা মনে করিয়ে লজ্জা দেবেন না! অন্য সময় হয়তো পারব না, এখন এই অন্ধকারে আপনার কাছে কবুল করে ফেলি, সেদিন টেলিফোন রেখে দিয়ে নিজেকে কতবার ধিক্কার দিয়েছি আপনি জানেন না।"

"তাহলে তো আবার টেলিফোন করতে পারতেন! সেই টেলিফোন আবার আমাকেই করতে হোলো। লজ্জা বুঝি কেবল আপনার, না ?"

দু'জনেই অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথা বলছিল, যাতে প্রতিবেশী চিত্রামোদীদের অসুবিধা না হয়। আস্তে কথা বললে দেবেশের গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম মোটা হয়ে অসাধারণ গম্ভীর শোনায়। মালতীর তা ভালো লাগে। আর মালতীর কপটক্রুদ্ধ অভিযোগ দেবেশের কানে সুধা বর্ষণ করে।

মালতীর মনে একটা সন্দেহ ছিল। সে জানত না, দেবেশ তার মাকে আজকের একত্রে ছবি দেখার কথা বলেছে কিনা।

লুকিয়ে কোনো কাজ করতে মালতীর বাধে। কিন্তু মাসীমা জানলে মালতীর সম্বন্ধে কী ভাববেন, তা নিয়েও তার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। বিরামের সময় আলো জ্বললে মালতী জিজ্ঞাসা করল, "সোজা আপিস থেকে এসেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"না, বাড়ি হয়ে এসেছি।"

তবে কি মাসীমা জানেন? মালতী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা না করে পারল না। বলল, "মাসীমাকে কি বলেছেন যে, আমিও ছবিতে আসছি?

"না তো! মা জিজ্ঞাসা করেন নি তো।"—দেবেশ যতটা নিশ্চিন্ত স্বরে বলল, ঠিক ততটা নিশ্চিন্ত বোধ করল না বোধ হয়। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, "আজ আপনার কটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে?"

"ছবি শেষ হলে যাব। মারাত্মক তাড়া নেই কোনো।"

দেবেশ আর কিছু বলতে পারার আগেই ছবি শুরু হোলো এবং আবার সবাই তাকাল পর্দার দিকে।

ছবিটা সম্বন্ধে দেবেশ পড়েছিল অনেক আগে। প্রাক্‌সোভিয়েট, আমলের অনাথ বালকদের নিয়ে নতুন রাষ্ট্র কী রকমের নতুন নাগরিক নির্মাণ করেছে, ছবিটা তারই প্রচারইতিহাস। চিত্রে বা সাহিত্যে প্রচারের ইঙ্গিত পেলেই দেবেশ সন্দেহী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সে ছবি যদি নীতির প্রচার না হয়ে বিশেষ রাষ্ট্রের প্রচার হয়। কিন্তু দেবেশ বার বার নিজকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, চিত্রের বক্তব্যের বিষয় যেন তার চিত্রের বিচারকে প্রভাবিত না করে। চিত্রনির্মাতার বক্তব্যকে গ্রহণ

করে নিয়ে তারপরে তাকে চিত্রের গুণাগুণ বিচার করতে হবে—এই নাকি আলোচনার মান, যদিও এই মানটা পুরোপুরি মানে না দেবেশ।

মালতীর বুদ্ধি সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা হয়েছিল প্রথম দিনেই। ভাবল, ছবির শেষে একবার এই নিয়ে আলোচনা করবে মালতীর সঙ্গে।

দেবেশের বেতার-বক্তৃতা সম্বন্ধে তার অনুরাগীরাও একটা মৃদু অভিযোগ এই করে থাকে যে, তার সব আলোচনায় আমি-টা নাকি বড়ো বেশি প্রকট। আলোচক নাকি অনেক ক্ষেত্রেই আলোচ্য বস্তুকে অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করে। এই মৃদু অভিযোগের প্রবল প্রতিবাদ করে দেবেশ। সে বলে, পরিপূর্ণ বিষয়মুখীন আলোচনা বলে একটা ফাঁকি আছে, কোনো বস্তু নেই। থেকে থাকলেও তা নিম্ন স্তরের। তার মতে আলোচনা হচ্ছে আলোচকের বিদগ্ধ মনে আলোচ্য বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিফলনের সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ প্রকাশ। আলোচনা নয় তবলা-বাজানোর মত অপর শিল্পীর সহায়তা করা, আলোচনা আপন অধিকারে নিজেই শিল্প। দেবেশ আলোচনা-শিল্পী। তার কাজ আপন মত ব্যক্ত করা, পরের মতের গ্যালপ্ পোল্ রাখা নয়।

আজ কিন্তু ছবি দেখতে দেখতে দেবেশ মনে মনে স্থির করল মালতীর মতের খোঁজ নিতে। সে মত সে নিজে গ্রহণ না করলেও রেডিওতে তাই বলে মালতীকে উপহার দেবে। মালতী খুশি হবে, এই কথাটা ভেবেই দেবেশ খুশি হোলো।

ছবি দেখতে দেখতে দেবেশের অনেক কথা মনে হোলো। কিন্তু বলা স্থগিত রাখল ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত। মালতী ছবি দেখছিল মন দিয়ে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হয় নি দেবেশের সান্নিধ্যের কথা। এত কাছে বসে নি কখনও এর আগে। মাঝে মাঝে মালতী দেখছিল দেবেশের দিকে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তবু ভালো লাগছিল তাকাতে। দেবেশ যে কাছে কাছে, এইটেই ভালো লাগছিল, দেখা না গেলেও।

একবার হঠাৎ কী করে যেন মালতীর মনে হোলো যে, দেবেশ কিছু বলছে। শুনতে না পেয়ে অজ্ঞাতসারে, একেবারে কিছু না ভেবে, মালতী তার মাথা এগিয়ে বলল, "কী ?"

দেবেশ কিছু বলে নি। হঠাৎ মালতীর চুলের মৃদু স্পর্শে চমকে উঠে সে তৎক্ষণাৎ নিজের মাথা সরিয়ে নিল। বলল, "কই, কিছু বলি নি তো !"

আবার দুজনে ছবি দেখতে থাকল। দেবেশ ছবিটাকে বিচার করছিল একাধিক দিক থেকে। চলচ্চিত্রের টেকনিকের দিক থেকে Road to Life-এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। অনেক বিষয়ে চিত্রটি পথিকৃৎ বলে গৌরব করতে পারে। কিন্তু কোন মান দিয়ে তার বিচার হবে ? সৃষ্টির কালের, না আজকালের ? সে কেমন আর্ট, যা আপন কালকে অতিক্রম করতে পারল না ? সে কেমন সৃষ্টি, যার আবেদন পঞ্জিকার দাসত্বে সীমাবদ্ধ ? দেবেশের চিন্তা এমনই নানা প্রশ্নে জর্জরিত হোলো। পার্শ্ববর্তিনীর কথা তখন মনেই ছিল না।

মালতীর তখন চোখ ছিল পর্দার উপর, কিন্তু মন ছিল গভীরভাবে ক্ষুব্ধ। ক্ষুদ্র ব্যাপার। দেবেশ হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—কিছু না ভেবেই তার মাথা সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মালতীর মন সে চিন্তায় সান্ত্বনা পেল না। কেবলই মনে হতে থাকল যে, দেবেশ তাকে অবহেলা করেছে, অপমান করেছে। মালতী ইচ্ছা করে দেবেশের কাছে যায় নি, মাথা এগিয়ে নেয় নি স্পর্শের অভিসন্ধি নিয়ে—এমন কথা মালতী কল্পনাও করতে পারে না—কিন্তু তবু, তবু, দেবেশের নির্বিকার ঔদাসীন্য মালতীকে ব্যথা দিল। হোক দৈবাৎ, হোক অনিচ্ছাকৃত, মালতীর কেশের স্পর্শ কি এমনই অপ্রীতিকর একটা শিহরণ যে, দেবেশের অমন অশোভন ত্রস্ততায় সরে না গিয়ে উপায় ছিল না?

মালতীর আর ছবি দেখবার উৎসাহ ছিল না। শেষ হলে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কিন্তু আলো জ্বলে উঠতেই দেবেশ এমন আনন্দিত হাসির সঙ্গে মালতীর দিকে তাকাল যে, মালতীর অস্বস্তির অনেকখানি লাঘব হয়ে গেল। তারপর দেবেশ যখন ট্রাম-লাইনের কাছে এসে বলল, অনুমতি করেন তো আপনাকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেব, মালতী তখন আবার খুশি হোলো।

মালতী ট্যাক্সিতে আগে উঠে এক কোণে গিয়ে বসল। দেবেশ পরে উঠে বসল আর এক কোণে। মাঝের দূরত্বটা মালতীর ভালো লাগল না, কিন্তু কিছু বলল না মালতী।

কথা শুরু করল দেবেশই, "এবারে বলুন, ছবিটা আপনার কেমন লাগল।"

"আপনার কেমন লাগল, বলুন।"—মালতী আগে তার মত প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করল, যদি সে মত দেবেশের মতের সঙ্গে না মেলে।

দেবেশ বলল, "আপনাকে আগে জিজ্ঞেস করেছি আমি।"

তুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। দেবেশ এবারে হাসতে হাসতে তার সংকল্পের কথা নিবেদন করল, "জানেন, আমার সম্বন্ধে একটা অভিযোগ হচ্ছে এই যে, আমি নাকি কেবল আমার নিজের মত জাহির করি। এবারে তাই স্থির করেছি যে, আপনার মতই বলব পরশুর বক্তৃতায়।"

মালতী জানত না যে দেবেশ ছবি দেখতে গিয়েছিল বেতারবক্তৃতার প্রয়োজনে। কথাটা শুনে ভালো লাগল না। দেবেশের নিমন্ত্রণে মালতী সাড়া দিয়েছিল এই ধারণা নিয়েই যে, ছবিতে যাবার একমাত্র লক্ষ্য উভয়ের সাথীত্ব। আসলে দেবেশ যে মালতী না এলেও এই ছবিটা দেখতে আসত, মালতী না হলেও চলত, সে যে উপরি মাত্র, এই কথাটা মালতীর আনন্দের আরও অনেকখানি নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নিল। দেবেশের কাছে আপন অপ্রয়োজনীয়তার চিন্তা মালতীকে আঘাত করল।

মনের দ্বন্দ্ব গোপন করে মালতী বলল, "আমরা ছবি দেখি ছবি দেখার জন্যেই। আমার মতের আবার মূল্য কী?

ভালো লাগলে বলি ভালো, মন্দ লাগলে মন্দ। কোনোটারই কারণ ভেবে দেখি নে।"

"এখন দেখুন। অন্তত আমি অনুরোধ করছি বলে।"

সিনেমা থেকে মালতীর বাড়ি দূরে নয়। দেবেশের প্রস্তাবিত আলোচনা শুরু হবার আগেই ট্যাক্সি প্রায় বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল। মালতীর পক্ষে সেইটেই হোতো ভালো। কিন্তু তার মনে অন্যান্য আশঙ্কা ছিল। একেবারে বাড়ির সামনে দেবেশের ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়ে কেউ দেখে ফেললে তখন? প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীদের কথা বাদ দিলেও, বাড়িরই কেউ যদি দেখে ফেলে, তাহলে মালতী বলবে কী? কী অজুহাত দেবে? দিলেও কে তা বিশ্বাস করবে? কেউ না। মালতী তাই বাড়ির কাছের মোড়ের ধারে আসতেই ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে বলল। দেবেশকে বলল, "আসুন, এইখানে নেমে পড়া যাক।"

দেবেশ এই অনুরোধে বিসদৃশ কিছু দেখল না। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে পেভ্‌মেণ্টে দাঁড়িয়ে আলোচনার পুনরারম্ভ করল। বলল "কই, ছবি কেমন লাগল, তা তো বললেন না।"

মালতী ছবি নিয়ে এত ভাবে না। বিশ্লেষণ করে না। ভাববার সময় নেবার জন্যেই বলল, "কোনো কোনো জায়গায় ভালো আছে, কিন্তু সবটা মিলিয়ে—"

দেবেশ মালতীকে তার কথা শেষ করতে দিল না। পরমোৎসাহে বাধা দিয়ে বলল, "আমিও ঠিক তাই

ভাবছিলেম। যখনই ছবিটা ছবি হিসেবে ভালো হতে যাচ্ছিল, অমনি যেন প্রচার এসে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে; বলেছে, ছবিটা গৌণ, বক্তব্যটাই মুখ্য। ছবি করবার জন্যেই ছবি করবে বুর্জোয়ারা। আমাদের উদ্দেশ্য মন-ভোলানো নয়। আমাদের উদ্দেশ্য—"

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা লোক বক্তৃতা করছে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে একটি মহিলা,—দৃশ্যটা কৌতূহলী পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেবেশের সেদিকে অল্পই খেয়াল ছিল। এমন কি এটাও তার লক্ষ্যে আসে নি যে মালতী অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিল। এদিকে মালতীর তখনই বাড়ি যাবারও ইচ্ছা ছিল না। দেবেশের বক্তৃতায় সহাস্যে বাধা দিয়ে বলল, "চলুন, ওই পার্কটায় গিয়ে বসে কথাটা শেষ করা যাক।"

তুজনে পার্কে গেল। বেঞ্চিতে বসতে তুজনেরই আপত্তি। তাই গিয়ে বসল একটা গাছের তলায়। মালতী গাছে হেলান দিয়ে বসল, দেবেশ তার মুখোমুখি। আলোচনায় ছেদ পড়ায় দেবেশ তখনই আবার ছবির কথা শুরু করতে পারল না। তুজনেই চুপ করে রইল। অন্ধকারে কেউ কাউকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না। দেখবার তেমন প্রয়োজনও ছিল না। কথারও না। তু'জনে যে বসেছে, এইটেই বুঝি তু'জনের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হোলো।

কিছুক্ষণ পরে দেবেশের ক্লান্তি বোধ হোলো। সে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় ডান হাতটাকে ভাঁজ করে তার

উপর মাথা রাখল। কিন্তু দূরত্বটা রইল সমান। মালতী একবার তার ব্যাগটা দিতে চাইল দেবেশের শিরস্থাপনের জন্যে। কিন্তু দেবেশ তা নিল না। মালতী আবার আহত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিল ব্যাগ দিতে চাইবার জন্যে।

দূরের একটা দোকানের বিজলী-ঘড়িতে নটা বাজতে দেখে মালতী উঠল। বলল, দেবেশের আর এগিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, বাকি পথটুকু সে একাই যেতে পারবে।

দেবেশ মালতীকে মামুলি ধন্যবাদ দিয়ে রাশিয়ার অনাথ-সমস্যার অতি-সহজ সমাধানের অপর্যাপ্ততার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল। মনে মনে লেখা হয়ে গেল বক্তৃতার অনেকখানি।

মালতীর সন্ধ্যাটা সব মিলিয়ে মন্দ লাগে নি। কিন্তু সেই মৃদু ভালো লাগার অন্তরালে অবিশ্রাম ধ্বনিত হচ্ছিল কী একটা অনির্দিষ্ট আশার অনির্দেশ্য ব্যর্থতার করুণ সুর। সেই ব্যর্থতা যেন তার মালতীত্বের পরাজয়।

এ পরাজয় মেনে নেবার মেয়ে মালতী নয়। ধীর পদে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মালতী আপন মনে দুর্জয় দৃঢ়তার সঙ্গে আবৃত্তি করতে থাকল, Nathaniel, I will teach you fervour. Nathaniel, I will teach you fervour, তুমি আমাকে জাগিয়েছ, আমি তোমাকে ঘুমোতে দেব না।

বারো

সরোজ শুধু কাঁদতে জানে। রাস্তায় মালতী যে ওকে দেখতে পায় নি, সেজন্যে ওর রাগ হয় নি মালতীর উপর। দোষ দিয়েছে শুধু নিজেকে। কেন সে এতক্ষণ বসে ছিল মালতীর অপেক্ষায়? মালতী তো বলে নি তাকে আসতে। চাকর এসে দু-তিন বার বলে গেছে যে, মালতীর আসবার সময়ের ঠিক নেই। তবু সরোজ বসে ছিল। হয়তো এখনই আসবে। হয়তো—হয়তো এখন পথে আছে। এতক্ষণ বসে থেকে আর পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা না করেই চলে যাবে? সে হয় না। আর পাঁচ মিনিট, আরও পাঁচটা মিনিট দেখাই যাক না।

এমনই করে পূরো দু-ঘণ্টা কেটেছে। তবু মালতীর দেখা পায় নি। শেষ পর্যন্ত দেখা হোলো রাস্তায়। না, দেখা হোলো কই? সরোজ শুধু মালতীকে দেখেছে। মালতী তাকে দেখে নি। মালতীর দৃষ্টি ছিল বিমনা। কী যেন ভাবছিল সে। সরোজের কথা ভাবছিল, এমন কথা ভাববার মতো উদ্ধত দুঃসাহস সরোজের হবে না কোনো দিন। তার কথা ভাববার মতো অবকাশ কোনো মানুষের হবে এমন আশাই ঠাঁই পায় না ওর মনে।

পায় না নয়। পেত না। অল্প কিছুদিন আগেও না।

কিন্তু তারপরে সব কিছু যেন বদলে গেল। যে সরোজ আপন নগণ্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছিল বিনা প্রতিবাদে, তারও একদিন নিজেকে যেন ঠিক ততটা অকিঞ্চিৎকর মনে হোলো না। ছোটো চাকরি, আপিসে তার মান নেই। সরকারী অস্থায়ী আপিসে কেরানী সে। ধুতি প'রে আপিসে যায়, নামের আত্মক্ষর শুধু লিখতে পায় ফাইলের বাফ্ শীটে, তাও সব সময় বাঁ দিকে। সাহেবরা তাকে সেলাম পাঠায় না,—বোলায়। বড়োবাবু ধমক দিতে দ্বিধা করে না। সরোজ নির্বিবাদে সব মেনে নেয়। এর বেশি যোগ্যতা নেই তার। কী হবে অভিযোগ করে? এর বেশির অভিলাষও নেই!

নেই নয়, ছিল না। অল্প কিছুদিন আগেও না।

ওর ওই অনাশা ভালোমানুষি বলে কখনও কখনও অনুকম্পা পেয়েছে, তার বেশি নয়। ওর উচ্চাশা নেই, ওর দ্বারা কিছু হবে না—গুরুজনেরা এই সুচিন্তিত অভিমত পোষণ করে তদনুযায়ী ওকে অবহেলা করেছেন। সরোজও ক্রমে সেটা বিশ্বাস করে দুরাশা পরিহার করে সন্তুষ্টির আশীর্বাদকে শিরোধার্য করে নিয়েছিল।

তারপরে সব হঠাৎ যেন বদলে গেল। কিছুদিন আগে সরোজ বী. কম. পড়তে শুরু করেছে। তারপরে আর. এ. দিয়ে অন্য কোনো চাকরির জন্যে চেষ্টা করবে। তা ছাড়া ওদেরই ডিপার্টমেণ্টে কি একটা টেম্পোরারি ভেকেন্সির জন্যেও দরখাস্ত করেছে যেন। আগে এগুলিতে সরোজের উৎসাহ ছিল না কোনো দিন।

তারপরে ভ্রাতৃবধূরূপে মালতীর আবির্ভাব। কিছুদিনের মধ্যেই দাদা বিলাত যাত্রা করলেন উচ্চশিক্ষার মানসে। স্বামীমুক্ত জীবনের অফুরন্ত অবকাশে দেবরের সঙ্গে পরিচয় অন্যথা যা হোতো তার চাইতে ঘনিষ্ঠতর হোলো। পরবর্তী কালে স্বভাবতই সন্দিগ্ধচিত্তা শ্বশ্রূমাতা এ নিয়ে বহু কুটিল কাহিনী রচনা ও রটনা করেছেন বলে শুনেছি। কিন্তু দু'জনের একজনেরও কোনো দুরভিসন্ধি ছিল বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি নে। নিঃসঙ্গিনী মালতী সরোজকে পেয়েছিল সাথীরূপে। তার চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন ছিল না, চায়ও নি। চাইলেও তা দেবার যোগ্যতা সরোজের ছিল সামান্যই, এ কথাটা মালতী সরোজকে কখনও স্মরণ করিয়ে না দিলেও নিজে বিস্মৃত হয় নি। আর সেই সাথীত্বের অন্তরালে সরোজ যদি তার অপরিণত মনের ভাবাতিশয্যসিক্ত বেদীতে অপরা মূর্তি স্থাপন করে আর কোনো উপচার নিবেদন করে থাকে, মালতী তাকে বয়ঃকনিষ্ঠের স্বপ্নবিলাসিতা বলে করুণার চোখে দেখেছে, গুরুত্ব আরোপ করে নি, প্রশ্রয় দিয়েছে সরোজের বয়ঃপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায়।

এই বয়ঃপ্রাপ্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ। কারও কারও বেলায় সময়ও নিরর্থক। তিন-কুড়ি-দশ বৎসরের পরিপক্ক বয়সেও নাবালক থেকে কত লোক যে ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তার সংখ্যা নেই। সরোজের সম্বন্ধে এমন চরম রায় দিলে হয়তো অবিচার হবে ; কিন্তু ওকে আমি যে দু-একবার দেখেছি, তাতে একবারও বয়সের পরিচয়

পাই নি। এটা তিরস্কার নয়, নিন্দা নয়, বরং ঈর্ষা করতে হয় এমন সুখী লোকদের। কিন্তু ওদেরও সুখই সব নয়। ওদের কাঁচা মনের নরম জমিতে পুলকের চারা যেমন সহজেই পল্লবিত হয়ে মৃদুতম বায়ুহিল্লোলে দুলতে থাকে, তেমনই অনাবশ্যক ও পরিহার্য নৈরাশ্যের আগাছার জঞ্জালও সেখানে কম সহজে জন্মায় না। ওরা বেশি আশা করে বলেই আঘাতও পায় বেশি। বয়ঃপ্রাপ্ত সীনিকের কঠোর দুঃখের বিরুদ্ধে যে ইমিউনিটি আছে তা ওদের নেই বলেই ওরা সদ্য নেপাল থেকে নেমে আসা পাহাড়ীর মতো বহু রোগের প্রতি সাদর আমন্ত্রণ বহন করে বেড়ায়। নিতান্ত ভাগ্যবান না হলে সে আমন্ত্রণ বড়ো একটা প্রত্যাখ্যাত হয় না। সরোজকে ভাগ্যবান বললে বেচারীর প্রতি নিষ্ঠুর অন্যায় করা হবে।

গৃহপ্রত্যাবর্তনরতা মালতীর দৃষ্টিপথে সরোজ যে উপেক্ষিত হয়েছে, তার কারণ খুঁজে না পাওয়ায় একটা বোবা ব্যথা তার মনকে আচ্ছন্ন করল। ব্যথাই শুধু নয়, লজ্জা, অবহেলার অপমান। পথের দু' ধারের দোকানের প্রখর আলোগুলির প্রচণ্ড অট্টহাস্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে দ্রুত পদচালনা করে সরোজ যখন ট্রাম লাইনের কাছাকাছি এসে মালতীর অদর্শনের কারণটা আবিষ্কার করল, তখন তার উৎসুক হৃদয় কৌতূহলনিবৃত্তির আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল না। অশ্রুরোধ করা দুঃসাধ্য হোলো।

চোখে মোটা চশমা। হাতে মোটা মোটা গোটা দুই বই। দেহ রোগা, হ্রস্ব। অখণ্ডমণ্ডলাকার বৃহৎ দু'টো

চোখ। 'বেতার জগতে' প্রকাশিত চিত্রের সঙ্গে নির্ভুল সাদৃশ্য। নিঃসন্দেহে দেবেশ মুখোপাধ্যায়।

সম্প্রতি মালতীর মুখে এত অসংখ্যবার এই নামটির অসংলগ্ন কিন্তু সদাসপ্রশংস উল্লেখ শোনা গেছে যে, এই নবলব্ধ বন্ধুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ না করে উপায় ছিল না সরোজের। মালতীর সকাশে সভয় প্রশ্ন নিবেদন করে স্পষ্ট উত্তর পায় নি। অস্পষ্ট সন্দেহ তাতে বেড়েছে বই কমে নি। এখন মালতীর বাড়ির সামনের স্বল্পালোকিত রাস্তায় ট্রামের জন্যে অপেক্ষমান স্বল্পদৃষ্টিগোচর ব্যক্তিবিশেষের উপস্থিতি সরোজের সন্দেহের অন্ধকারের উপর যে আলোকসম্পাত করল, তাকে তার মনে হোলো নিষ্ঠুর অভিসম্পাত বলে। সংশয়ের ব্যথাটা পরিব্যাপ্ত হয়ে কিয়দংশ সহনীয় বলে মনে হয়েছিল, এখন তার পরিপূর্ণ নিরসনে সে ব্যথা বুঝি কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হয়ে অসহ্য আঘাতের আকার নিল। সরোজ আর একবার দেবেশের দিকে ঈর্ষাবিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কাছের পার্কটায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল, অপরাধী পলাতকের মতো।

কিন্তু অপরাধটা কী? কার?

নির্জন পার্কে অর্ধঘণ্টাব্যাপী অশ্রুবিসর্জনে সে প্রশ্নের উত্তর মিলল না। উত্তর যে সরোজের একেবারে অজ্ঞাত ছিল তা নয়। কিন্তু দুর্মর আশা কেবলই দুর্ভেদ্য রহস্যের ছদ্মবেশে ছলনা করতে থাকে। সত্যটা এতই নির্দয় যে, সেটাকে বিশ্বাস করতে বিদ্রোহ করে সমস্ত অন্তর। সীয়িংও সেখানে বিলীভিং নয়।

যে দাঁত আলগা হয়ে গেছে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে যে ব্যথা হবে—এ তথ্য শিশুও জানে। তবু পারে না সে দাঁতে হাত না দিয়ে থাকতে। হাত দিয়ে ব্যথা পায়, তবু হাত দেয়। শিশু যা দাঁত নিয়ে করে, আমরা বয়স্করা ঠিক অনুরূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিই আমাদের ব্যথাগুলি নিয়ে। ইচ্ছা করে নয়, না করে পারি নে বলে।

আসলে অনেকগুলি ব্যাপারে আমরা বোধ হয় কখনোই বড় হই নে!

অস্থির সরোজকে পার্কের বেঞ্চি ছেড়ে উঠতে হোলো অপরিচিত এক বিশ্রামাকাঙ্ক্ষীর অনভিপ্রেত আবির্ভাবে। কিন্তু যাবে কোথায়? বাড়ি যেতে মন চাইল না। বাড়ি ওর বাড়ি নয়। সেখানকার অবহেলা আজ আর তার সয় না। যে অবহেলাকে সাধারণত নিরপেক্ষ ঔদাসীন্য বলে অগ্রাহ্য করা সম্ভব, অপমানের ক্রূর মুহূর্তে তাকেই মনে হয় আগ্রাসী বৈরিতা। মানুষ তো দূরের কথা, চতুর্দিকের জড় পারি-পার্শ্বিককে পর্যন্ত তখন মনে হয় উদ্যতশস্ত্র শত্রু বলে।

সরোজ মালতীর সঙ্গে আজই—এখনই দেখা করবে। দেখা করে তারপর? তার পরের কথা ভাববার সময় নেই সরোজের। আগে দেখা তো হোক। পরের কথা পরে। অনিশ্চিত (এখনও অনিশ্চিত!) সন্দেহের চেয়ে হিংস্র মীমাংসা ভালো, সরোজ বলল মনে মনে। বলতে বলতে মনে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করল।

মালতী তখনও বাইরের পোষাক বদলায় নি। জুতো

খোলে নি। ব্যাগটাকে শুধু ছুঁড়ে ফেলেছে বিছানার উপর। এ ব্যাগে মাথা রাখে নি দেবেশ। দোষ যেন ব্যাগটারই। ঘরে আলো জ্বলছিল, কিন্তু মালতী শুয়ে ছিল আরাম-কেদারার উপর শরীর এলিয়ে, চোখ বন্ধ করে। সরোজ আসতেই পা দুটো গুছিয়ে সোজা হয়ে বসে মালতী বললে, "আরে, সরোজ যে! এত রাত্তিরে?"

মালতীর স্বরে অভ্যর্থনার সুর ছিল না।

রাত কিন্তু সত্যিই বেশি হয় নি। সরোজ এর আগে অসংখ্যবার এর চাইতে অনেক পরে এসেছে। কখনও দেরি নিয়ে জবাবদিহি করতে হয় নি। কিন্তু আজ? সরোজ তবু পারল না স্পষ্ট কিছু জিজ্ঞাসা করতে। দেবেশের নামও উল্লেখ করতে ভয় পেল।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, "দিদি, এর আগে এসেছিলুম। অনেকক্ষণ বসে ছিলুম।"

মালতী বলল, "তাই নাকি?" (প্রশ্নচিহ্নটা একান্তই ভাষ্যকারের। মালতীর উক্তিতে জিজ্ঞাসা কেন, কৌতূহলের আভাসমাত্র ছিল না।)

সরোজের বুঝতে বাকি রইল না যে, তার আগমন আকাঙ্ক্ষিত ছিল না, বরং গমনই ছিল অপেক্ষিত। দেবেশের উল্লেখ করে তার বক্তব্যকে একাধারে সুস্পষ্ট ও সুমধুর করবার মতো পরিসর ছিল অল্পই। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, "দিদি, আমার দিল্লী অফিসে একটা ভেকেন্সি হয়েছে। মাইনের দিক থেকে খুব যে লাভ তা নয়, তবে দিল্লী গেলে

উন্নতির আশা আছে যা কলকাতায় নেই। দরখাস্ত করলেই যে আমার হবে তা নয়, মাদ্রাজ আর বম্বে থেকে কত দরখাস্ত যাবে তার ঠিক নেই, তবু আজ দরখাস্ত করেছি—যদি হয়।"

মালতী জুতোর বক্‌লস খুলতে খুলতে অন্যমনস্কভাবে বলল, "তাই নাকি? কই, আমাকে বল নি তো! হয়ে গেলে তো খুবই আনন্দের কথা।"

দিল্লী যাওয়ার সম্ভাবনার সংবাদে মালতীর হৃদয় শতধাবিদীর্ণ হবে, এই রকম আশা নিয়েই সরোজ কথাটা তুলেছিল। খবরটা শুনে মালতী যখন ক্ষীণতম কৌতূহল প্রকাশ করল না, বরং স্পষ্ট বলল যে, সরোজের দিল্লীগমন আনন্দেরই কথা হবে, তখন মালতীর বদলে সরোজের হৃদয় শতধাবিদীর্ণ হোলো। কিছুক্ষণের জন্যে বাক্‌স্ফূর্তি হোলো না সরোজের, বিশেষ করে এই কথা ভেবে যে, মাত্র মাস তিনেক আগে ঠিক এমনই একটা সুযোগ হয়েছিল নাগপুর আপিসে, যখন মালতী অভিমান করে বলেছিল, যাবে না কেন? পুরুষের জীবনে কেরীয়ারই তো সবচেয়ে বড়ো কথা। নিশ্চয়ই যাবে।

সরোজ সেদিন উন্নতির সুযোগ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে যে আনন্দ পেয়েছিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের বড় সায়েব হলেও তার শতাংশ আনন্দ পেত না। আজ সে কথা স্মরণ করলে ব্যথা পেতে হয়, স্মরণ করিয়ে দিয়ে লাভ হয় না। বলল, "তোমাকে বলব বলেই তো গত তিন দিন তোমার এখানে এসেছি। তোমার দেখা পাই নি। আজও এসেছিলুম,

অনেকক্ষণ বসে ছিলুম। তারপর ফিরে যাবার পথে তোমায় আসতে দেখলুম। তাই তো আবার এসেছি।"

"হ্যাঁ, আমি একটু বেরিয়েছিলেম। অবিশ্যি আমাকে যে বলতেই হবে, এমন তো কোনো কথা নেই।"—মালতীর স্বরে অনুযোগের বাষ্পমাত্র ছিল না।

কথাটা সরোজের বুকে বেদনা হয়ে বাজল। মুখে তা প্রকাশ পেল না। মনে মনে ভাবল, হায় রে, কথা নেই বলেই তো না-বলে পারি নে। কথা থাকলে সে কথা ভাঙলে তো শুধু কথাই ভাঙা হয়, হৃদয় নয়। সরোজ চুপ করে রইল।

মালতী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের একটা চেয়ারের উপর পা রেখে জুতো খুলছিল। সরোজের দিকে ছিল পিঠ। কী যেন একটা গানের সুর গুন গুন করছিল মালতী। সব কিছু মিলিয়ে মালতীর অন্যমনস্ক ঔদাসীন্যের পরিচয় সম্পূর্ণ হয়েছিল। সরোজের বুঝতে বাকি ছিল না যে, তার এখন ওঠাই উচিত। কিন্তু উঠতে পারে কই? আবার একটা দীর্ঘ অস্বস্তিকর নিঃশব্দতার পরে সরোজ অন্য কথা তুলল। বলল, "দিদি, রেডিওটা খুলব?"

সরোজ লক্ষ্য করল যে, রেডিওর উল্লেখ করা মাত্র মালতীর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হোলো। কী জন্যে কে জানে! কিন্তু তারই সঙ্গে মালতীর মুখ যে দীপ্ত হয়ে উঠল, তার কারণ জানতে বাকি রইল না। রেডিওটা তো এখন আর শব্দসৃষ্টিকারী একটা যন্ত্র মাত্র নয়। এখন এর প্রাণ আছে। তার যোগাযোগ এখন

শুধু কানের সঙ্গে নয়, প্রাণের সঙ্গে। মালতী খুশি হয়ে বলল, "দাঁড়াও, আমি খুলে দিচ্ছি।"

আস্তে, সযত্নে আপন হাতের কোমল স্পর্শে মালতী রেডিওটা খুলল। গরম হতে যে সময়টা লাগল তার মধ্যে সরোজ বলল, "দিদি, তা হলে তোমার কি মনে হয়, আমার এখন দিল্লী যাওয়াই ভালো ?

মালতী রেডিওটার উপর হাত রেখে দেবেশের কথা ভাবছিল, ঘণ্টাখানেক আগে ফুরিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনবার মধুর প্রয়াসে। সরোজের করুণ জিজ্ঞাসায় বাধা পড়ল স্মৃতিমন্থনে। ফিরতে হোলো নীরস বর্তমানে। কিন্তু কী বলবে ভেবে পেল না। এখন তার নিজেরও মনে পড়ল যে, নিকট অতীতেই অনুরূপ অবস্থায় সে বিপরীত রায় দিয়েছিল। কী বলবে সে ? ঠিক এমনই সময় রেডিওটা বেজে উঠে মালতীকে বাঁচাল। মালতী আবার সরোজের দৃষ্টি এড়িয়ে পাদুকা পরিহারে মনোনিবেশ করল।

সরোজ জানে মালতীর উত্তর, তবু সেটা মালতীর মুখ থেকে না শুনে যেন ওর শান্তি নেই। সে তাকিয়ে রইল মালতীর ফেরানো মুখের দিকে অধীর প্রতীক্ষায়। অসহ্য নৈঃশব্দ্যের পরে নিজেই আবার সকল সম্মানবোধ, সকল লজ্জা বিসর্জন দিয়ে আপন প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, "দিদি, তা হলে—"

মালতীর ধৈর্যচ্যুতি হোলো। সরোজকে ব্যথা দিতে তার ইচ্ছা নেই, কিন্তু, কিন্তু—কী জানি, সরোজকে আজ ভালো লাগছে না। এর আগে তার একাকিত্বের নিরসনের জন্যে

সরোজের প্রয়োজন ছিল। আজ তার একজনের সঙ্গ ভালো লাগে। সেই বিশেষ একজন কাছে না থাকলে অবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতাও অন্য সঙ্গের চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেয়। আজ সরোজ সাথীও নয়, নিঃসঙ্গতারও অন্তরায়। ও যায় না কেন?

মালতী সরোজের দিকে না তাকিয়ে একান্ত নিরাবেগ কণ্ঠে বলল, "দেখ সরোজ, প্রত্যেকেরই জীবনে এমন কতগুলি সমস্যা আছে, যার সিদ্ধান্ত নিজেকেই করতে হয়। সেখানে অপরের পরামর্শ চাওয়া যেমন নির্বুদ্ধিতা, অপরের সেখানে পরামর্শ দিতে যাওয়াও ঠিক তেমনই অনধিকারচর্চা।"

অপর? সে কে? মালতী? সরোজের মনে অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ কতকগুলি প্রশ্ন কেবলই তীক্ষ্ণ শরের মত বিদ্ধ হতে থাকল। যারা সরোজের আপন ছিল—বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, সবাইকে তো সে পর করেছে এই মালতীরই জন্যে। একবারও তো মনে হয় নি সে কিছু হারিয়েছে, সকল ক্ষতির উচ্ছল পূরণ হয়েছে দিনের শেষে মালতীর কাছে এসে। এখানে এসে পর যখন আপন হোলো, সে হোলো সকল আপনের বাড়া। আবার যখন সেই আপন পর হোলো, তখন সে শুধু পর হোলো না। হোলো পরের চেয়ে কিছু বেশি, কিছু কম।

রেডিওর উচ্চ রবকে ছাপিয়ে মালতীর নীরবতা যেন চীৎকারের মতো বাজছিল সরোজের কানে। আর কী করবে ভেবে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠে সে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। চীৎকার তবু যেন থামে না। ঘরের সমস্ত জড় পদার্থগুলি যেন এক মত্ত অট্টহাস্যে মেতে উঠেছে। মালতী রেডিওটা থেমে

যাওয়ায় একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল রেডিওটার দিকে, তারপর সরোজের দিকে। তার মনে শুধু এক চিন্তা, একটু কি একা থাকবারও উপায় নেই।

সরোজ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি যদি শুনতে চাও, তা হলে আবার খুলে দিচ্ছি। বক্তৃতাটা আমার ভালো লাগছিল না, তাই—"

মালতী বলল, "থাক্। শোনা যায় না, এত বাজে সব বক্তৃতা।"

সরোজ এতক্ষণ দেবেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সাহস পাচ্ছিল না, সুযোগ খুঁজছিল। এবার বলল, "হ্যাঁ। তবে দু-একজন কিন্তু বেশ বলে।"

মালতী প্রসঙ্গ পরিবর্তনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। রেডিওর কথায় খুশি হোলো। বলল, "ও হ্যাঁ, তুমি না বলেছিলে দেবেশ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা হলে তোমায় জানাতে। কাল আটটায় আছে। এখানে এসে শুনো। ইংরেজী ছবি নিয়ে বলবে।"

সরোজ একটু অর্থপূর্ণ শ্লেষের সুরে বলল, "তোমার ওর বক্তৃতা খুব ভালো লাগে, না ?"

মালতীর বুঝতে বাকি রইল না সরোজের ইঙ্গিত। তার উল্লেখমাত্র না করে সে সংক্ষেপে ও সতেজে তিরস্কার করল, "সরোজ !"

সরোজ অশ্রু গোপন করতে আর বাক্যব্যয় না করে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মালতী তাকে একবার ডাকল না, একবার আর একটু

বসতে বলল না, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল না, খোলা রেখে যাওয়া গেটটা পর্যন্ত বন্ধ করতে গেল না। বিরক্তিজাত উত্তেজনা প্রশমিত হলে মালতী দেবেশকে টেলিফোনে ডেকে পরের দিনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করল, আটটার বক্তৃতার পরে যত শীঘ্র সম্ভব। হ্যাঁ, সে সন্ধ্যা থেকেই বাড়ি থাকবে। বা রে, বক্তৃতাটা শুনতে হবে না! আচ্ছা। গুড্ নাইট।

মালতী চাকরকে ডেকে শ্বশুরের খাবার ব্যবস্থার কথা বলে দিল। নিজে কিছু খাবে না সে, শরীরটা তেমন ভালো নেই। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে বিশ্বস্ত বালিশকে বলল, এর চাইতে ভালো কখনও বোধ করি নি।

মালতীর মন অদূর অতীতের মিলনের স্মৃতিতে উত্তপ্ত, অদূর ভবিষ্যতের নিশ্চিত মিলনের প্রতীক্ষায় উদ্দীপ্ত। এ দু'য়ের মাঝে নব মালতীর সদ্যোজাগরিত সত্তা। আর কোন কিছুর স্থান নেই সেখানে। রুনু কেবলমাত্র ভূগোলের বিচারেই মধ্যপ্রাচ্যে বা নিকটপ্রাচ্যে, আসলে সে সুদূর পশ্চিমে অস্তগমনোন্মুখ। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী দোতলায় নন, পাতালে। নৈনিতালে কেউ নেই এই মালতীর। সরোজ আর তার দিল্লী দূরে—অনেক, অনেক দূরে।

বিপুলা দুটি পৃথিবীতে এখন শুধু মাত্র প্রাণী—মালতী আর দেবেশ, দেবেশ আর মালতী। এই মুহূর্তে মালতীর মনে মা-বাবার জন্যে স্নেহ নেই, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর জন্যে দায়িত্ব নেই, রুনুর প্রতি নেই কোনো দায়, সরোজের জন্যে নেই কোনো দয়া। জীবনে প্রেম যখন আসে তখন সে আসে বন্যার মতো, সব কিছুকে ভেঙে ভাসিয়ে দিয়ে। সমস্ত সত্তাকে সে আচ্ছন্ন

করে, অধিকৃত হৃদয়ে সে সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানও দেয় না অন্য কোনো অনুভূতিকে। প্রীতির সেখানে ইতি, দয়া সেখান থেকে নির্বাসিতা, করুণা বহিষ্কৃতা।

তেরো

দেবেশ সেদিন সুস্থতম মস্তিষ্কে একটা সুদ্ধতম পাগলামি করল। কী যেন একটা অজুহাতে সেদিন সে তার বেতার বক্তৃতা স্টুডিওতে রেকর্ড করে এলো। দেবেশ জানত যে ইলেক্‌ট্রিক্যাল রেকর্ডিংয়ে তার গলার স্বরে কী রকম যেন একটা মেটালিক্ নয়েজ্ আসে। তবু সে রেকর্ড করল। মনে মনে বলল, আজ আমার সমালোচনায় যা বলছি, তা পুরোপুরি আমার মত নয়, অনেকটা মালতীর। তেমনি আজ আমার গলাও যদি পুরোপুরি ঠিক আমার গলার মতো না শোনায়, তাহলে ক্ষতি নেই। ক্ষতি না হয় নেই, কিন্তু লাভ? মা ফলেষু কদাচন। জলে রুটি তো ভাসিয়ে দেওয়া যাক, শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা ও বাইবেল দুই-ই মিথ্যে না হলে কিছু না কিছু ফিরবেই।

কথা ছিল ন'টায় যাওয়ার। কিন্তু তার অনেক আগে, আটটাও বাজে নি তখন, দেবেশ গিয়ে হাজির হোলো মালতীর দরজায়। গেট খুলল সে নিজেই, পরের দরজাটা খুলল চাকর। চাকরের:কাছে পরিচয় প্রদানের পূর্বেই মালতী নিজে এসে উপস্থিত হোলো। দেবেশকে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অজ্ঞাতে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "আরে, আপনি!"—সতর্ক হয়ে কথা বললে 'আরে' কথাটার দেখা মিলত না মালতীর উক্তিতে।

বসবার ঘরটা পেরিয়ে তার পরে মালতীর শোবার ঘর।

সেখানেই সে বসে ছিল রেডিও খুলে। সাধারণত রেডিওটা খোলা থাকে পরোক্ষ পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে। আলনা-গোছানো বা খবরের কাগজ পড়ার আবহ সঙ্গীত যেন। রেডিও শোনার জন্যেই রেডিও খোলা নয়। উঠে বন্ধ করবার উৎসাহ নেই বলে খোলা আছে, নয়তো গোলমালটা খুব ভয়ানকভাবে কানে বাজছে না বলেই বাজতে দেওয়া হচ্ছে।

আজ কিন্তু মোটেই তা নয়। আজ শোনবার জন্যেই মালতী রেডিও খুলে একেবারে সামনে এসে বসেছে। দূরে ভৃত্যে এবং পাচকে কী নিয়ে যেন একটু বচসা হয়েছিল। মালতী উঠে গিয়ে অধৈর্যের সঙ্গে ধমক দিয়ে বলে এসেছে, তোমরা আস্তে কথা বলতে পারো না? আমি আর যেন গোলমাল না শুনি। ঘরে একটু শান্তিতে বসবার জো নেই তোমাদের জন্যে।

কিছুক্ষণ পরে একটা ছোট ব্রিটিশ গাড়ি সামনের রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড একটা মার্কিন হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছিল। মালতীর ইচ্ছা হয়েছিল উঠে গিয়ে গাড়ির মালিককে অশোভন অসঙ্গতিটার কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতে। ধৈর্য-ধারণ করে মালতী বসে রইল রেডিওর পাশে।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি এই প্রতীক্ষা। আশা-আশঙ্কার দুই অনিশ্চিত অন্তিমের মধ্যে দোদুল্যমান হওয়া নয়, নিশ্চিত সৌভাগ্যের জন্যে অপেক্ষা করা। অবারিত হৃদয়ের দ্বারে সমগ্র সত্তার প্রদীপ প্রজ্বলিত করে আকাঙ্ক্ষিত অতিথির পথ চেয়ে বসে থাকা। নিজেকে দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকে শুধুমাত্র

গ্রহীতার আগমনের জন্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় বৃন্তচ্যুত হবার প্রতীক্ষা করা। এমন অনুভূতি বুঝি দ্বিতীয় আর নেই জগতে। এ চাওয়া বুঝি পাওয়ার চেয়েও সহস্রগুণে মধুর।

আর মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি।

আসলে কিছুই নয়, শব্দ মাত্র। অন্তত তাই ছিল দিন কয়েক আগেও।

কিন্তু আজ তা নয়। আজ সে যখন দেবেশের বক্তৃতা শুনবে, তখন তা শুধু কান দিয়ে শোনা হবে না। সে মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, দেবেশ এখন ভাবাতিশয্যে তার দক্ষিণ হস্তকে প্রসারিত করে দিয়েছে অদৃশ্য শ্রোতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে। তারপর কোনো সময় মালতী স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, দেবেশ এখন তার গলার টাইটাকে নিয়ে খেলা করছে। কখনও বা স্পষ্ট দেখবে যে, যদিও দেবেশ লেখা পাতা থেকে পড়ছে, তবু এমন একটা ইতস্তত করবার ভান করছে যেন এখনই ভেবে আবিষ্কার করেছে কোনো একটা নতুন এপিগ্রাম বা পান্। সামান্যতম হস্তসঞ্চালন, মৃদুতম ভ্রূকুঞ্চন, আজ তার সব কিছু মালতীর কাছে দিবালোকের মতো রহস্যমুক্ত হয়ে প্রতিভাত হবে।

মালতী যে অপেক্ষা করতে পারছিল না, সে তো স্বাভাবিক।

আবার তার একটু পরেই—এদিকে আটটা বাজতে আর মিনিট কয়েক মাত্র বাকি—দরজার কড়া ন'ড়ে উঠল। মালতীর ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হতে তখন বাকি অল্পই।

তারপরেই সশরীরে দেবেশের প্রবেশ।

দেবেশের এমন অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে মালতীর আপত্তি ছিল। যদি কেউ দেখে ফেলে? যদি এখন শ্বশ্রূঠাকুরাণী এসে পড়েন? তখন কী বলবে মালতী? কী করে ব্যাখ্যা করবে তার ঘরে দেবেশের উপস্থিতি? শাশুড়ী 'বেতার-জগৎ' দেখেন না, কিন্তু নাম শোনা মাত্র নিশ্চয় এমন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসবেন, যার গ্রহণযোগ্য মিথ্যা উত্তর দেবেশের সামনে দিলে দেবেশ নিজেই অবাক হবে। হয়তো বা প্রতিবাদই করে বসবে।

শাশুড়ীর সন্দেহভঞ্জন হবে, এদিকে দেবেশেরও প্রতিবাদের কারণ হবে না, এমন কী বলা যেতে পারে? মালতীর উদ্ভাবনী শক্তি হার মানল।

দেবেশকে সে তার শোবার ঘরে, অর্থাৎ যে ঘরে রেডিও আছে, সে ঘরে নিয়ে যেতে সাহস করল না। বাইরের বসবার ঘরে বসিয়ে জেরা করে জানতে চেষ্টা করল, দেবেশ কেন তার বেতার-বক্তৃতা ফেলে আগে চলে এসেছে। সে কি মালতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে? সেটা এমনই আশাতীত সম্ভাবনা যে সেটাকে সম্ভব বলে ভাবতেও মালতীর ভয় হলো। তবে?

যে অবাধ্য প্রশ্নটা কেবলই মনের মধ্যে বিনানুমতিতে অপ্রতিহতবেগে আনাগোনা করছিল, তাকে লুকোবার জন্যেই যেন মালতী বলল, "আচ্ছা, কালকের ছবিটায় ওই অনাথ ছেলেরা গোড়ার দিকে ওই অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের পরে হঠাৎ আবার যখন বেকার হোলো তখন এমন বিপথে গেল কেন?

তাহলে আর পরিবর্তন হোলো কী ? তাহলে কি এই বুঝতে হবে না যে, ওদের পক্ষে পরনির্বাচিত কাজ ছিল অন্যান্য নেশারই মতো আর একটা নেশা মাত্র, যার কমতি হওয়া মাত্র অন্তর্নিহিত দুর্বলতার অজগরগুলি অদম্য উৎসাহে বেরিয়ে এলো ? আমি অবিশ্যি সবটা বুঝিনি, তবে—”

দেবেশ মালতীকে বাধা দিয়ে সোল্লাসে বলল, “একেবারে ঠিক বুঝেছেন। ওরা ধর্মকে বলে—আফিম। আমি ওদের নব্য সংস্কারপন্থাকে বলি—কোকেন বা মর্ফিয়া। আরও সঠিক তুলনা হবে—উত্তেজক কোনো ভয়ঙ্কর নেশা। আফিম যে খায় সে তো ঘুমোয়, কাউকে মারতে যায় না। তাতে যা ক্ষতি সে তার একান্তই নিজের। এদিকে ওদের নেশার ফল একেবারে বিপরীত। এতে লোক অলস হয় না, হয় অতিমাত্রায় সক্রিয় এবং তার ফল মারাত্মক। এই কথাটাই আমার আলোচনায়—”

দেবেশ মালতীকে বাধা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেছিল। তার বাধা পড়ল সরোজের আগমনে।

সরোজ ভেবেছিল, আসবে না। কিছুতেই না। কাল যা হয়ে গেছে, তার পরে আবার মালতীর কাছে যাওয়া, কুকুরের মতো, না কোনো মতেই না।

আপিস থেকে ফিরে বাড়ি যায় নি সরোজ। আসা-না-আসার দুরূহ সমস্যার সমাধান খুঁজেছে মালতীর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পথে পায়চারি করতে করতে। সমাধানটা আত্ম-সম্মানসম্মত হওয়া চাই—এই ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিছুক্ষণ

পরে মনে হোলো, সম্মানের প্রশ্নটাই এ প্রসঙ্গে অবান্তর। প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা আরও শিথিল হোলো যখন মনে এলো যে, মালতী তাকে আজ যেতে বলেছিল।

মালতী না হয় তাকে ভালোবাসে না, তাই বলে সৌজন্যের কথাও বিস্মৃত হতে হবে কি? আসবে না, এই কথাটা যে একবারও সে কল্পনা করতে পেরেছিল এ জন্যে সরোজ নিজেকে তিরস্কার করল এবং পরক্ষণেই দেখল, কখন সে দ্রুতপদে পদচালনা করে একেবারে মালতীর বাড়ির সিঁড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ঘরে প্রবেশ করেই যখন দেখল যে, দেবেশ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবেশ—ঈষদুত্তেজিত কণ্ঠে কী যেন বলছে এবং মালতী তাই অবিভক্ত একাগ্রতার সঙ্গে শ্রবণ করছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সরোজ তখন আবার নিজেকে ধিক্কার দিল তার নির্লজ্জ নির্বুদ্ধিতার জন্যে। সম্মানের প্রশ্ন এখন অপ্রাসঙ্গিক মনে হোলো না। সরোজের এমনিতেই নিমজ্জমান অন্তর এখন আত্মগ্লানির পঙ্কে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত হোলো।

আগন্তুকের প্রবেশেই দেবেশ চুপ করেছিল। মালতীর পিঠ ছিল দরজার দিকে, তাই সে দেখতে পায় নি। দেবেশের আকস্মিক নৈঃশব্দ্যে পিছনে তাকিয়ে দেখল সরোজকে। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "এসো সরোজ।"

সরোজ এগিয়ে এলো। মালতী অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করছিল। সরোজকে কেউই ভয় পায় না, মালতী তো দূরের কথা। তা নইলে মালতী ভীত হোতো, শুধু অপ্রস্তুত নয়।

ধরা পড়েছে যেন। কিন্তু তার চাইতেও আশু সমস্যা হচ্ছে, মালতী ওদের পরিচয় করিয়ে দেবে কী করে? সরোজ তার কে? দেওর?—সে তো পুরো সত্য নয়। আর দেবেশেরই বা কী পরিচয় দেবে মালতী? বন্ধু?—এটা মালতীর নিজেরই কাছে চরম মিথ্যা বলে মনে হোলো।

সম্বন্ধের সমস্যা এড়িয়ে মালতী কোনো ক্রমে শুধু মাত্র দু'জনের নাম ঘোষণা করে তখনকার মতো কর্তব্য সমাধা করে পলায়নের উদ্দেশ্যে যোগ করল, "সরোজ, তুমি ওকে আমার ঘরে নিয়ে যাও, আমি এখনই চা নিয়ে আসছি তোমাদের জন্যে।"

যে প্রশ্নটা মালতী কিছুতেই জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারছিল না, সরোজ তাই দিয়েই আলাপ শুরু করল ভয়ে-ভয়ে, "আজ রাত্তিরে আটটায়ই না আপনার—?"

দেবেশের উত্তরটা শুনতে মালতী একটু দাঁড়াল। দেবেশ মালতীকে একটি বিস্ময় উপহার দিতে চেয়েছিল। আগে থেকে তার একটুও আভাস দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু ছাবর আলোচনার কথা বলতে গিয়ে মুহূর্তকাল পূর্বেই সে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে, বক্তৃতা সে বাদ দিয়ে মালতীর এখানে আসে নি।

এখন সরোজের প্রশ্ন শুনেই বলল, মালতীর দিকে তাকিয়ে "তা, আটটা বাজতে তো আর বেশি বাকি নেই। অতএব—।"

কথাটা শেষ না করে দেবেশ যখন একটু মাত্র হাসতে শুরু করেছে, অমনই বাইরের ঘরের বৃহৎ প্রাচীন দেয়াল-ঘড়িটায়

ঢং ঢং করে আটটা বাজতে লাগল, আর মালতী অমনই ছুটে রেডিওটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যেতে যেতে সরোজের উদ্দেশ্যে বলল, "এসো আমার ঘরে।"

আমন্ত্রণটা যে মুখ্যত দেবেশেরই উদ্দেশ্যে, সরোজের সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। বেচারী মুষড়ে পড়ল। যে হীনতা-ভাবের অভিশাপ থেকে মালতীই একদিন তাকে মুক্তি দিয়েছিল, আজ তাই আবার তাকে অধিকার করল। পার্শ্ববর্তী দেবেশের দিকে তাকিয়ে সরোজের নিজেকে বড়ো নগণ্য বলে মনে হোলো; বড়ো ক্ষুদ্র, বড়ো অকিঞ্চিৎকর। নিরুৎসাহ পদক্ষেপে সরোজ দেবেশকে নিয়ে মালতীর ঘরে প্রবেশ করতেই রেডিওতে দেবেশের চিত্র সমালোচনা শুরু হোলো।

সরোজ সবিস্ময়ে দেবেশের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিক্ষেপ করল। দেবেশ দৃষ্টি এড়াল। অদ্ভুত শোনাচ্ছিল নিজের গলাটাকে! যেন নিজের নয় ওটা! মালতীর মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটাতে মন চাইল না, নয়তো দেবেশ এখনই উঠে বন্ধ করে দিতো রেডিওটা। গলাটা শুনতে মন্দ নয়, রেকর্ডিংয়েও নয়, কিন্তু কী যেন নেই যা সজীবতার পরিচায়ক। প্রাণ যা আছে সে যেন গ্যালভানির ম্যাজিক; এ গলায় মৃত ভেকের দেহের লম্ফন আছে, নেই যেন জীবন্ত হৃদয়ের ছন্দিত স্পন্দন। দেবেশ অসহ্য সঙ্কোচে মুখ ঢাকল সামনের হাতপাখাটা তুলে নিয়ে।

স্বরকে না হয় বিকৃত করেছে যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু ভাষা? দেবেশ নিতান্ত অস্বস্তির সঙ্গে বক্তৃতাটা শুনছিল আর কেবলই মনে হচ্ছিল, এখানে এ শব্দটা অপ্রয়োজনীয়, ওখানে ও শব্দটা

অপপ্রযুক্ত। অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেকার লেখা বক্তৃতাটা। কী ভয়ানক মূর্খ ছিল দেবেশ সাত ঘণ্টা আগেও! দেবেশের কান্না পেল নিজের ইদানীন্তন মূর্খতায় আক্ষেপের সীমা রইল না মালতী কী ভাবছে সেই আশঙ্কায়।

বক্তৃতাটা শেষ হতেই দেবেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সসঙ্কোচে মালতীর দিকে তাকাল। সরোজও সেদিকে সকরুণ দৃষ্টি যোগ করল।

আর মালতী? মালতী নিষ্পলক নেত্রে দেবেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে দৃষ্টিতে আনন্দ ছিল, সে আনন্দ শুদ্ধমাত্র শ্রবণের নয়। সে দৃষ্টিতে প্রশংসা ছিল, সে প্রশংসা প্রায় স্তুতি। সে দৃষ্টিতে পূজা ছিল, সে পূজার বলি কোনো নিরপরাধ প্রাণীরূপী প্রতীক নয়, পূজারিণী নিজে।

স্তব্ধা মালতীর মুখরা দৃষ্টিতে সেই পরম মুহূর্তে যে মধুরা বাণী মূর্ত হোলো, তার অশ্রুত গুঞ্জনে মালতীর ক্ষুদ্র ঘরখানি কানায় কানায় ভরে উঠল। তেমনই ভরে উঠল দেবেশের হৃদয়।

শুধু অসীম শূন্যতার মাঝে বিদায় নিল অবহেলিত সরোজ।

পরাজয়ের গ্লানি গোপন করবার প্রাণান্তকর প্রয়াসে যাবার আগে দেবেশকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল, "সত্যি, আপনি অদ্ভুত ভালো বলেন!"

অভিনন্দনটা অনান্তরিক ছিল না একটুও, তবু সরোজের স্বরে যা শ্লেষ ছিল সে শুধু অশ্রুরোধের করুণ প্রয়াসের অনিচ্ছাদত্ত ইঙ্গিত। দেবেশ আর সকলেরই মতো প্রশংসাপ্রিয়, কিন্তু একেবারে সামনে কেউ প্রশংসা করলে বড়ো অপ্রস্তুত বোধ

করে। এখন একজন অত্যন্ত স্বল্পপরিচিত ব্যক্তির এমন অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক প্রশংসাজ্ঞাপনে বড়োই বিব্রত বোধ করল এবং সময়োপযোগী কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে অসহায়ভাবে মালতীর দিকে তাকাল।

এই অসহায়তাকে সরোজ ভুল বুঝল অবহেলা বলে। কয়েকটা অসহ্য মুহূর্ত একবার মালতীর দিকে আর একবার দেবেশের দিকে তাকিয়ে সরোজ প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা চলি, মিস্টার মুখার্জি।" দেবেশ যখন হাত তুলে অভিবাদন জানাতে যাবে. তখন সরোজ মালতীর দিকে তাকিয়ে আরও যেন অদ্ভুত একটা স্বরে বলে উঠল, "দিদি, চলি। গুড বাই।"

কেউ কিছু বলতে পারবার আগেই সরোজ বিদ্যুৎ বেগে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেবেশ কিছু বুঝতে পারল না, চুপ করে রইল।

মালতীর লজ্জার সীমা ছিল না। এমন একটা বিশ্রী দৃশ্য করবে সরোজ, এবং তা দেবেশের উপস্থিতিতে, মালতী কল্পনাও করে নি এমন অবস্থাব কথা। ছি ছি! দেবেশ কী না যেন ভাবছে সরোজের সম্বন্ধে বা মালতীর সম্বন্ধে! তার চেয়েও মারাত্মক, মিলিতভাবে দু'জনের সম্বন্ধে!

কিছুক্ষণ দু'জনেই নিতান্ত অস্বস্তির সঙ্গে নীরব থাকবার পরে মালতী অনিশ্চিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কী ভাবছেন চুপ করে?"

দেবেশ আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলল, "কই, কিছু না তো!"

মালতী স্বগতোক্তির মতো বলল, "আমার সম্বন্ধে কী ভাবছেন জানি না, কিন্তু একটু আগে যে অপ্রীতিকর ব্যাপারটা হয়ে গেল, এতে আমার উপর দয়া করে অপরাধ নেবেন না যেন। আমি জানতাম না যে—"

"কিন্তু এইটি স্পষ্ট করে জানুন যে, আমি একটুও অপরাধ নিই নি।"—দেবেশ বলল মালতীকে বাধা দিয়ে। তারপরে যোগ করল, "একটু রহস্যময় বলে মনে হয়েছে শুধু। আর কিছু নয়। একটু যেন নাটকীয়।"

মালতী তবু নিশ্চিন্ত বোধ করল না। একবার মনে হোলো দেবেশকে এখন যেতে দিলেই ভালো। পরক্ষণে মনে হোলো না, এতগুলি ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ওকে যেতে দেব না। বেরুবার মতো পোশাক মালতীর পরাই ছিল। শুধু চটিটা ছেড়ে জুতোটা পরে নিয়ে বলল, "চলুন, বেরুনো যাক।"

দরজা দিয়ে বেরুতে বেরুতে বলল, "নাটকীয়, না? কিন্তু কী নাটক? প্রহসন, না, ট্র্যাজেডি?"

দেবেশ জানত না। উত্তর এড়িয়ে কোনো এক ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করে বলল, "দুটোয় মূলগত প্রভেদ নাকি সামান্যই। ঘটনা এক এবং অভিন্ন—নিজের জীবনে ঘটলে সে হয় ট্র্যাজেডি আর অপরের জীবনে হলে তাকে বলি প্রহসন।"

কথাটা মালতীর মনে ধরল। বলল, "কিন্তু হাসবার আগে বিষ্কম্ভকটা শুনবেন কি কোথাও বসে একটু ধৈর্য ধরে?"

দেবেশ সাগ্রহে ও সানন্দে মালতীর অনুসরণ করে পথে বেরুল।

চোদ্দ

ভাষার সৃষ্টি ভাবকে গোপন করবার জন্যে—এ কথাটা অপেক্ষাকৃত নতুন, এবং অন্তত আমাদের দেশে, অল্প কিছু দিন আগেও এটা সত্য ছিল না। পল্লী অঞ্চলে বোধ করি আজও ভাষার এই বিকৃত ব্যবহার শুরু হয় নি। এমন কি শহরেরও বৃদ্ধ, বিশেষ করে, বৃদ্ধাদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, নাগরিক জীবনের এই কপটতা এখনও সংক্রামিত হয় নি। তাঁরা নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করেন, কত মাইনে পাই এবং চাকরি স্থায়ী কি না। এই আপাত-অশোভন প্রশ্নের পশ্চাতে নেই কোনো কুৎসিত ইঙ্গিত বা ঈর্ষার জ্বালা, তাই বিব্রত বোধ করলেও রাগ করিনে। কিন্তু এই স্পষ্টবক্তারা দ্রুতবেগে বিদায় নিচ্ছেন আমাদের সামাজিক মঞ্চ থেকে। সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হচ্ছে সর্বপ্রকার আন্তরিকতা।

আমাদের দেশে যথার্থ নগর আজও গড়ে ওঠে নি, কিন্তু নাগরিকতার নানা অভিশাপ পরিব্যাপ্ত হয়েছে চতুর্দিকে। পরিবর্তনটা বহুলাংশেই বাইরের। ভিতরের মনটায় না আছে কালকের আন্তরিকতা, না আজকের নাগরিকতা। অশ্বত্থগাছের শীতল ছায়া নেই শহরের জীবনে, এদিকে গাঁয়ের গাছতলার উষ্ণ পরনিন্দা চলেছে প্রতি মোড়ের চায়ের দোকানগুলিতে।

দেবেশকে সঙ্গে নিয়ে দরজার কাছে আসতেই মালতীর

সেই কর্মহীন, শিক্ষাহীন, রুচিহীন ইতরগুলির কথা মনে পড়ল। ওই রাস্তার ধারের দোকানটায় বসে আছে শকুনগুলি। ভয় নয়, ঘৃণা হয় ওদের কথা ভাবলে। কিন্তু কাউকে যে ঘৃণা করতে হয়, না করে উপায় থাকে না, এতেও যেন নিজেকে নীচ করা হয়।

এদের এড়িয়ে চলায় তাই ভীরুতা নেই, আছে রুচির পরিচয়, আছে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখবার, আপন ভদ্রতাবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখবার বুদ্ধিসম্মত প্রচেষ্টা। মালতী তাই দেবেশকে সঙ্গে নিয়ে ওই মোড়ের চায়ের দোকানটার সামনে দিয়ে গিয়ে ওদের কুৎসিত আলোচনায় ইন্ধন যোগাতে অস্বীকার করল। দরজায় একটু দাঁড়াবার পরেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দু'জনে সেইটেতে উঠে বসল।

সরোজের অমন আকস্মিক নিষ্ক্রমণ, তার পর মালতীর অদ্ভুত নীরবতা, তার পর তা ভাঙবার জন্যে আরও দুর্বোধ দু-একটা অসংলগ্ন উক্তি—দেবেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে মনে সে সন্ধ্যাটির যে মধুর রূপ পরিকল্পনা করেছিল, তার কিছুই সত্য হয়ে দেখা দিল না। বেসুরো সন্ধ্যায় দেবেশ চুপ করে রইল। তাকিয়ে রইল ট্যাক্সির বাইরের গতিশীল ও অপসরমান দোকানের সারির দিকে।

মালতীর মনে শুধু নৈরাশ্যই ছিল না, যদিও তার কল্পনার সন্ধ্যা দেবেশের সন্ধ্যার চাইতেও সহস্রগুণ রঙিন ছিল। তার বেলায় নৈরাশ্যের বোঝার উপর ছিল এক রাশি সমস্যা। সরোজ এবার কী করবে কে জানে? আর, কিছু করলে তার

কতটুকু দায়িত্ব মালতীর? মালতী যা করেছে, তা থেকে অনুরূপ করাই কি উচিত হোতো? এখনই বা তার কী কর্তব্য?

প্রশ্নগুলি দেবেশকে জিজ্ঞাসা করবে করবে ভেবেও কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারছিল না একটা বর্ণও। এদিকে দেবেশও অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে তাকিয়েছিল মৌন হয়ে। বাতাসে তার অবাধ্য চুলগুলি উড়ে এসে কপালের উপর পড়ছিল, কিন্তু সেগুলিকে সাজাবার সামান্য চেষ্টাও করছিল না দেবেশ। অসহ্য নৈঃশব্দ্যে অধৈর্য হয়ে হঠাৎ একটা জায়গায় এসে, বোধ হয় ময়দানের কাছাকাছি হবে, মালতী ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে বলল। নেমে কিছুদূর এগিয়ে এসে একটা বেঞ্চিতে আসন গ্রহণ করল।

তবু মুখে কারও কথা নেই।

আর একটু আগে নাগরিকতার অভিশাপ নিয়ে যে কথা বলেছি, তার আর একটা অভিব্যক্তি হচ্ছে কৌতূহলের চেষ্টাকৃত অপ্রকাশে। এটা ইংরেজদের কাছ থেকে শেখা। প্রতিবেশী সম্বন্ধে, এমন কি আত্মীয়দের সম্বন্ধে পর্যন্ত, কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আজ বর্বরতা বলে পরিগণিত। জানতে চাওয়া যেন অমার্জনীয় অপরাধ, কিন্তু তাই বলে জানবার অভিলাষ নেই—এমন বললে সত্য বলা হবে না। জন্মজন্মান্তরের কৌতূহল অবলুপ্ত হয় নি দুটো সংক্ষিপ্ত শতাব্দীর বিদেশী সভ্যতার সান্নিধ্যে। সেই কৌতূহলের প্রকাশ শুধু হয়েছে নিষিদ্ধ। মালতী-দেবেশের যুক্ত নৈঃশব্দ্যের এইটেই প্রকৃত ব্যাখ্যা।

যদিও একজন বলতে ব্যাকুল হয়েছিল এবং অপরজনও শোনবার প্রত্যাশী হয়ে প্রতীক্ষা করছিল, তবু তাই একজনও প্রসঙ্গটার উত্থাপন করতে পারছিল না। মালতী জানতে চায় দেবেশের কথা, জানাতে চায় নিজের কথা। কিন্তু উপায় নেই। আজ পর্যন্ত যা কিছু কথা হয়েছে তা হয় বই নিয়ে, নয়, ছবি নিয়ে। নিজের কথা বলে নি কেউ। কথায় শুধু কথা বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে অতৃপ্ত কৌতূহল।

সুযোগ এলো সরোজ-সমস্যার ছদ্মবেশে।

হঠাৎ মালতী বলল, "একটা গল্প বলি শুনুন। আমি শেষ না করা পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না কিন্তু।"

"আমি বক্তা কেমন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু আমি যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রোতা—আমার এ দাবি নিয়ে অন্তত কেউ আজও বিবাদ করে !"

মালতী মৃদু হাস্যে রসোপভোগের ইঙ্গিত জানিয়ে শুরু করল, "এক ছিল একাকিনী বালবধূ। বালবিধবার জন্যে যে অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হয়ে থাকে, তার এক বিন্দুও ওর জীবন-মরুর কোনো ক্ষুদ্রতম কোণকে করে নি একটুখানি শীতল। বিধবার জীবনে যে নিঃসীম শূন্যতা, তাও জোটে নি ওর মন্দ-ভাগ্যে। ওর জীবনটা ভরা ছিল সেইখানে যেখানে নিশ্বাস-বায়ুর প্রবেশপথ, আর ফাঁক ছিল ঠিক সেখানে যেখানে প্রয়োজন ছিল পূর্ণতার। এমন একটা ঘর যেন—যার ছাদ নেই রক্ষার জন্যে, জানালা নেই হাওয়ার জন্যে। বিয়ের পরে

মা-বাবা পর হলেন, শ্বশুর-শাশুরী সে আসন দাবি করলেন কর্তব্যের রুদ্রবেশে। ফল সুখের হোলো না কোনো পক্ষেই। নিঃসঙ্গিনী মেনে নিল ভাগ্যের এই পদাঘাত নিঃশব্দে। সান্ত্বনার সন্ধান করল না কলহের কুৎসিত উত্তেজনায়। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে সে, এগুলি সামান্য ক্ষতি। এহ বাহ্য। আগে চল আর।

"আগে এসে যে দেয়ালে কপাল ঠেকল, সে দেয়ালের লেখার কাহিনী কেউ জানে না। বেচারী জানায় নি কাউকে। যাকে তাকে জানানো যায় না সে কথা। জানাবার মতো লোকই মেলে নি হতভাগিনীর।"

অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল না কিছুই। কিন্তু উৎকর্ণ দেবেশ স্পষ্ট শুনতে পেল মালতীর মৃদু দীর্ঘশ্বাস। ক্ষুদ্র আলপিন পড়লে যেখানে শোনা যেত, সেখানে কি অশ্রুত থাকবে দীর্ঘ ছুরিকার মর্মভেদী নিম্নগতি?

"কিন্তু থাক্ সে কথা। অভাগিনীর জীবন থেকে সুর না হয় দূরই হোলো, ছন্দ না হয় নাই রইল, দুয়ে মিলে যে সঙ্গীত হতে পারত তাও না হয় নাই হোলো—কিন্তু কথা? দুটো কথা কইবার সাথীও কি পাবে না সে? চতুর্দিকে সবাই সদাব্যস্ত। তার জন্যে এক দণ্ড সময় নেই কারও। এদিকে তার নিজের সময় অফুরন্ত, অচলন্ত। কী করবে সে? আপনি কী করতেন ওর অবস্থায়?

"বাধা দেব না বলেছি। আপনি বললেও না।"

"ভালো। ঠিক এমনই সময় বেচারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল

এমনই আর এক বেচারীর। পুরোপুরি মিল হোলো না—না, এমন ভাগ্য সে সঙ্গে আনে নি—কিন্তু বলা যাক একে, অন্তত অংশত, লিওনাইন্ মিল। শেষ পর্যন্ত নয়, শুধু মাঝখানে একটা জায়গায় মিল। নাই মিলের চেয়ে কানা-মিল ভালো। একাকিনী তাই নিল, মনে তুলে নয়, মাথায় তুলে।"

"আচ্ছা।"—মালতী একটু থেমে বলল, "মন আর মাথায় দুস্তর দূরত্ব, তাই নয়?"

দেবেশ এ প্রশ্ন নিয়ে অনেক ভেবেছে। কিনারা পায় নি। অনিশ্চিতভাবে উত্তর দিল, "কী জানি! দূরত্ব আছে জানি, সে দূরত্ব যে দুস্তর তাও জানতে বাকি নেই। বিরোধটাকে একজন লেখক, গণতন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। সে মাথা-গুনতিতে মাথার মাত্র একটি ভোট, আর মনের আছে দুটি। এই দ্বন্দ্বে মনের জয় অবধারিত আর মাথার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।"

"ঠিক তাই। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন? আপনার বেলায় অনুপাতটা বিপরীত—দুটো মাথা আর একটা মন।"

কথাটা যে একেবারে মিথ্যা নয়, দেবেশ তা অন্তত নিজের কাছে অস্বীকার করল না। মাথার তুলনায় মনটা বোধ হয় তার সত্যিই অপেক্ষাকৃত অপরিণত। দেবেশ ভাবতে লাগল এ সম্বন্ধে, কিন্তু মালতীর কাহিনী শোনবার কৌতূহল প্রকাশ করে বলল, "আপনার গল্পে ছেদ পড়েছে কিন্তু।"

"আচ্ছা। দুই বেচারীতে দেখা হোলো। কিন্তু এ কেমন

দেখা ? আমার বান্ধবীর জীবন ভরল না, শুধু সময় ভরল। কিন্তু তার বান্ধবের শুধু সময় ভরল না, জীবনও ভরে উঠল কানায় কানায়। বাহিরের কথা—অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা যত কিছু, সব ক্ষতির বুঝি পূরণ হোলো আমার বান্ধবীর দাক্ষিণ্যে। শুধু মাত্র বাহিরের কথা হলে ক্ষতি ছিল না, বিরোধ বাধত না তা নিয়ে, কিন্তু আপত্তি এলো ঘর থেকে। সে বান্ধবের ঘরে না ছিল মন, না মান। ঘরের বাইরে সাময়িক আশ্রয় যখন মিলল, ঘর তাকে করল একঘরে।

"বান্ধবী নিজেও জানত তার আশ্রয়ের অবশ্যম্ভাবী অস্থায়িত্বের কথা, ভঙ্গুর এ আশ্রয় ভেঙে গেলে আশ্রিতের পূর্বতন আশ্রয়হীনতা যে সহস্রগুণ কঠোর হয়ে বাজবে, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল না আশ্রয়দাত্রীর। জানত সে, সে তো নয় ছাতা, যে পথিকের সঙ্গে যেতে পারবে। সে শুধু পথের পাশে পোর্টিকো, দিতে পারে একটু ছায়া, একটু ঢাকা, যে ক'টা মুহূর্ত দাঁড়বে তার তলায়। পরেই তোমার এগুতে হবে, পিছনে থাকবে পোর্টিকো, মাথার 'পরে আকাশ আর রোদ-বাদল।"

দেবেশ চুপ করে শুনছিল। ভালো লাগছিল। ছন্দসমৃদ্ধ গদ্য কবিতার আবৃত্তি যেন। একটু থেমে মালতী আবার শুরু করল।

"পথিককে পোর্টিকো স্মরণ করিয়ে দিতে পারত, সাবধান করে দিতে পারত যে, বন্দোবস্তটা আদৌ চিরস্থায়ী নয়। ভেবেও ছিল দেবে বলে। চেষ্টা করেছে বহুবার। পারে নি।

কিছুটা সঙ্কোচ, তার চেয়ে বেশি মমতা এসে বাধা দিয়েছে। বলতে গিয়ে থেমে গেছে আশ্রিতের মলিন মুখ দেখে। নিরাশ্রয় তো বেচারী হবেই একটু পরে, আগে থেকে ওকে নিরাশও কি করতে হবে তাই বলে? সঙ্গীহীনার সাধ্য ছিল সামান্যই ভালো করবার বা মন্দ করবার। আনন্দও দিতে পারল না কাউকে। আর একজনের এমনই ভাগ্যদোষ যে, সে এসে ঠাঁই নিল কিনা এই ভাগহীনারই কাছে! আপনি বলুন, তাকে তাড়িয়ে দিলেই কি নারীধর্ম রক্ষিত হোতো? মায়া, মমতা, দয়া, করুণা, এগুলি কি এমনই অক্ষমণীয় অপরাধ?”

মালতীর কণ্ঠে ছিল তীব্র ক্ষোভ। তার প্রশ্নেরই মধ্যে নিহিত ছিল তার আপন তিক্ত উত্তর। দেবেশ কিছু বলল না। সমর্থনেও না, প্রতিবাদেও নয়। মালতীর বিবৃত কাহিনীতে বিবরণ ছিল অসম্পূর্ণ, তাই থেকে দেবেশ ঠিক বুঝতে পারছিল না—কী হয়েছে এবং কেন, যদিও বর্ণনার সুরে নির্ব্যক্তিক নিরাসক্তি এতই অল্প ছিল যে, কাহিনীর নায়িকার আসল পরিচয় অনুমান করা শক্ত ছিল না। মালতী একটু থেমে আবার আগের চেয়েও করুণ সুরে তার অসমাপ্ত কাহিনীর আবৃত্তি শুরু করল।

“অথচ এই জন্যেই, এই মায়া-মমতার জন্যেই আমার বান্ধবীকে কী চরম মূল্য দিতে হোলো! আরও যে কত দিতে হবে, কে জানে! প্রথম আঘাত এলো বান্ধবের বঞ্চিত অন্তঃপুর থেকে। অশিক্ষিতা সে অনাদৃতার অভিমান যে কুশ্রী কদর্যতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা অগ্রাহ্য করা যদিবা সম্ভব হোলো,

সমস্ত ব্যাপারটার সেইখানেই সমাপ্তি ঘটানো ততটা সহজ হোলো না। তারও কারণ, যতটা দম্ভ, তার চেয়ে বেশি করুণা।

"অন্তঃপুরের অন্তর্দাহ এই নিয়ে নয় যে, যা তার ছিল তা ছিনিয়ে নিয়েছে আর কেউ ; যা তার ছিলই না, কখনই না, তাই যে অন্য একজনের কাছে গেছে, ব্যর্থ বিবাহের পুঞ্জীভূত আবর্জনা থেকে নিক্ষিপ্ত একজন যে অন্যত্র আশ্রয় লাভ করেছে, এইটেই হোলো অসহ্য। হীনতা হলেও এতে বেদনা আছে। সহানুভূতির যোগ্য না হলেও একে উপেক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু নিরাশ্রয় পলাতক যেখানে এসে স্থান নিয়েছে, আপনিই বলুন, সেখান থেকে বিতাড়িত হলেই কি সে বিধিনির্ধারিত বাহুপাশে ফিরে যেত? আর ফিরে গেলেও কি লাভ হোতো কোনো পক্ষের? না, ফিরিয়ে-দেওয়াই হোতো বেচারীর প্রতি সুবিচার?"

পূর্বের প্রশ্নগুলির মতো এরও কোনো উত্তর দিল না দেবেশ। কাহিনীর তিনটি ভুজের অন্তত অস্পষ্ট একটা সন্ধান সে এতক্ষণে পেয়েছে, এবং তার নিজের জীবনের সঙ্গে এর যে একটা অতি ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে তাও তার দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু মন্তব্য করার কোনো প্রয়োজন দেখল না। মালতী অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "কী বলুন?"

"যদি অভয় দেন যে আপনার বর্ণিত কাহিনী কাহিনীই, কারও ব্যক্তিগত ইতিহাস নয়, তা হলে দু-একটা অবান্তর মন্তব্য নিবেদন করতে পারি।"

"সে তো আগেই বলেছি।"

"প্রথমেই মনে হচ্ছে যে, আপনি যাকে বঞ্চিত অন্তঃপুর বললেন, তার উপর ঈষৎ অন্যায় করেছেন আপনার বান্ধবী।" —এই কথা বলবার সময় একবার বুঝি বিস্মৃতপ্রায় বাণীর কথা মনে হোলো দেবেশের।

মালতী সংক্ষেপে দেবেশকে বাধা দিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলেম না, কিন্তু ওর কথা থাক্। আর আপনার কী মনে হয়েছে, বলুন?"

দেবেশ তার মন্তব্যগুলি এক-দুই-তিন—এই রকম নম্বর দিয়ে সাজিয়ে ভেবেছিল। এই তার অভ্যাস, এবং বলতেও যাচ্ছিল সেই ধারা অনুসারেই। মালতীর মতভেদের নির্ভীক প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হলেও সেই ধারা ব্যাহত হোলো না। সে বলল, "দ্বিতীয়, যাকে এতবার আপনি বেচারী বলে কিঞ্চিৎ করুণাভরে বর্ণনা করলেন, সে যদি সত্যি শুধুমাত্র করুণারই পাত্র হয়ে থাকে, তা হলে তার যোগ্যস্থান বোধ করি, আপনি যাকে বললেন 'বিধিনির্ধারিত বাহুপাশ'—সেইখানেই।"

"সেখানে স্থান হলে কি সে পথে বেরিয়ে পোর্টিকোয় আশ্রয় গ্রহণ করত?"

"করা বিচিত্র নয়। অপর পক্ষে স্থানচ্যুতি ব্যাপারটাই বহুলাংশে কল্পিত হতে পারে। আমি জানি নে। কিন্তু আমাকে অতি মাত্রায় সংরক্ষণশীল বা আর যাই কিছু মনে করুন না কেন, আমি আপনার বেচারীর অবিমিশ্র প্রশংসা করতে অক্ষম।"

"প্রশংসা চাই নি। নিন্দা যে করেন নি তাই বেচারীর

ভাগ্য। কিন্তু অসহায় বলে একটু সহানুভূতিও কি পেতে পারে না বেচারী?"

"অসহায়ের কথায় মনে পড়ল, অনুমতি দেন তো আপনার গল্পের মধ্যে আর একটা ছোট গল্প বলতে পারি।"

মালতী গল্প বলে নি। নিজের জ্বলন্ত সমস্যাকে গল্পের ছদ্মবেশ দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু এখনও বলতে পারল না সে কথা। উৎসাহহীনতা সত্ত্বেও বলল, "বলুন।"

এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল স্পষ্টতই ব্যক্তিগত কথা নিয়ে। দেবেশের কথায় তাই জড়তা ছিল। অন্য কথায় আসতে পেরে স্বচ্ছন্দে শুরু করল, "আপনার এই অসহায় অনুকম্পা-ভিক্ষুরা হচ্ছে সিণ্ডেরেলার পুরুষ-সংস্করণ। না, ঠিক সিণ্ডেরেলা নয়, তার চেয়েও নিকট হচ্ছে ফরাসী নাটকের পিয়েরো। সত্যিকার বেচারী! ডন জুয়ানের ঠিক উল্টো আর কি। অচঞ্চল কিন্তু সদাব্যর্থ প্রেমিক। বিধাতা একে তৈরি করেছেন শুধুমাত্র ব্যর্থতারই জন্যে, ব্যর্থতায়ই যেন এর সার্থকতা। এর একমাত্র পুরস্কার অনুকম্পার অশ্রু এবং এই পুরস্কার সে যুগে যুগে অবিচ্ছিন্ন ধারায় লাভ করে তুষ্ট ছিল।

"তারপর রেস্টরেশন প্যারিসের অভিনেতা দেব্যুরো প্রাবাদিক পিয়েরোর এক নতুন ও বিভিন্ন রূপ দিতে চাইলেন। তাঁর পিয়েরো প্রেমিক, কিন্তু ব্যর্থপ্রেমিক নয়। ঠিক যবনিকাপতনের পূর্বে এই নব্য পিয়েরোর গলায় মালা পরাতেন দেব্যুরো। এই পিয়েরো অভিনবত্বের গুণে, এবং দেব্যুরোর অভিনয়ের গুণে, কিছু দিনের জন্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল

কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। পুরানো পিয়েরো পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে, আবার সে দর্শকের অনুকম্পা লাভ করে আপন আসল রূপ ফিরে পেয়েছে। পিয়েরোর সৃষ্টিই পরাজয়ের জন্যে। দেব্যুরো কিছু করতে পারে নি।”

“দেবুর দেখছি কিছু করবার ইচ্ছাই নেই।”—মালতী সশ্লেষে ও সহাস্যে বক্তৃতাটার সমাপ্তি ঘটাল।

দেবেশের আলোচনায় যে হৃদয়হীন লঘুতার আভাস ছিল, মালতীর তা ভালো লাগল না। নাটকের কল্পিত চরিত্র আর বাস্তবে৺ [illegible]বন্ত মানুষ কি এক? এ দুয়ের কি কোনো প্রভেদ নেই এই লোকটার কাছে? আর একটু আগে মালতী বলেছিল, এই লোকটার দুটো মাথা আর একটা মন। এখন মনে হোলো, সেটাও বোধ হয় ঠিক নয়। তিনটেই বোধ হয় মাথা, মন বলে বোধ হয় কোনো বালাই নেই এর।

মালতী গভীর নৈরাশ্যের সুরে আস্তে আস্তে বলল, “অদ্ভুত লোক আপনি! সবাই দেখেছি সাহিত্যের বিচার করে জীবনের ফিতে নিয়ে। আর আপনি দেখছি জীবনকে মাপেন সাহিত্যের মাপকাঠিতে।”

কথাটার সত্যতা দেবেশ নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারল না। চুপ করে রইল। একটু পরে পালাবার পথ পেল পাল্টা প্রশ্নে, “কিন্তু আমরা তো কাহিনীই আলোচনা করছিলেম, তাই নয়?”

মালতী গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলল, “কাহিনীই বটে।”

অর্থাৎ কাহিনী নয়? অর্থাৎ সত্য? অর্থাৎ দর্শকের

মনোরঞ্জনের জন্যে বানানো সুখ-দুঃখের রঙমাখা অভিনয় নয়? অর্থাৎ এখানে একজনের হাতে এবং অপরজনের বক্ষে যে লাল তরল জ্বলজ্বল করছে, তা আলতা নয়? রক্ত? দেবেশের কাছে সমস্ত সমস্যাটার চেহারা যেন নিমেষে বদলে গেল। গল্পটা যে একেবারে গল্প নয় এমন সন্দেহ হয়েছিল আগেও। কিন্তু মালতীর স্বীকৃতিতে সন্দেহ উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে দেবেশকে যেন প্রবলভাবে আঘাত করল। ব্যথা নিয়ে পরিহাস করার জন্যে গভীরভাবে দুঃখিত হোলো।

তবু ভালো যে মালতীর সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলে নি। একটু আগেও তো সে ছিল জ্যামিতিক একটা ত্রিকোণের তৃতীয় ভুজ মাত্র। এখন দেবেশ তার পার্শ্ববর্তিনীর দীর্ঘ ছায়ার দিকে ভয়ে ভয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। ছায়াটাকে মনে হোলো কোন অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতার উদ্দেশ্যে উত্থিত মালতীর বাদী দুটি বাহু বলে।

অনেক ইতস্তত করে অনুতপ্ত কণ্ঠে দেবেশ বললে, "ক্ষমা করবেন। আপনার বান্ধবী ও তাঁর বান্ধবকে নিয়ে পরিহাস করবার কোনো দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। যদি কোনো ব্যথা দিয়ে থাকি, তা একান্তই অনভিপ্রেত জেনে ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা চাইবার কিছু নেই দেবেশবাবু। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছিলেম যে, বড়ো দুঃখ ছোটর উপর পড়লেই ছোট হয়ে যায় না, বড়োই থাকে। বরং সে ছোট বলেই দুঃখটা বোধ হয় আরও বড়ো হয়ে বাজে।"

পরিতপ্ত দেবেশ আর কিছু বলবে না স্থির করেছিল। তাই চুপ করে রইল। নির্ব্যক্তিক স্তর থেকে যে আলোচনা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে এসেছিল, তাতে যোগ দিতে আর তার সাহস ছিল না।

মালতী দেবেশের নীরবতায় অধৈর্য হয়ে বলল, "বলুন দেবেশবাবু। আপনি যা বলেন তা কঠোর। কিন্তু যখন কিছু না বলে শুধু ভাবেন, তখন ভয় হয়, আরও কঠোরতম কিছু ভাবছেন বোধ হয়।"

কঠোরতার উল্লেখটা দেবেশের কানে করুণ আবেদনের মত শোনাল। প্রায় সিক্ত কণ্ঠে মৃদু স্বরে বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি কঠোর নই আদৌ, তবু যা বলি সে যদি কঠোর শোনায়, সে শুধু আমার প্রকাশেরই দৈন্য।"

মালতীর ভালো লাগল কথাটা। এবারে যেন দেবেশকে কিছুটা অন্ততঃ স্বাভাবিক অনুভূতিশীল মানুষ বলে মনে হোলো।

একটু পরে দেবেশই আবার বলল, "তা ছাড়া কী জানেন, অনেক সময় পরবর্তী কালে বৃহত্তর কঠোরতা এড়াবার জন্যেই বর্তমানে মৃদু কঠোরতার প্রয়োজন হতে পারে।"

দেবেশের এই উক্তিতে সরোজের প্রতি মালতীর বর্তমান মনোভাবের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। তাই সে খুশি হোলো, কিন্তু চুপ করে রইল। জানত যে দেবেশ নিজেই বলবে। বললও।

"একটু আগে আপনি দুঃখ সম্বন্ধে যা বলছিলেন, তাও বোধ হয় পুরোপুরি ঠিক নয়। দুঃখ দুঃখই, তা সে যারই হোক। কিন্তু তার আঘাতের প্রবলতায় অসীম তারতম্য ঘটে

পাত্রভেদে। ক্ষুদ্র যে, তার দুঃখও ক্ষুদ্র, কেন-না বৃহৎ দুঃখ, তার চেয়ে বলি মহৎ দুঃখ, ধরবার মতো কল্পনাই তার নেই, অনুভূতিও নেই। এই জন্যেই দেখবেন, বিশ্ব-সাহিত্যের প্রত্যেক ট্রাজিডিতে নায়ক হচ্ছে মহদ্গুণবিশিষ্ট। সাধারণ লোক নয়। বস্‌ওয়েল কার উপমা যেন ধার করে বলেছেন যে পূর্ণ কিন্তু ভিন্নাকার দুটো বোতলের ধারণক্ষমতা যেমন বিভিন্ন, মানুষের বেলায়ও তাই।

"সাধারণের সুখও যেমন স্থূল দুঃখও তেমনিই স্থূল; কোনোটাই মহৎ নয়। একটুকু ছোঁয়ায় বা একটুকু কথা শুনে মনে মনে ফাল্গুনী রচনা করতে যেমন অসাধারণ কল্পনার প্রয়োজন, তেমনই বেদনা আহরণ করতেও চাই অনুরূপ গভীর অনুভূতিশীলতা। তাই কোনো কোনো সময় যাকে অশান্তির অশান্ত তরঙ্গ বলে ভ্রম হয়, তখন অনুকম্পার আতিশয্যে তাতে হাত দিলে জলের আলোড়নটা বাড়ে, কমে না। হস্তসম্বরণ করলে অল্পকালের মধ্যেই হয়তো সে জল তার আপন সমতল ফিরে পাবে। জলের ধর্মই তাই, অধিকাংশ মানুষেরও।"

এখানে মালতী বাধা না দিলে দেবেশের বক্তৃতা আরও কতক্ষণ চলত কে জানে। মালতী বলল, "হয়তো আপনি যা বলেছেন তাই ঠিক। কিন্তু, কিন্তু—।" মালতী একটু থেমে, প্রায় মনে মনে, বলল, "কিন্তু কারও উপর কঠোর হতে গিয়ে দেখি সবচেয়ে বেশি কঠোর হতে হয় নিজের উপর!"

দেবেশ তৎক্ষণাৎ বলল, "কঠোর হবার অধিকার তো আছে একমাত্র এমন লোকেরই।"

অল্পক্ষণ আগে দেবেশ যে ট্রাজিক মহদ্‌গুণের উল্লেখ করেছিল, মালতীর উক্তিতে সে যেন সেই এপিক গুণেরই অস্পষ্ট একটু আভাস পেল। মনে মনে বলল, ইনি সামান্যা নন, ইনি সামান্যা নন।

মালতী ভাবছিল, অধিকার হয়তো আছে। কিন্তু পারে কই কঠোর হতে? শেষ পর্যন্ত চরম কঠোরতাই করা হয়, অকর্মকভাবে, যেমন আজ হোলো সরোজের বেলায়। কিন্তু সময় থাকতে হয়ে ওঠে না কিছুতেই। অবশেষে নিজের দুঃখও বাড়ে বহুগুণ, অপরেরও। নিজেরটা না হয় নীরবে সহ্য করা গেল, কিন্তু অপরে তা মেনে নেবে কেন? তারপরেই শুরু হয় দোষারোপ। বন্ধু অ-বন্ধু হয় না, হয় বৈরী।

দীর্ঘকালের পারস্পরিক নীরবতার পরে মালতী বলল, "কিন্তু কঠোর হলে সেখানেই যে সব কিছুর সমাপ্তি ঘটবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা তো নেই।"

"নিশ্চয়তা নেই। সম্ভাবনা আছে।"

হবে। হয়তো সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মালতীর ধারণা, তার বেলায় সকল সম্ভাবনা কী করে যেন অসম্ভব হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, যা হওয়া একান্তই স্বাভাবিক তাও যেন ঘটে ওঠে না, কেবলমাত্র সে ঘটনা মালতীর ভাগ্যের অনুকূল বলেই। দেবেশের ভবিষ্যদ্বাণীতে তাই মালতী ভরসা পেল না। নিরুৎসাহ নীরবতায় বিষণ্ণ সন্ধ্যাকে অগ্রসর হতে দিল তামসী রাত্রির অভিমুখে।

দেবেশ নির্বোধ নয়। সে জানত যে, মালতীর বর্ণিত

কাহিনী আদৌ কল্পিত নয়। কিন্তু তবু দেবেশ পারে না তার সংকোচকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে। পরস্পরের সম্বন্ধে কৌতূহল পারে না পরস্পরের মধ্যে উত্তুঙ্গ প্রাচীরকে উল্লঙ্ঘন করতে। দুর্দম জিজ্ঞাসা পারে না দুস্তর সংকোচকে অতিক্রম করতে। আগেকার মতো নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতার সুরে দেবেশ বলল, "সংসারে ধ্রুব বলে খুব বেশি জিনিষ নেই। তাই অধিকাংশ সময়েই নির্ভর করতে হয় ল অব প্রবেবীলিটির উপর।"

প্রবেবীলিটি, না, ছাই? মালতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তার কাহিনীর সত্যতা যে দেবেশের কাছে গোপন ছিল না, তাতে মালতীর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবু যে দেবেশ এমনভাবে কাহিনীটার আলোচনা করে চলছিল, নানা তার্কিক আইনকানুনের নজির টেনে—যেন মঙ্গল গ্রহের কারও ব্যাপার এটা, পার্শ্ববর্তিনী মালতীর নয়, এতে মালতী নিতান্ত নিরাশ হোলো।

না কি, মালতীর ঘটনা হলেও দেবেশের কিছু এসে যায় না? কাছে থেকে এমন দূর রচনা করা কেন? ব্যক্তিকে কেন এমন নিক্তির ওজন করা, যেন তর্কের বিষয়বস্তু ব্যতীত এর অন্য অস্তিত্ব নেই? দেবেশ আগাগোড়া এমনভাবে কথা বলছিল, যেন মালতী মালতী নয়, X, সরোজ সরোজ নয়, Y, এমন কি দেবেশও দেবেশ নয়, না, Z নয়—যেন J. দেবেশ মুখার্জি J., একটা পরচুলা হলেই যেন চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়।

এলোমেলোভাবে নানা কথা নিজের মনের মধ্যে ওলট-

পালটা করে ভেবে মালতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, "আর দু'জনের না হয় বিহিত হোলো। কিন্তু আমার কথা কিছু বললেন না তো ?"

আর উপায় নেই। তর্ক তার মুখোশ ফেলে দিয়েছে। স্তব্ধ দেবেশ সময় নেবার জন্যেই তার পকেটে সিগারেটের সন্ধান করতে থাকল। মালতীর প্রশ্নের সঙ্গত উত্তরের চেয়ে সেটা সহজলভ্য হতে বাধ্য।

প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেই মালতীর নিজেরও সংকোচের সীমা রইল না। দেবেশ কী ভাবছে কে জানে! কিন্তু জ্যামুক্ত শর নিয়ে অনুশোচনা করে লাভ নেই। আর এইটে এমন স্পষ্ট ক'রে কোনো না কোনো সময় কেউ না বললে তো শুধু দার্শনিক তর্কের ধূম উদ্‌গীর্ণ হোতো অনন্তকাল ধরে। শুধু কথার পরে কথা জমত। তা হলে এই কাহিনীর অবতারণাই বা করা কেন ? সত্যি কথা। মানল মালতী। তবু সংকোচ যে হয়, সেটাও যে সমান সত্য। মালতীও তার ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকল। কিছু পাবে এই আশা করে নয়, শুধু খোঁজবারই জন্য।

মালতী মনে মনে বলল, ধরা দিয়েছি, এবারও কি ধরা দেবে না ? সব দিয়েছি, এবারও কি কিছু পাব না ?

দেবেশ সিগারেট ও দেশলাই নিয়ে বসে ছিল। ধরায় নি। বিজলী শুধু চমক :আভা হানে, নিবিড়তর তিমির চোখে আনে। ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার। দেশলাইয়ের আগুনও। আর বাড়ায় লজ্জা।

অনেক ভেবে-চিন্তে দেবেশ বলল, "আপনি নারীধর্মের প্রশ্ন তুলেছিলেন একটু আগে। সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে অক্ষম। ওটা শরৎবাবুর রাজ্য, ওখানে আমার প্রবেশাধিকার নেই। মানবধর্ম থেকে স্বতন্ত্র নারীধর্ম বলে কিছু আছে কি না, বা থাকা উচিত কি না, তাও জানিনে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবার যোগ্যতাও নেই আমার। তবে আপনার বান্ধবী—"

"আর তো বান্ধবীর প্রয়োজন নেই, সোজাসুজি বলুন।"

"বেশ। আপনি যা করেছেন, তা ন্যায়ের বিচারে ভালো কি মন্দ তার বিচারের ভার আমার উপর নেই। আপনারও উপর নেই। কিন্তু তার ফল যে শুভ হয় নি, সে তো প্রত্যক্ষ।"

"অন্তত অংশত যে শুভ হয় নি, সে তো স্বীকার করতেই হবে।"

"অংশগুলি অপ্রধান নয়, মিসেস গুপ্ত, বিশেষ করে মানুষের জীবনে। জীবনের সমগ্রতাটা এমনই একটা ব্যাপক ব্যাপার যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, লেখকরা পর্যন্ত আজকাল তাকে পুরোপুরি দেখতে পারবার আশা পরিহার করে স্লাইস্ অব্ লাইফ্ নিয়ে তুষ্ট রয়েছেন। সেই আংশিক বিচারে আপনার এই বন্ধুত্বটি কোনো পক্ষেরই সুখের কারণ হয়নি।"

মালতী আবার বাধা দিয়ে বলল, "সর্বাংশে হয়নি। কিন্তু প্রারম্ভে সরোজ সঙ্গিনী পেয়েছে, ফিরে পেয়েছে আত্ম-

বিশ্বাস। তার স্ত্রীর কথা তুলে কাজ নেই। তার লাভও হয়নি, ক্ষতিও হয়নি। আর আমার? আমার নিঃসঙ্গতার অন্তত আংশিক নিরসন হয়েছিল বইকি।”

বর্তমান বিতৃষ্ণাও মালতীকে অন্ধ করেনি সরোজের ইদানীন্তন সাথীত্বের প্রতি। মালতী কৃতঘ্না নয়।

দেবেশ তৎক্ষণাৎ বলল, “ঠিক কথা। কিন্তু এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে, সমাধানটা কী মারাত্মক রকম স্বল্পায়ু। তার কারণ, এ সম্বন্ধটার ভিত্তিই যে একেবারে অস্থায়ী! বিক্ষিপ্ত দু’জন নরনারী সাময়িক সুবিধার জন্যে যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করল, তার পিছনে না রইল অচ্ছেদ্য কোনো অনুভূতির বন্ধন, না কোনো সামাজিক অনুশাসনের দৃঢ় শৃঙ্খল! এর অকালমৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী।”

সত্যি। এত স্পষ্ট, অথচ সময় থাকতে এসবের কিছুই মনে হয়নি। সময় পেরিয়ে না গেলে বুঝি এই বিশ্বের কোনো কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

মালতী অসহায় অনুনয়ের স্বরে বলল, “আচ্ছা, এখন যে কঠোর হব, তাতে অন্যায় কি বাড়বে না।”

“কার প্রতি অন্যায়? সরোজের স্ত্রীর প্রতি? নিশ্চয়ই নয়, বরং উলটো। সরোজের প্রতি? ও শিশু নয়! সে জানত, সে কী করছে এবং তার জন্যে মূল্য দিতে যদি সে প্রস্তুত না থেকে থাকে, তা হলে তাকে বাঁচাবে কে?”

হঠাৎ দেবেশের স্বরে অদ্ভুত পরিবর্তন এলো। সে

স্বরে সংসারোর্ধ্ব বিচারকের অবাস্তবতা নেই। তাতে যেন পাওয়া যায় অস্পষ্টভাবে অন্তরঙ্গ মৃত্তিকার স্পর্শ। সেই সুরে দেবেশ ধীরে ধীরে বলল, "কিন্তু আমি এখন ওদের কথা ভাবছিনে, মিসেস গুপ্ত। আমি ভাবছি আপনার কথা। মানুষের ক্ষমতা অত্যন্ত পরিমিত; ভালো করবারও, মন্দ করবারও। সেই সামান্য সাধ্যটুকু সাধারণত কেবলমাত্র নিজেরই উপর প্রযোজ্য। তাই যেটুকু আমরা ভালো করি, তার বেশির ভাগই নিজের। যা অন্যায় করি, তাও অন্যের প্রতি নয়, নিজের প্রতি। নিজের কথা ভাবুন।"

মালতী গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে তার সমর্পণ সম্পূর্ণ করল, বলল, "আমি আর ভাবতে পারি নে! আপনি বলে দিন।"

"বলেছি তো। সরোজ সরল ব্যক্তি। তাকে তার সমতল খুঁজে পেতে দিন। জলের মতো।"

"সামাজিক আইনকানুনগুলি একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়। সাধারণের জন্যে তাদের সার্থকতা অপরিসীম। সরোজের পক্ষে তাই যূথভ্রষ্ট হওয়া মানেই ভ্রষ্ট হওয়া, নিজেকে হারিয়ে ফেলা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেশরী পারে নির্ভয়ে বিচরণ করতে, মেষের পক্ষে সে দুঃসাহস করতে যাওয়া বৃথা। সরোজ সামান্য ব্যক্তি। আপনি ওকে অসামান্যের সম্মান দিলেই তো ও অসামান্য হয়ে উঠবে না।"

"সরোজ না হয় গেল, যদিও এসব সত্ত্বেও ওর জন্যে অনুকম্পা হয়।"

"তাতে আপনার সহৃদয়তাই প্রমাণিত হয়, সরোজের অনুকম্পাযোগ্যতা নয়।"

"কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনি কী ভাবছেন তাই ভেবে ভয় পাচ্ছি।"

"আমি বলতে ভয় পাচ্ছি, পাছে তাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য বলে তুচ্ছ করেন। মিসেস গুপ্ত, আমি ভালোবাসতে পারি নে। আমার নাকি হৃদয় বলে কিছু নেই। আমি ভক্তি করতে পারি নে। আমি জানি, আমার অন্ধ বিশ্বাস নেই। কিন্তু বুদ্ধি আমার জাগ্রত। তাই নিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারি। আপনি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।"

মালতী এতটা আশা করতেও সাহস পায় নি কখনও। দেবেশের এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে যে সাহস হয় না, না করবে যে এমন জোর কই? দেবেশ তাকে সম্রাজ্ঞী করেছে। সেই সম্রাজ্ঞীরই সুরে বলল, "চলুন, এবার ওঠা যাক।"

ট্যাক্সির জন্যে বড়ো রাস্তায় আসতে কিছুটা হাঁটতে হোলো পাশাপাশি। সেই সুযোগে মালতী বলল, "আপনি উদার। আপনি ক্ষমা করলেন। কিন্তু আহত সরোজ যখন সব কথা—হয়তো আরও কিছু বেশি—সবাইকে গিয়ে বলবে, তখন মালতী গুপ্তার নিন্দায় কান পাতা যাবে না কোথাও।"

লোকনিন্দা সম্বন্ধে দেবেশের অসীম অবজ্ঞা, তাই প্রসঙ্গটা উঠতেই সে বলল, "নিন্দা জগতে কার নেই? আমি তাই কান

পাততেই যাই নে ওদিকে। কান তো এজন্যে নয়, কান হচ্ছে বেঠোফেনের জন্যে।”

সত্যি কথা। কিন্তু মালতী পারে কই জয় করতে এই নিন্দার ভয়, উপেক্ষা করতে এই লোকাপবাদের শঙ্কা?

বিস্তৃত ময়দানের প্রসারিত মুক্তির দিকে মালতী একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। মায়া হোলো, এমন স্থান ছেড়ে আবার তার ক্ষুদ্র কক্ষের বন্দীত্বের মধ্যে ফিরে যেতে। রাস্তায় আসতেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেলে দুজনে সেইটেতে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে মালতী বলল, “আমাকে আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে না। আপনি আপনার বাড়ির কাছে নেমে পড়লে আমি ট্যাক্সিটাকে নিয়ে চলে যাব।”

দেবেশ ঠিক বুঝতে পারল না মালতীর এই নির্দেশের অর্থ। মালতী নিজেই ব্যাখ্যা করল, “মিস্টার মুখার্জি, আপনার খ্যাতি আপনার গুণগ্রাহী অসংখ্য অপরিচিতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, আর সামান্য অখ্যাতি যদি কিছু থেকেই থাকে তা শুধু জনকয়েক ঈর্ষাদগ্ধ ব্যর্থমনোরথ পরশ্রীকাতর পরিচিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিন্দা সম্বন্ধে আপনি পারেন উদাসীন হতে।”

দেবেশ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগেই মালতী আবার বলল, “কিন্তু আমার জগৎটা ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। খ্যাতি বলতে আমার কিছু নেই, যা আছে তা আত্মীয় ও পরিচিতদের মধ্যেই নিবদ্ধ। সে খ্যাতি শুধু এই যে, আমাকে নিয়ে ওরা আলোচনা করবে না। কিন্তু যদি এমন কিছু ঘটে যা নিয়ে অখ্যাতি রটনা করা সম্ভব,

তবে তার কলরবে আমার ক্ষুদ্র বিশ্ব এমন ভরে ওঠে যে, বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

"দেবেশবাবু, আমি ক্ষুদ্র, আমার জগৎ ক্ষুদ্র, আমার সম্বল সামান্য, সাহস সামান্যতর। হাতে প্রাণ নিয়ে বাইরে এসে মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসবার সৌভাগ্য দেব নিজেকে ; কিন্তু আপনাকে নিয়ে সেই ক্ষুদ্র জগতে প্রবেশ করব, এমন সাহস নেই আমার।"

দেবেশ একেবারে আচ্ছন্ন, বিহ্বল বোধ করল। শুধু ট্যাক্সির সীটের উপর অযত্নে-ফেলে-রাখা মালতীর ব্যাগটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলোতে থাকল। পরে ব্যাগটার মালিক যখন ওটাকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াল, তখন দেবেশের হাতে তার স্পর্শ লাগল। আজ আর সে অসীম ত্রস্ততায় তার হাত আগের দিনের মতো সরিয়ে নিল না। মালতীরও মনে হোলো না যে, সে একটা শীতল প্রস্তরমূর্তির উপর হাত রেখেছে মাত্র।

ব্যাগটার পরে যুক্তস্বত্ব বহাল রেখে দেবেশ মনে মনে বলল, আত্মা আছে কি না জানি নে। তাই ফাউস্টের মতো কোনো বার্টার করতে পারব না। কিন্তু, এখন, এই মৃত্যুহীন মুহূর্তে, অঙ্গীকার করছি যে, আমার তিনটে মস্তিষ্কের বিনিময়ে একটি হৃদয়ের একটুখানি কণাও গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত।

কথাটা মনে মনে বলা, কিন্তু তবু মালতী তা যেন স্পষ্ট শুনতে পেল।

পনেরো

রাত তখন কম হয় নি। পুত্রের জন্যে উদ্বিগ্ন মনের বোঝার তলায় মা অপেক্ষা করছিলেন তার প্রত্যাবর্তনের জন্যে। এমন বিলম্বটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। ট্রান্স্মিশন ডিউটি থাকলে এমন দেরি তো হয়েই থাকে। কিন্তু কই, ডিউটি ছিল বলে দেবু বলে নি তো! অনেক বার ভেবেছিলেন, টেলিফোন করবেন রেডিও স্টেশনে। শেষ পর্যন্ত করেন নি। পাছে সেখান থেকে পাল্টা প্রশ্ন আসে, বা আসে এমন উত্তর যা শুধু দুশ্চিন্তায় ইন্ধন যোগাবে। মা তাই আপন উদ্বেগ আপন অন্তরে নিবদ্ধ রেখে নিশ্চল মুহূর্তগুলি গুণছিলেন অসহ্য অধৈর্যে।

দরজার কাছে যখন দেবেশের পদধ্বনি শোনা গেল, তখন মার মন থেকে দুশ্চিন্তা অপসৃত হোলো। কিন্তু মনের কোথায় যেন রয়ে গেল অস্পষ্ট একটু খেদ। সে শুধু দেরি হবার খবর দেয় নি বলে নয়। এসেও দেবেশ বিশেষ কিছু বললে না বলে।

স্বভাবতই সে উদাসীন। এই ঔদাসীন্যকে অপরে অনেক ভুল বোঝে অবজ্ঞা বলে। কিন্তু মা জানেন তাঁর ছেলেকে। অমন কথা তাই তাঁর কদাচ মনে হয় না। কিন্তু আজ যেন দেবেশের ঔদাসীন্যকে তিনিও পারলেন না তেমন সহজভাবে নিতে। দেবেশ বেশি কথা বলে না এমনিতেই, তা নিয়ে আর

যে যাই মনে করুক, মার মনে ক্ষোভ নেই। তার নৈঃশব্দ্যে তাই তিনি বিস্মিতও হন না, আহতও হন না। কিন্তু নৈঃশব্দ্যেরও আছে প্রকারভেদ। তার অর্থ ভাষার চেয়েও স্পষ্ট হতে পারে কখনও কখনও।

দেরি হলে দেবেশ নিজেই দুঃখপ্রকাশ করে, কারণ বিবৃত করে সবিস্তারে। মার জিজ্ঞাসাও করতে হয় না কখনও। আজ সে শুধু উপরে যাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জানিয়ে গেল যে রাত্তিরে সে খাবে না। আর কিছু না। একবার জানতে পর্যন্ত চাইলে না মা খেয়েছেন কি না, অন্য কিছু জানানো তো দূরের কথা। দেবেশ উপরে নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। তার মন ছিল মালতীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। মার চিন্তার স্থান ছিল না সেখানে।

মালতীর কাহিনীবর্ণনে একটি নিঃসহায় আত্মসমর্পণের সুর ছিল যা দেবেশের হৃদয় স্পর্শ করেছিল গভীরভাবে। সেই স্পর্শে জাগ্রত হয়েছিল তার ভিতরকার সেণ্ট জর্জ। কিন্তু ড্রাগনটি কে? কোথায় সে? তাকে এত সহজে খুঁজে পাওয়া গেল না। দেবেশের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রইল শুধু দুঃখিনী মালতীর ছবি।

কিন্তু মালতীর দুঃখটা কী? নিঃসঙ্গতা? দুদিন আগেও দেবেশের সহজ সমাধান জানা ছিল এই সমস্যার। তার স্পষ্ট উত্তর ছিল অধ্যয়ন। সে নিজে ডুবে ছিল তার বইয়ের মধ্যে, তাইতে হয়েছিল তার নিজের নিঃসঙ্গতার সম্পূর্ণ নিরসন। আজ কিন্তু তার এই সহজ উত্তরটাকে কোনোক্রমেই যথেষ্ট মনে

হোলো না। কেবলই মনে হতে থাকল যে, বই দিয়ে সবখানি ফাঁক বুঝি চিরকালের জন্যে ঢাকা যায় না। আর, যে বিধি তার নিজেরই জীবনে অপর্যাপ্ত বলে আজ পরিগণিত, সে বিধান সে অপরকে দেবে কোন ভরসায়? মালতীর অসহায়তা যেন দেবেশে সংক্রামিত হোলো।

মা এতক্ষণ নীচে বসে ছিলেন। দেবেশ খাবে না শুনে তাঁর নিজের ক্ষুধাও ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছিল। ছেলের সঙ্গে তখনই উপরে আসেন নি। অভিমান করে নয়, রাগ করে তো নয়ই, আসেন নি শুধু দেবেশকে একা থাকতে দিতে।

মা ছাড়া এমন ভালো করে কেউ বুঝি তাকে বোঝেন নি কখনও। কখন দেবেশ কী চায়, কখন সে কিসে বিরক্ত বা বিব্রত হয়, সব কিছু মার জানা হয়ে যায় দেবেশের, এমন কি তাঁর নিজের, অজান্তে। পুত্রের ঔদাসীন্যের কারণ তাই স্পষ্ট না জানা থাকলেও এ কথা বুঝতে তাঁর মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় নি যে, তার বর্তমান ঔদাসীন্যের সঙ্গে যুক্ত আছে একান্ত ব্যক্তিগত কোনো চিন্তা।

সে চিন্তার অংশ নিতে মার ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। কিন্তু মা এ কথাও জানতেন যে, সংসারে অধিকাংশ জিনিসেরই অংশীকরণ অসম্ভব। অন্তত, অংশ করলেও মূল পরিমাণের কণাটুকুও হ্রাস পায় না!

সব বুঝেও মা পারলেন না আর চুপ করে থাকতে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে উপরে এসে দেখলেন, দেবেশ বিছানায় শুয়ে

আছে স্থির হয়ে। নিদ্রামগ্ন নয়, চিন্তামগ্ন। সে টেরও পায় নি মার আগমন। মা একবার চিন্তা করলেন, ঘরের আলোটা জ্বালবেন কি জ্বালবেন না—পাছে দেবেশের অস্বস্তির কারণ হয় তা। শেষে আলোটা না জ্বেলেই আর নীরব থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর এত দেরি হোলো কেন রে আজ দেবু ?"

দেবেশ কী বলবে ভেবে পেল না। এখন তার মনে হোলো যে, মাকে একেবারে খবরই দেওয়া হয় নি। কখনও-নয়ের চাইতে বিলম্বে ? এখন তাহলে বলবে কি ? সব কথা ?

দেবেশের মুখ দিয়ে কথা সরল না। মার কাছে বলতে তার লজ্জা নেই, কিন্তু, কিন্তু—মালতীর তো আপত্তি হতে পারে। তার মা তো আর মালতীরও মা নয়। আজ সন্ধ্যায় যা হয়েছে, সে তো তার একক অভিজ্ঞতা নয়। তার ইতিহাসের কপিরাইট তো তার একার নয়।

কপিরাইটের কথায় মনে পড়ল, এ বিষয়ে আইনটা কী ? যে কথা বলল আর যাকে তা বলা হোলো, এই দুজনের মধ্যে কার স্বত্ব সেই কথার উপর ? যে চিঠি লিখল আর যাকে চিঠি লেখা হোলো, এর মধ্যে কে সেই চিঠির অধিকারী ? যুক্তস্বত্ব ? ভালো কথা। কিন্তু যদি আসে বিচ্ছেদ, যদি হয় পার্টিশন স্যুট ? তবে ? আইনের এই সমস্যাটা নিয়ে দেবেশ বিপদে পড়ল।

কিন্তু একটু পরেই মনে হোলো যে, প্রশ্নটা আইনের নয় আদৌ। নীতির ? তার উত্তর তো সহজ। উভয়ের সম্মতি

না থাকলে কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না। কিন্তু মালতীর সম্মতি এখন সে পায় কোথা? এদিকে মা যে অপেক্ষা করছেন উত্তরের জন্যে।

পুত্রের নৈঃশব্দ্যে মা বিস্মিত হয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "খুব কাজ ছিল বুঝি আপিসে?"

"না তো।"

"ও, বেড়াতে গিয়েছিলি বুঝি?"

"হ্যাঁ, মা।"

দেবেশ গভীর অস্বস্তির সঙ্গে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিল যে, তার উত্তরগুলি উত্তর নয়। মার কাছ থেকে যে একটা কথা গোপন করতে হচ্ছে, সেই অব্যক্ত কথাটার অবহনীয় বোঝার ভারে দেবেশের নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এলো।

অন্যায় সে কিছু করে নি। সব কথা বলতে তার নিজের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তবু, কার অদৃশ্য হস্ত যেন তার কণ্ঠরোধ করে রেখেছে!

মা সাধারণত অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু আজ তাঁর কেন যেন সব কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। এই যে দেবেশের দেরি, এই যে তার কথা বলতে অনীহা—প্রশ্ন করা সত্বেও—এই সবগুলি সাধারণ নিয়ম থেকে এমনই ব্যতিক্রম যে, অজানা ভয়ে মায়েরও আপন রীতি থেকে ব্যতিক্রম করতে হোলো। দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে মা তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "একাই গিয়েছিলি বুঝি?"

দেবেশ তখনই উত্তর দিতে পারল না। তার সাতাশ বছরের জীবনে এই বোধ হয় প্রথম তার মাকে মনে হোলো আপন চিন্তাধারার অন্তরায় বলে। আপন প্রাইভেসির এলাকায় অনধিকারিণী বলে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে স্বতন্ত্র কারও হস্তক্ষেপ বলে। এর আগে মাকে স্বতন্ত্র বলেই মনে হয় নি কখনও। মা তো তার নিজেরই অংশ, সে নিজে তো তার মারই অংশমাত্র।

কিন্তু আজ কে যেন দাঁড়াল দুয়ের মাঝখানে!

ঘরটা অন্ধকার ছিল। তবু দেবেশ দু হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে শুয়ে ছিল। অকারণ একটা অপরাধ-বোধ তাকে নিরুত্তর করে রেখেছিল। অথচ সেই নিরুত্তরতাই যে তার অপরাধ-বোধের কারণ, তাও তার জানতে বাকি ছিল না। জুগুপ্সার অপরাধ গোপন করতেই বুঝি দেবেশ আরও সরে গিয়ে শয্যার অপর প্রান্তে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। অন্ধকার ঘরে অপেক্ষমানা মায়ের সরল জিজ্ঞাসা অপর পক্ষের নৈঃশব্দ্যের অস্পষ্টতায় অসহায়ভাবে হাত পেতে রইল। আর অপেক্ষা করতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো বন্ধুর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলি বুঝি?"

মার সর্বশেষ প্রশ্নে দেবেশ যেন নিষ্ক্রমণের একটা সংকীর্ণ পথের সন্ধান পেল। গোপনতার অন্ধকারের মধ্যে সে যেন আলোর রেখা। নির্বাত অন্ধকূপে সে যেন বায়ুর প্রবেশ। কোনো কিছু চিন্তা না করে শুধু যেন জেরার

উপর যবনিকা টানবার জন্যেই দেবেশ কালক্ষয় না করে বলল, "হ্যাঁ।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে মাতৃহৃদয় তৃপ্ত হোলো না। কিন্তু তিনি আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে দেবেশের ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে যেতে থাকলেন। দেবেশের উত্তর-দানের ধরনে একবার বুঝি মনে এলো একটু বিস্ময়, একটু অবিশ্বাসের আভাস। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে তিরস্কার করলেন পুত্রের সত্যবাদিতায় সন্দেহ করবার জন্যে। দেবেশ আর যাই করুক, দেবেশ মিথ্যা কথা কখনও বলে না, কাউকেই নয়, মাকে তো নয়ই—এ বিশ্বাস তার মার মনে দৃঢ়। মুহূর্তখণ্ডের জন্যও তা শিথিল হয়েছিল বলে তিনি ধিক্কার দিলেন নিজেকে। তখনকার মতো একেবারে বিস্মৃত হলেন আর সব কথা।

দেবেশ অন্য দিকে তাকিয়ে অতি কষ্টে মার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। পর-মুহূর্তেই তাকিয়ে দেখল, মা চলে গেছেন তার ঘর থেকে। আর অমনই তার অন্ধকার ঘরে তার অসত্য উত্তরের বিকৃত প্রতিধ্বনি যেন সহস্রটা তীক্ষ্ণ খণ্ডে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেশকে সর্ব অঙ্গে বিদ্ধ করতে থাকল।

এ আমি কী করলেম? মিথ্যা বললেম? তাও মার কাছে? মহার্ঘ পুরস্কারের জন্যেও পূর্বে যা করতে অস্বীকার করেছি, আজ তাই করলেম সেই একজনের কাছে, যার একমাত্র বিশ্বাসের আধার আমি? এবং যে আমার

একমাত্র সান্ত্বনার উৎস? মা একবারও আমার কথায় এতটুকু সন্দেহ করবেন না। উত্তর শোনা মাত্র চলে গেছেন। এ যে অন্ধজনের হাত থেকে পয়সা চুরি করা, নিদ্রিত জনকে হত্যা করা!

অশান্ত দেবেশ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল। মা এসেই শুয়ে পড়েছেন নীচের ঘরে। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করল দেবেশ। তার নিজের ঘরের মতো এ ঘরেও আলো ছিল না। কিন্তু দেবেশের সন্দেহ ছিল না যে, মা ঘুমোন নি। নিস্তব্ধ কক্ষে যে নিশ্বাস সুস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল তা নিঃসন্দেহে নিদ্রিতের নয়।

মাও টের পেলেন দেবেশের উপস্থিতি। কিন্তু কিছু বললেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

এবারে দেবেশের পালা নৈঃশব্দ্য বহন করবার।

অবশেষে দেবেশ বলল, "মা!"

মা সস্নেহে সাড়া দিলেন, "কী রে দেবু?"

দেবেশ চুপ করে রইল। কী বলবে ভেবে পেল না। মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মতো একটা অনান্তরিক লৌকিকতা করতে তার বাধল। কিন্তু ক্ষমা না চাইলে সে যে নিজেকেই ক্ষমা করতে পারবে না! আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলল, "মা, তুমি আজ আমায় কেন জিজ্ঞাসা করলে আমি কার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেম?"

অপরাধটা যেন মার!

মা বললেন, "কেন ভেবে তো তোকে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করি নে, দেবু। যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি।"

মার স্নিগ্ধ কণ্ঠে দেবেশের হৃদয় সিক্ত হোলো, শান্ত হোলো। শিশুর মতো অসহায় স্বরে বলল, "মা, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

"বোকা ছেলে। তুই বুঝি আবার এমন কিছু করতে পারিস যার জন্যে মার ক্ষমা করতে হবে!"

দেবেশের বুক থেকে বোঝা অনেকটা নেমে গেল। তবু বলল, "মা, আমাকে তুমি মিথ্যাবাদী মনে করো না, না?"

"তোকে মিথ্যাবাদী মনে করলে আমি বাঁচব কী নিয়ে দেবু? যা, শুয়ে পড়্‌গে এখন। রাত হয়েছে।"

"যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলো, মা, যে আমাকে আর তুমি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না, যার সত্য উত্তর আমি দিতে পারি নে।

মা এমন অনুরোধে বিস্মিত হলেন। কিন্তু ব্যথিত হলেন তার চেয়ে বেশি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে তাঁর মায়া হোলো। শুধু বললেন, "শুয়ে পড়্‌গে যা। রাত হয়েছে।"

দেবেশ অনেক হালকা হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু বিছানায় শুয়ে একবার এপাশ আর একবার ওপাশ ফিরে ঘুমোতে পারল না কিছুতেই। পাশে শুয়ে ছিল স্যালি। তারও চোখে ঘুম ছিল না।

নিদ্রাপ্রত্যাখ্যাত বিক্ষুব্ধ চিত্ত জর্জরিত হোলো ক্রমবর্ধমান ক্লান্তিতে। মনে মনে অসংখ্যবার ক্ষমা চাইল মার কাছে।

আর মালতীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বলল, তোমার সঙ্গে পরিচয় আকস্মিক। আমাদের দুজনের বিচরণ দু দিন পূর্বেও ছিল একেবারে বিভিন্ন কক্ষপথে। হঠাৎ কেন মিলিত হলেম জানি নে, আবার হঠাৎ কবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব তাও জানি নে। কিন্তু এই শুরু ও শেষের মাঝের সময়টায়—সে যত সংক্ষিপ্তই হোক বা যত দীর্ঘই হোক—এমন কিছু যেন আমরা না করি যার জন্যে লজ্জিত হতে হবে, যার জন্যে গোপনতার শরণ নিতে হবে, যার জন্যে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে অসত্যের কাছে। তোমার আমার বন্ধুত্বে—হ্যাঁ, বন্ধুত্ব ছাড়া আর কী?—এমন কিছু যেন প্রবেশ করতে না পারে যা সত্যের বিরোধী। প্রেম—না, প্রেম নয়; বন্ধুত্ব—সে তো জীবনবহির্ভূত ন্যায়-অন্যায়-স্বাধীন একটা বস্তু নয়; সে জীবনেরই অংশ। জীবনে যা অন্যায় বা অসত্য, বন্ধুত্ব তাকে ন্যায় বা সত্যে রূপান্তরিত করতে পারে না, কখনোই না। মালতী, এই নীতির বিরোধী আমি যেন কখনও কিছু না করি। মালতী, তুমি যেন আমায় তেমন কিছু করতে দিয়ো না। মালতী, কখনও না।

এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অসংখ্য পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও দেবেশের অনিশ্চিত দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হোলো না। মনে মনে সে ভর দিল মালতীর উপর। ভরসা না পেলেও অপরিসীম পরিতৃপ্তি লাভ করল মালতীর নামটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে।

মালতী, মালতী, মালতী!

ষোলো

মালতীর বাড়ির সামনে যখন ট্যাক্সি এসে থামল, তখনও তার একটু সময় লাগল নিজেকে এই কথাটা সম্যক উপলব্ধি করাতে যে এখানে তার নামতে হবে। নিদ্রাবিহারীর মতো ঠিক ঠিক ভাড়া চুকিয়ে দিল, ফটক খুলে ঢুকল, তারপর ঠিক ফটক বন্ধ করে নিজের ঘরের কাছে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলল। সবই ঠিক করেছে, কিন্তু যেন সজ্ঞানে নয়। স্বপ্নাবিষ্টের মতো।

দোতলার আলো তখন নিবে গেছে। চাকররা শুয়ে পড়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিদ্রাবিহারিণী নিঃশব্দপদে ঘরে ঢুকল, পাছে নিজের ঘুম ভেঙে যায়!

জামাকাপড় কিছু ছাড়ল না। অন্ধকারের মধ্যে জুতোটা খুলে সটান শুয়ে পড়ল সামনের শয্যায়। কাজটা শক্ত নয়। ঘরের যেখানে যা ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। কিছুমাত্র বদল হয় নি—জড়পদার্থের সুবিধাই এই! বদল হয়েছে শুধু মালতী। যে মালতী সেই সন্ধ্যায় ঘর থেকে দেবেশকে নিয়ে বেরিয়েছিল আর যে মালতী এখন ঘরে ফিরেছে, তাদের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। এক আরের অপরিচিতা।

কিন্তু ঘরটাও যেন বদল হয়েছে। অন্তত মালতীর তাই মনে হোলো। এক দিক থেকে সে স্বপ্নাবিষ্ট, কিন্তু অপর দিক থেকে তার সব কটা ইন্দ্রিয় যেন প্রখরভাবে জাগ্রত হয়েছে। যা ইতিপূর্বে দৃষ্টির অন্তরালে অবহেলিত রয়েছে, অকস্মাৎ সে

সব অকিঞ্চিৎকর জিনিসও যেন নব রূপ পরিগ্রহ করে দৃষ্টি দাবি করল।

শুধু দৃষ্টি জাগ্রত হয় নি। ঘ্রাণও। ঘরে শয্যার পাশে ফুলদানিতে আজ মালতী এক গুচ্ছ রজনীগন্ধার আয়োজন করেছিল বিশেষ করে দেবেশের আগমনের উপলক্ষে। আকাঙ্ক্ষিত সে অতিথি এসেছিল বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এসেছিল সরোজ। সে যেন উপদ্রব। তাই দেবেশের উপস্থিতিতে রজনী-গন্ধার কথা একবারও মনে হয় নি মালতীর। এখন এই অন্ধকার ঘরে রজনীগন্ধাগুলি যেন কথা কয়ে উঠল, সুর করে গেয়ে উঠল। ছোট ঘরখানি গানে গন্ধে ভরে উঠল।

কিন্তু শুধু রজনীগন্ধা নয়। তার গন্ধের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল আরও তীব্র একটা গন্ধ। সেটাকে সনাক্ত করতে একটু সময় লাগল মালতীর। হ্যাঁ, সিগারেটই হবে। এখন তার মনে পড়ল যে, দেবেশ তার ঘরে বসে গোটা তিনেক সিগারেট খেয়েছিল। বাহির থেকে ভেসে আসা স্নিগ্ধ রাতের হাওয়া, তার সঙ্গে রজনীগন্ধার সুরভি আর পুড়ে যাওয়া সিগারেটের গন্ধাবশেষ, সব কিছু মিলে মালতীকে আচ্ছন্ন করল। অন্য যে কোনো সময় নিকোটিন আর রজনীগন্ধার সমন্বয়টা মালতীরই কাছে উৎকট বলে মনে হোতো। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে মালতীর জীবনে কিছুই স্বাভাবিক নেই।

যা সুন্দর নয়, তাও সুন্দর ঠেকছে। সুন্দর হয়েছে সুন্দরতর।

মালতী অনেকক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে রইল, আর মনটাকে

মা-বাবা পর হলেন, শ্বশুর-শাশুরী সে আসন দাবি করলেন কর্তব্যের রুদ্রবেশে। ফল সুখের হোলো না কোনো পক্ষেই। নিঃসঙ্গিনী মেনে নিল ভাগ্যের এই পদাঘাত নিঃশব্দে। সান্ত্বনার সন্ধান করল না কলহের কুৎসিত উত্তেজনায়। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে সে, এগুলি সামান্য ক্ষতি। এহ বাহ্য। আগে চল আর।

"আগে এসে যে দেয়ালে কপাল ঠেকল, সে দেয়ালের লেখার কাহিনী কেউ জানে না। বেচারী জানায় নি কাউকে। যাকে তাকে জানানো যায় না সে কথা। জানাবার মতো লোকই মেলে নি হতভাগিনীর।"

অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল না কিছুই। কিন্তু উৎকর্ণ দেবেশ স্পষ্ট শুনতে পেল মালতীর মৃদু দীর্ঘশ্বাস। ক্ষুদ্র আলপিন পড়লে যেখানে শোনা যেত, সেখানে কি অশ্রুত থাকবে দীর্ঘ ছুরিকার মর্মভেদী নিম্নগতি?

"কিন্তু থাক্ সে কথা। অভাগিনীর জীবন থেকে সুর না হয় দূরই হোলো, ছন্দ না হয় নাই রইল, দুয়ে মিলে যে সঙ্গীত হতে পারত তাও না হয় নাই হোলো—কিন্তু কথা? দুটো কথা কইবার সাথীও কি পাবে না সে? চতুর্দিকে সবাই সদাব্যস্ত। তার জন্যে এক দণ্ড সময় নেই কারও। এদিকে তার নিজের সময় অফুরন্ত, অচলন্ত। কী করবে সে? আপনি কী করতেন ওর অবস্থায়?

"বাধা দেব না বলেছি। আপনি বললেও না।"

"ভালো। ঠিক এমনই সময় বেচারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল

এমনই আর এক বেচারীর। পুরোপুরি মিল হোলো না—না, এমন ভাগ্য সে সঙ্গে আনে নি—কিন্তু বলা যাক একে, অন্তত অংশত, লিওনাইন্ মিল। শেষ পর্যন্ত নয়, শুধু মাঝখানে একটা জায়গায় মিল। নাই মিলের চেয়ে কানা-মিল ভালো। একাকিনী তাই নিল, মনে তুলে নয়, মাথায় তুলে।”

“আচ্ছা।”—মালতী একটু থেমে বলল, “মন আর মাথায় দুস্তর দূরত্ব, তাই নয়?”

দেবেশ এ প্রশ্ন নিয়ে অনেক ভেবেছে। কিনারা পায় নি। অনিশ্চিতভাবে উত্তর দিল, “কী জানি! দূরত্ব আছে জানি, সে দূরত্ব যে দুস্তর তাও জানতে বাকি নেই। বিরোধটাকে একজন লেখক, গণতন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। সে মাথা-গুনতিতে মাথার মাত্র একটি ভোট, আর মনের আছে দুটি। এই দ্বন্দ্বে মনের জয় অবধারিত আর মাথার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।”

“ঠিক তাই। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন? আপনার বেলায় অনুপাতটা বিপরীত—দুটো মাথা আর একটা মন।”

কথাটা যে একেবারে মিথ্যা নয়, দেবেশ তা অন্তত নিজের কাছে অস্বীকার করল না। মাথার তুলনায় মনটা বোধ হয় তার সত্যিই অপেক্ষাকৃত অপরিণত। দেবেশ ভাবতে লাগল এ সম্বন্ধে, কিন্তু মালতীর কাহিনী শোনবার কৌতূহল প্রকাশ করে বলল, “আপনার গল্পে ছেদ পড়েছে কিন্তু।”

“আচ্ছা। দুই বেচারীতে দেখা হোলো। কিন্তু এ কেমন

দেখা ? আমার বান্ধবীর জীবন ভরল না, শুধু সময় ভরল। কিন্তু তার বান্ধবের শুধু সময় ভরল না, জীবনও ভরে উঠল কানায় কানায়। বাহিরের কথা—অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা যত কিছু, সব ক্ষতির বুঝি পূরণ হোলো আমার বান্ধবীর দাক্ষিণ্যে। শুধু মাত্র বাহিরের কথা হলে ক্ষতি ছিল না, বিরোধ বাধত না তা নিয়ে, কিন্তু আপত্তি এলো ঘর থেকে। সে বান্ধবের ঘরে না ছিল মন, না মান। ঘরের বাইরে সাময়িক আশ্রয় যখন মিলল, ঘর তাকে করল একঘরে।

"বান্ধবী নিজেও জানত তার আশ্রয়ের অবশ্যম্ভাবী অস্থায়িত্বের কথা, ভঙ্গুর এ আশ্রয় ভেঙে গেলে আশ্রিতের পূর্বতন আশ্রয়হীনতা যে সহস্রগুণ কঠোর হয়ে বাজবে, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল না আশ্রয়দাত্রীর। জানত সে, সে তো নয় ছাতা, যে পথিকের সঙ্গে যেতে পারবে। সে শুধু পথের পাশে পোর্টিকো, দিতে পারে একটু ছায়া, একটু ঢাকা, যে ক'টা মুহূর্ত দাঁড়বে তার তলায়। পরেই তোমার এগুতে হবে, পিছনে থাকবে পোর্টিকো, মাথার 'পরে আকাশ আর রোদ-বাদল।"

দেবেশ চুপ করে শুনছিল। ভালো লাগছিল। ছন্দসমৃদ্ধ গদ্য কবিতার আবৃত্তি যেন। একটু থেমে মালতী আবার শুরু করল।

"পথিককে পোর্টিকো স্মরণ করিয়ে দিতে পারত, সাবধান করে দিতে পারত যে, বন্দোবস্তটা আদৌ চিরস্থায়ী নয়। ভেবেও ছিল দেবে বলে। চেষ্টা করেছে বহুবার। পারে নি।

কিছুটা সঙ্কোচ, তার চেয়ে বেশি মমতা এসে বাধা দিয়েছে। বলতে গিয়ে থেমে গেছে আশ্রিতের মলিন মুখ দেখে। নিরাশ্রয় তো বেচারী হবেই একটু পরে, আগে থেকে ওকে নিরাশও কি করতে হবে তাই বলে? সঙ্গীহীনার সাধ্য ছিল সামান্যই ভালো করবার বা মন্দ করবার। আনন্দও দিতে পারল না কাউকে। আর একজনের এমনই ভাগ্যদোষ যে, সে এসে ঠাঁই নিল কিনা এই ভাগহীনারই কাছে! আপনি বলুন, তাকে তাড়িয়ে দিলেই কি নারীধর্ম রক্ষিত হোতো? মায়া, মমতা, দয়া, করুণা, এগুলি কি এমনই অক্ষমণীয় অপরাধ?"

মালতীর কণ্ঠে ছিল তীব্র ক্ষোভ। তার প্রশ্নেরই মধ্যে নিহিত ছিল তার আপন তিক্ত উত্তর। দেবেশ কিছু বলল না। সমর্থনেও না, প্রতিবাদেও নয়। মালতীর বিবৃত কাহিনীতে বিবরণ ছিল অসম্পূর্ণ, তাই থেকে দেবেশ ঠিক বুঝতে পারছিল না—কী হয়েছে এবং কেন, যদিও বর্ণনার সুরে নির্ব্যক্তিক নিরাসক্তি এতই অল্প ছিল যে, কাহিনীর নায়িকার আসল পরিচয় অনুমান করা শক্ত ছিল না। মালতী একটু থেমে আবার আগের চেয়েও করুণ সুরে তার অসমাপ্ত কাহিনীর আবৃত্তি শুরু করল।

"অথচ এই জন্যেই, এই মায়া-মমতার জন্যেই আমার বান্ধবীকে কী চরম মূল্য দিতে হোলো! আরও যে কত দিতে হবে, কে জানে! প্রথম আঘাত এলো বান্ধবের বঞ্চিত অন্তঃপুর থেকে। অশিক্ষিতা সে অনাদৃতার অভিমান যে কুশ্রী কদর্যতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা অগ্রাহ্য করা যদিবা সম্ভব হোলো,

সমস্ত ব্যাপারটার সেইখানেই সমাপ্তি ঘটানো ততটা সহজ হোলো না। তারও কারণ, যতটা দম্ভ, তার চেয়ে বেশি করুণা।

"অন্তঃপুরের অন্তর্দাহ এই নিয়ে নয় যে, যা তার ছিল তা ছিনিয়ে নিয়েছে আর কেউ ; যা তার ছিলই না, কখনই না, তাই যে অন্য একজনের কাছে গেছে, ব্যর্থ বিবাহের পুঞ্জীভূত আবর্জনা থেকে নিক্ষিপ্ত একজন যে অন্যত্র আশ্রয় লাভ করেছে, এইটেই হোলো অসহ্য। হীনতা হলেও এতে বেদনা আছে। সহানুভূতির যোগ্য না হলেও একে উপেক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু নিরাশ্রয় পলাতক যেখানে এসে স্থান নিয়েছে, আপনিই বলুন, সেখান থেকে বিতাড়িত হলেই কি সে বিধিনির্ধারিত বাহুপাশে ফিরে যেত ? আর ফিরে গেলেও কি লাভ হোতো কোনো পক্ষের ? না, ফিরিয়ে-দেওয়াই হোতো বেচারীর প্রতি সুবিচার ?"

পূর্বের প্রশ্নগুলির মতো এরও কোনো উত্তর দিল না দেবেশ। কাহিনীর তিনটি ভুজের অন্তত অস্পষ্ট একটা সন্ধান সে এতক্ষণে পেয়েছে, এবং তার নিজের জীবনের সঙ্গে এর যে একটা অতি ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে তাও তার দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু মন্তব্য করার কোনো প্রয়োজন দেখল না। মালতী অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "কী বলুন ?"

"যদি অভয় দেন যে আপনার বর্ণিত কাহিনী কাহিনীই, কারও ব্যক্তিগত ইতিহাস নয়, তা হলে দু-একটা অবান্তর মন্তব্য নিবেদন করতে পারি।"

"সে তো আগেই বলেছি।"

"প্রথমেই মনে হচ্ছে যে, আপনি যাকে বঞ্চিত অন্তঃপুর বললেন, তার উপর ঈষৎ অন্যায় করেছেন আপনার বান্ধবী।" —এই কথা বলবার সময় একবার বুঝি বিস্মৃতপ্রায় বাণীর কথা মনে হোলো দেবেশের।

মালতী সংক্ষেপে দেবেশকে বাধা দিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলেম না, কিন্তু ওর কথা থাক্। আর আপনার কী মনে হয়েছে, বলুন ?"

দেবেশ তার মন্তব্যগুলি এক-দুই-তিন—এই রকম নম্বর দিয়ে সাজিয়ে ভেবেছিল। এই তার অভ্যাস, এবং বলতেও যাচ্ছিল সেই ধারা অনুসারেই। মালতীর মতভেদের নির্ভীক প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হলেও সেই ধারা ব্যাহত হোলো না। সে বলল, "দ্বিতীয়, যাকে এতবার আপনি বেচারী বলে কিঞ্চিৎ করুণাভরে বর্ণনা করলেন, সে যদি সত্যি শুধুমাত্র করুণারই পাত্র হয়ে থাকে, তা হলে তার যোগ্যস্থান বোধ করি, আপনি যাকে বললেন 'বিধিনির্ধারিত বাহুপাশ'—সেইখানেই।"

"সেখানে স্থান হলে কি সে পথে বেরিয়ে পোর্টিকোয় আশ্রয় গ্রহণ করত ?"

"করা বিচিত্র নয়। অপর পক্ষে স্থানচ্যুতি ব্যাপারটাই বহুলাংশে কল্পিত হতে পারে। আমি জানি নে। কিন্তু আমাকে অতি মাত্রায় সংরক্ষণশীল বা আর যাই কিছু মনে করুন না কেন, আমি আপনার বেচারীর অবিমিশ্র প্রশংসা করতে অক্ষম।"

"প্রশংসা চাই নি। নিন্দা যে করেন নি তাই বেচারীর

ভাগ্য। কিন্তু অসহায় বলে একটু সহানুভূতিও কি পেতে পারে না বেচারী?"

"অসহায়ের কথায় মনে পড়ল, অনুমতি দেন তো আপনার গল্পের মধ্যে আর একটা ছোট গল্প বলতে পারি।"

মালতী গল্প বলে নি। নিজের জ্বলন্ত সমস্যাকে গল্পের ছদ্মবেশ দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু এখনও বলতে পারল না সে কথা। উৎসাহহীনতা সত্ত্বেও বলল, "বলুন।"

এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল স্পষ্টতই ব্যক্তিগত কথা নিয়ে। দেবেশের কথায় তাই জড়তা ছিল। অন্য কথায় আসতে পেরে স্বচ্ছন্দে শুরু করল, "আপনার এই অসহায় অনুকম্পা-ভিক্ষুরা হচ্ছে সিণ্ডেরেলার পুরুষ-সংস্করণ। না, ঠিক সিণ্ডেরেলা নয়, তার চেয়েও নিকট হচ্ছে ফরাসী নাটকের পিয়েরো। সত্যিকার বেচারী! ডন জুয়ানের ঠিক উল্টো আর কি। অচঞ্চল কিন্তু সদাব্যর্থ প্রেমিক। বিধাতা একে তৈরি করেছেন শুধুমাত্র ব্যর্থতারই জন্যে, ব্যর্থতায়ই যেন এর সার্থকতা। এর একমাত্র পুরস্কার অনুকম্পার অশ্রু এবং এই পুরস্কার সে যুগে যুগে অবিচ্ছিন্ন ধারায় লাভ করে তুষ্ট ছিল।

"তারপর রেস্টরেশন প্যারিসের অভিনেতা দেব্যুরো প্রাবাদিক পিয়েরোর এক নতুন ও বিভিন্ন রূপ দিতে চাইলেন। তাঁর পিয়েরো প্রেমিক, কিন্তু ব্যর্থপ্রেমিক নয়। ঠিক যবনিকাপতনের পূর্বে এই নব্য পিয়েরোর গলায় মালা পরাতেন দেব্যুরো। এই পিয়েরো অভিনবত্বের গুণে, এবং দেব্যুরোর অভিনয়ের গুণে, কিছু দিনের জন্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল

কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। পুরানো পিয়েরো পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে, আবার সে দর্শকের অনুকম্পা লাভ করে আপন আসল রূপ ফিরে পেয়েছে। পিয়েরোর সৃষ্টিই পরাজয়ের জন্যে। দেব্যুরো কিছু করতে পারে নি।"

"দেবুর দেখছি কিছু করবার ইচ্ছাই নেই।"—মালতী সশ্লেষে ও সহাস্যে বক্তৃতাটার সমাপ্তি ঘটাল।

দেবেশের আলোচনায় যে হৃদয়হীন লঘুতার আভাস ছিল, মালতীর তা ভালো লাগল না। নাটকের কল্পিত চরিত্র আর বাস্তবে' বস্ত মানুষ কি এক ? এ দুয়ের কি কোনো প্রভেদ নেই এই লোকটার কাছে ? আর একটু আগে মালতী বলেছিল, এই লোকটার দুটো মাথা আর একটা মন। এখন মনে হোলো, সেটাও বোধ হয় ঠিক নয়। তিনটেই বোধ হয় মাথা, মন বলে বোধ হয় কোনো বালাই নেই এর।

মালতী গভীর নৈরাশ্যের সুরে আস্তে আস্তে বলল, "অদ্ভুত লোক আপনি! সবাই দেখেছি সাহিত্যের বিচার করে জীবনের ফিতে নিয়ে। আর আপনি দেখছি জীবনকে মাপেন সাহিত্যের মাপকাঠিতে।"

কথাটার সত্যতা দেবেশ নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারল না। চুপ করে রইল। একটু পরে পালাবার পথ পেল পাল্টা প্রশ্নে, "কিন্তু আমরা তো কাহিনীই আলোচনা করছিলেম, তাই নয় ?"

মালতী গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলল, "কাহিনীই বটে।"

অর্থাৎ কাহিনী নয় ? অর্থাৎ সত্য ? অর্থাৎ দর্শকের

মনোরঞ্জনের জন্যে বানানো সুখ-দুঃখের রঙমাখা অভিনয় নয়? অর্থাৎ এখানে একজনের হাতে এবং অপরজনের বক্ষে যে লাল তরল জ্বলজ্বল করছে, তা আলতা নয়? রক্ত? দেবেশের কাছে সমস্ত সমস্যাটার চেহারা যেন নিমেষে বদলে গেল। গল্পটা যে একেবারে গল্প নয় এমন সন্দেহ হয়েছিল আগেও। কিন্তু মালতীর স্বীকৃতিতে সন্দেহ উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে দেবেশকে যেন প্রবলভাবে আঘাত করল। ব্যথা নিয়ে পরিহাস করার জন্যে গভীরভাবে দুঃখিত হোলো।

তবু ভালো যে মালতীর সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলে নি। একটু আগেও তো সে ছিল জ্যামিতিক একটা ত্রিকোণের তৃতীয় ভুজ মাত্র। এখন দেবেশ তার পার্শ্ববর্তিনীর দীর্ঘ ছায়ার দিকে ভয়ে ভয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। ছায়াটাকে মনে হোলো কোন অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতার উদ্দেশ্যে উত্থিত মালতীর বাদী দুটি বাহু বলে।

অনেক ইতস্তত করে অনুতপ্ত কণ্ঠে দেবেশ বললে, "ক্ষমা করবেন। আপনার বান্ধবী ও তাঁর বান্ধবকে নিয়ে পরিহাস করবার কোনো দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। যদি কোনো ব্যথা দিয়ে থাকি, তা একান্তই অনভিপ্রেত জেনে ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা চাইবার কিছু নেই দেবেশবাবু। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছিলেম যে, বড়ো দুঃখ ছোটর উপর পড়লেই ছোট হয়ে যায় না, বড়োই থাকে। বরং সে ছোট বলেই দুঃখটা বোধ হয় আরও বড়ো হয়ে বাজে।"

পরিতপ্ত দেবেশ আর কিছু বলবে না স্থির করেছিল; তাই চুপ করে রইল। নির্ব্যক্তিক স্তর থেকে যে আলোচনা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে এসেছিল, তাতে যোগ দিতে আর তার সাহস ছিল না।

মালতী দেবেশের নীরবতায় অধৈর্য হয়ে বলল, "বলুন দেবেশবাবু। আপনি যা বলেন তা কঠোর। কিন্তু যখন কিছু না বলে শুধু ভাবেন, তখন ভয় হয়, আরও কঠোরতম কিছু ভাবছেন বোধ হয়।"

কঠোরতার উল্লেখটা দেবেশের কানে করুণ আবেদনের মত শোনাল। প্রায় সিক্ত কণ্ঠে মৃদু স্বরে বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি কঠোর নই আদৌ, তবু যা বলি সে যদি কঠোর শোনায়, সে শুধু আমার প্রকাশেরই দৈন্য।"

মালতীর ভালো লাগল কথাটা। এবারে যেন দেবেশকে কিছুটা অন্ততঃ স্বাভাবিক অনুভূতিশীল মানুষ বলে মনে হোলো।

একটু পরে দেবেশই আবার বলল, "তা ছাড়া কী জানেন, অনেক সময় পরবর্তী কালে বৃহত্তর কঠোরতা এড়াবার জন্যেই বর্তমানে মৃদু কঠোরতার প্রয়োজন হতে পারে।"

দেবেশের এই উক্তিতে সরোজের প্রতি মালতীর বর্তমান মনোভাবের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। তাই সে খুশি হোলো, কিন্তু চুপ করে রইল। জানত যে দেবেশ নিজেই বলবে। বললও।

"একটু আগে আপনি দুঃখ সম্বন্ধে যা বলছিলেন, তাও বোধ হয় পুরোপুরি ঠিক নয়। দুঃখ দুঃখই, তা সে যারই হোক। কিন্তু তার আঘাতের প্রবলতায় অসীম তারতম্য ঘটে

পাত্রভেদে। ক্ষুদ্র যে, তার দুঃখও ক্ষুদ্র, কেন-না বৃহৎ দুঃখ, তার চেয়ে বলি মহৎ দুঃখ, ধরবার মতো কল্পনাই তার নেই, অনুভূতিও নেই। এই জন্যেই দেখবেন, বিশ্ব-সাহিত্যের প্রত্যেক ট্রাজিডিতে নায়ক হচ্ছে মহদ্‌গুণবিশিষ্ট। সাধারণ লোক নয়। বস্‌ওয়েল কার উপমা যেন ধার করে বলেছেন যে পূর্ণ কিন্তু ভিন্নাকার দুটো বোতলের ধারণক্ষমতা যেমন বিভিন্ন, মানুষের বেলায়ও তাই।

"সাধারণের সুখও যেমন স্থূল দুঃখও তেমনিই স্থূল; কোনোটাই মহৎ নয়। একটুকু ছোঁয়ায় বা একটুকু কথা শুনে মনে মনে ফাল্গুনী রচনা করতে যেমন অসাধারণ কল্পনার প্রয়োজন, তেমনই বেদনা আহরণ করতেও চাই অনুরূপ গভীর অনুভূতিশীলতা। তাই কোনো কোনো সময় যাকে অশান্তির অশান্ত তরঙ্গ বলে ভ্রম হয়, তখন অনুকম্পার আতিশয্যে তাতে হাত দিলে জলের আলোড়নটা বাড়ে, কমে না। হস্তসম্বরণ করলে অল্পকালের মধ্যেই হয়তো সে জল তার আপন সমতল ফিরে পাবে। জলের ধর্মই তাই, অধিকাংশ মানুষেরও।"

এখানে মালতী বাধা না দিলে দেবেশের বক্তৃতা আরও কতক্ষণ চলত কে জানে। মালতী বলল, "হয়তো আপনি যা বলেছেন তাই ঠিক। কিন্তু, কিন্তু—।" মালতী একটু থেমে, প্রায় মনে মনে, বলল, "কিন্তু কারও উপর কঠোর হতে গিয়ে দেখি সবচেয়ে বেশি কঠোর হতে হয় নিজের উপর।"

দেবেশ তৎক্ষণাৎ বলল, "কঠোর হবার অধিকার তো আছে একমাত্র এমন লোকেরই।"

অল্পক্ষণ আগে দেবেশ যে ট্রাজিক মহদ্‌গুণের উল্লেখ করেছিল, মালতীর উক্তিতে সে যেন সেই এপিক গুণেরই অস্পষ্ট একটু আভাস পেল। মনে মনে বলল, ইনি সামান্যা নন, ইনি সামান্যা নন।

মালতী ভাবছিল, অধিকার হয়তো আছে। কিন্তু পারে কই কঠোর হতে? শেষ পর্যন্ত চরম কঠোরতাই করা হয়, অকর্মকভাবে, যেমন আজ হোলো সরোজের বেলায়। কিন্তু সময় থাকতে হয়ে ওঠে না কিছুতেই। অবশেষে নিজের দুঃখও বাড়ে বহুগুণ, অপরেরও। নিজেরটা না হয় নীরবে সহ্য করা গেল, কিন্তু অপরে তা মেনে নেবে কেন? তারপরেই শুরু হয় দোষারোপ। বন্ধু অ-বন্ধু হয় না, হয় বৈরী।

দীর্ঘকালের পারস্পরিক নীরবতার পরে মালতী বলল, "কিন্তু কঠোর হলে সেখানেই যে সব কিছুর সমাপ্তি ঘটবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা তো নেই।"

"নিশ্চয়তা নেই। সম্ভাবনা আছে।"

হবে। হয়তো সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মালতীর ধারণা, তার বেলায় সকল সম্ভাবনা কী করে যেন অসম্ভব হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, যা হওয়া একান্তই স্বাভাবিক তাও যেন ঘটে ওঠে না, কেবলমাত্র সে ঘটনা মালতীর ভাগ্যের অনুকূল বলেই। দেবেশের ভবিষ্যদ্বাণীতে তাই মালতী ভরসা পেল না। নিরুৎসাহ নীরবতায় বিষণ্ণ সন্ধ্যাকে অগ্রসর হতে দিল তামসী রাত্রির অভিমুখে।

দেবেশ নির্বোধ নয়। সে জানত যে, মালতীর বর্ণিত

কাহিনী আদৌ কল্পিত নয়। কিন্তু তবু দেবেশ পারে না তার সংকোচকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে। পরস্পরের সম্বন্ধে কৌতূহল পারে না পরস্পরের মধ্যে উত্তুঙ্গ প্রাচীরকে উল্লঙ্ঘন করতে। দুর্দম জিজ্ঞাসা পারে না দুস্তর সংকোচকে অতিক্রম করতে। আগেকার মতো নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতার সুরে দেবেশ বলল, "সংসারে ধ্রুব বলে খুব বেশি জিনিষ নেই। তাই অধিকাংশ সময়েই নির্ভর করতে হয় ল অব প্রবেবীলিটির উপর।"

প্রবেবীলিটি, না, ছাই? মালতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তার কাহিনীর সত্যতা যে দেবেশের কাছে গোপন ছিল না, তাতে মালতীর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবু যে দেবেশ এমনভাবে কাহিনীটার আলোচনা করে চলছিল, নানা তার্কিক আইনকানুনের নজির টেনে—যেন মঙ্গল গ্রহের কারও ব্যাপার এটা, পার্শ্ববর্তিনী মালতীর নয়, এতে মালতী নিতান্ত নিরাশ হোলো।

না কি, মালতীর ঘটনা হলেও দেবেশের কিছু এসে যায় না? কাছে থেকে এমন দূর রচনা করা কেন? ব্যক্তিকে কেন এমন নিক্তির ওজন করা, যেন তর্কের বিষয়বস্তু ব্যতীত এর অন্য অস্তিত্ব নেই? দেবেশ আগাগোড়া এমনভাবে কথা বলছিল, যেন মালতী মালতী নয়, X, সরোজ সরোজ নয়, Y, এমন কি দেবেশও দেবেশ নয়, না, Z নয়—যেন J. দেবেশ মুখার্জি J., একটা পরচুলা হলেই যেন চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়।

এলোমেলোভাবে নানা কথা নিজের মনের মধ্যে ওলট-

পালট করে ভেবে মালতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, "আর হু'জনের না হয় বিহিত হোলো। কিন্তু আমার কথা কিছু বললেন না তো ?"

আর উপায় নেই। তর্ক তার মুখোশ ফেলে দিয়েছে। স্তব্ধ দেবেশ সময় নেবার জন্যেই তার পকেটে সিগারেটের সন্ধান করতে থাকল। মালতীর প্রশ্নের সঙ্গত উত্তরের চেয়ে সেটা সহজলভ্য হতে বাধ্য।

প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেই মালতীর নিজেরও সংকোচের সীমা রইল না। দেবেশ কী ভাবছে কে জানে! কিন্তু জ্যামুক্ত শর নিয়ে অনুশোচনা করে লাভ নেই। আর এইটে এমন স্পষ্ট ক'রে কোনো না কোনো সময় কেউ না বললে তো শুধু দার্শনিক তর্কের ধূম উদ্‌গীর্ণ হোতো অনন্তকাল ধরে। শুধু কথার পরে কথা জমত। তা হলে এই কাহিনীর অবতারণাই বা করা কেন ? সত্যি কথা। মানল মালতী। তবু সংকোচ যে হয়, সেটাও যে সমান সত্য। মালতীও তার ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকল। কিছু পাবে এই আশা করে নয়, শুধু খোঁজবারই জন্য।

মালতী মনে মনে বলল, ধরা দিয়েছি, এবারও কি ধরা দেবে না ? সব দিয়েছি, এবারও কি কিছু পাব না ?

দেবেশ সিগারেট ও দেশলাই নিয়ে বসে ছিল। ধরায় নি। বিজলী শুধু চমক :আভা হানে, নিবিড়তর তিমির চোখে আনে। ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার। দেশলাইয়ের আগুনও। আর বাড়ায় লজ্জা।

অনেক ভেবে-চিন্তে দেবেশ বলল, "আপনি নারীধর্মের প্রশ্ন তুলেছিলেন একটু আগে। সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে অক্ষম। ওটা শরৎবাবুর রাজ্য, ওখানে আমার প্রবেশাধিকার নেই। মানবধর্ম থেকে স্বতন্ত্র নারীধর্ম বলে কিছু আছে কি না, বা থাকা উচিত কি না, তাও জানিনে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবার যোগ্যতাও নেই আমার। তবে আপনার বান্ধবী—"

"আর তো বান্ধবীর প্রয়োজন নেই, সোজাসুজি বলুন।"

"বেশ। আপনি যা করেছেন, তা ন্যায়ের বিচারে ভালো কি মন্দ তার বিচারের ভার আমার উপর নেই। আপনারও উপর নেই। কিন্তু তার ফল যে শুভ হয় নি, সে তো প্রত্যক্ষ।"

"অন্তত অংশত যে শুভ হয় নি, সে তো স্বীকার করতেই হবে।"

"অংশগুলি অপ্রধান নয়, মিসেস গুপ্ত, বিশেষ করে মানুষের জীবনে। জীবনের সমগ্রতাটা এমনই একটা ব্যাপক ব্যাপার যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, লেখকরা পর্যন্ত আজকাল তাকে পুরোপুরি দেখতে পারবার আশা পরিহার করে স্লাইস্ অব্ লাইফ্ নিয়ে তুষ্ট রয়েছেন। সেই আংশিক বিচারে আপনার এই বন্ধুত্বটি কোনো পক্ষেরই সুখের কারণ হয়নি।"

মালতী আবার বাধা দিয়ে বলল, "সর্বাংশে হয়নি। কিন্তু প্রারম্ভে সরোজ সঙ্গিনী পেয়েছে, ফিরে পেয়েছে আত্ম-

বিশ্বাস। তার স্ত্রীর কথা তুলে কাজ নেই। তার লাভও হয়নি, ক্ষতিও হয়নি। আর আমার? আমার নিঃসঙ্গতার অন্তত আংশিক নিরসন হয়েছিল বইকি।”

বর্তমান বিতৃষ্ণাও মালতীকে অন্ধ করেনি সরোজের ইদানীন্তন সাথীত্বের প্রতি। মালতী কৃতঘ্না নয়।

দেবেশ তৎক্ষণাৎ বলল, “ঠিক কথা। কিন্তু এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে, সমাধানটা কী মারাত্মক রকম স্বল্পায়ু। তার কারণ, এ সম্বন্ধটার ভিত্তিই যে একেবারে অস্থায়ী! বিক্ষিপ্ত দু'জন নরনারী সাময়িক সুবিধার জন্যে যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করল, তার পিছনে না রইল অচ্ছেদ্য কোনো অনুভূতির বন্ধন, না কোনো সামাজিক অনুশাসনের দৃঢ় শৃঙ্খল! এর অকালমৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী।”

সত্যি। এত স্পষ্ট, অথচ সময় থাকতে এসবের কিছুই মনে হয়নি। সময় পেরিয়ে না গেলে বুঝি এই বিশ্বের কোনো কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

মালতী অসহায় অনুনয়ের স্বরে বলল, “আচ্ছা, এখন যে কঠোর হব, তাতে অন্যায় কি বাড়বে না।”

“কার প্রতি অন্যায়? সরোজের স্ত্রীর প্রতি? নিশ্চয়ই নয়, বরং উলটো। সরোজের প্রতি? ও শিশু নয়! সে জানত, সে কী করছে এবং তার জন্যে মূল্য দিতে যদি সে প্রস্তুত না থেকে থাকে, তা হলে তাকে বাঁচাবে কে?”

হঠাৎ দেবেশের স্বরে অদ্ভুত পরিবর্তন এলো। সে

স্বরে সংসারোধ্বর্ বিচারকের অবাস্তবতা নেই। তাতে যেন পাওয়া যায় অস্পষ্টভাবে অন্তরঙ্গ মৃত্তিকার স্পর্শ। সেই সুরে দেবেশ ধীরে ধীরে বলল, "কিন্তু আমি এখন ওদের কথা ভাবছিনে, মিসেস গুপ্ত। আমি ভাবছি আপনার কথা। মানুষের ক্ষমতা অত্যন্ত পরিমিত; ভালো করবারও, মন্দ করবারও। সেই সামান্য সাধ্যটুকু সাধারণত কেবলমাত্র নিজেরই উপর প্রযোজ্য। তাই যেটুকু আমরা ভালো করি, তার বেশির ভাগই নিজের। যা অন্যায় করি, তাও অন্যের প্রতি নয়, নিজের প্রতি। নিজের কথা ভাবুন।"

মালতী গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে তার সমর্পণ সম্পূর্ণ করল, বলল, "আমি আর ভাবতে পারি নে! আপনি বলে দিন।"

"বলেছি তো। সরোজ সরল ব্যক্তি। তাকে তার সমতল খুঁজে পেতে দিন। জলের মতো।"

"সামাজিক আইনকানুনগুলি একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়। সাধারণের জন্যে তাদের সার্থকতা অপরিসীম। সরোজের পক্ষে তাই যূথভ্রষ্ট হওয়া মানেই ভ্রষ্ট হওয়া, নিজেকে হারিয়ে ফেলা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেশরী পারে নির্ভয়ে বিচরণ করতে, মেষের পক্ষে সে দুঃসাহস করতে যাওয়া বৃথা। সরোজ সামান্য ব্যক্তি। আপনি ওকে অসামান্যের সম্মান দিলেই তো ও অসামান্য হয়ে উঠবে না।"

"সরোজ না হয় গেল, যদিও এসব সত্ত্বেও ওর জন্যে অনুকম্পা হয়।"

"তাতে আপনার সহৃদয়তাই প্রমাণিত হয়, সরোজের অনুকম্পাযোগ্যতা নয়।"

"কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনি কী ভাবছেন তাই ভেবে ভয় পাচ্ছি।"

"আমি বলতে ভয় পাচ্ছি, পাছে তাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য বলে তুচ্ছ করেন। মিসেস গুপ্ত, আমি ভালোবাসতে পারি নে। আমার নাকি হৃদয় বলে কিছু নেই। আমি ভক্তি করতে পারি নে। আমি জানি, আমার অন্ধ বিশ্বাস নেই। কিন্তু বুদ্ধি আমার জাগ্রত। তাই নিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারি। আপনি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।"

মালতী এতটা আশা করতেও সাহস পায় নি কখনও। দেবেশের এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে যে সাহস হয় না, না করবে যে এমন জোর কই? দেবেশ তাকে সম্রাজ্ঞী করেছে। সেই সম্রাজ্ঞীরই স্বরে বলল, "চলুন, এবার ওঠা যাক।"

ট্যাক্সির জন্যে বড়ো রাস্তায় আসতে কিছুটা হাঁটতে হোলো পাশাপাশি। সেই সুযোগে মালতী বলল, "আপনি উদার। আপনি ক্ষমা করলেন। কিন্তু আহত সরোজ যখন সব কথা—হয়তো আরও কিছু বেশি—সবাইকে গিয়ে বলবে, তখন মালতী গুপ্তার নিন্দায় কান পাতা যাবে না কোথাও।"

লোকনিন্দা সম্বন্ধে দেবেশের অসীম অবজ্ঞা, তাই প্রসঙ্গটা উঠতেই সে বলল, "নিন্দা জগতে কার নেই? আমি তাই কান

পাততেই যাই নে ওদিকে। কান তো এজন্যে নয়, কান হচ্ছে বেঠোফেনের জন্যে।”

সত্যি কথা। কিন্তু মালতী পারে কই জয় করতে এই নিন্দার ভয়, উপেক্ষা করতে এই লোকাপবাদের শঙ্কা?

বিস্তৃত ময়দানের প্রসারিত মুক্তির দিকে মালতী একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। মায়া হোলো, এমন স্থান ছেড়ে আবার তার ক্ষুদ্র কক্ষের বন্দীত্বের মধ্যে ফিরে যেতে। রাস্তায় আসতেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেলে দুজনে সেইটেতে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে মালতী বলল, “আমাকে আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে না। আপনি আপনার বাড়ির কাছে নেমে পড়লে আমি ট্যাক্সিটাকে নিয়ে চলে যাব।”

দেবেশ ঠিক বুঝতে পারল না মালতীর এই নির্দেশের অর্থ। মালতী নিজেই ব্যাখ্যা করল, “মিস্টার মুখার্জি, আপনার খ্যাতি আপনার গুণগ্রাহী অসংখ্য অপরিচিতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, আর সামান্য অখ্যাতি যদি কিছু থেকেই থাকে তা শুধু জনকয়েক ঈর্ষাদগ্ধ ব্যর্থমনোরথ পরশ্রীকাতর পরিচিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিন্দা সম্বন্ধে আপনি পারেন উদাসীন হতে।”

দেবেশ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগেই মালতী আবার বলল, “কিন্তু আমার জগৎটা ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। খ্যাতি বলতে আমার কিছু নেই, যা আছে তা আত্মীয় ও পরিচিতদের মধ্যেই নিবদ্ধ। সে খ্যাতি শুধু এই যে, আমাকে নিয়ে ওরা আলোচনা করবে না। কিন্তু যদি এমন কিছু ঘটে যা নিয়ে অখ্যাতি রটনা করা সম্ভব,

তবে তার কলরবে আমার ক্ষুদ্র বিশ্ব এমন ভরে ওঠে যে, বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

"দেবেশবাবু, আমি ক্ষুদ্র, আমার জগৎ ক্ষুদ্র, আমার সম্বল সামান্য, সাহস সামান্যতর। হাতে প্রাণ নিয়ে বাইরে এসে মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসবার সৌভাগ্য দেব নিজেকে; কিন্তু আপনাকে নিয়ে সেই ক্ষুদ্র জগতে প্রবেশ করব, এমন সাহস নেই আমার।"

দেবেশ একেবারে আচ্ছন্ন, বিহ্বল বোধ করল। শুধু ট্যাক্সির সীটের উপর অযত্নে-ফেলে-রাখা মালতীর ব্যাগটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলোতে থাকল। পরে ব্যাগটার মালিক যখন ওটাকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াল, তখন দেবেশের হাতে তার স্পর্শ লাগল। আজ আর সে অসীম ত্রস্ততায় তার হাত আগের দিনের মতো সরিয়ে নিল না। মালতীরও মনে হোলো না যে, সে একটা শীতল প্রস্তরমূর্তির উপর হাত রেখেছে মাত্র।

ব্যাগটার পরে যুক্তস্বত্ব বহাল রেখে দেবেশ মনে মনে বলল, আত্মা আছে কি না জানি নে। তাই ফাউস্টের মতো কোনো বার্টার করতে পারব না। কিন্তু, এখন, এই মৃত্যুহীন মুহূর্তে, অঙ্গীকার করছি যে, আমার তিনটে মস্তিষ্কের বিনিময়ে একটি হৃদয়ের একটুখানি কণাও গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত।

কথাটা মনে মনে বলা, কিন্তু তবু মালতী তা যেন স্পষ্ট শুনতে পেল।

পনেরো

রাত তখন কম হয় নি। পুত্রের জন্যে উদ্বিগ্ন মনের বোঝার তলায় মা অপেক্ষা করছিলেন তার প্রত্যাবর্তনের জন্যে। এমন বিলম্বটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। ট্রান্স্‌-মিশন ডিউটি থাকলে এমন দেরি তো হয়েই থাকে। কিন্তু কই, ডিউটি ছিল বলে দেবু বলে নি তো! অনেক বার ভেবেছিলেন, টেলিফোন করবেন রেডিও স্টেশনে। শেষ পর্যন্ত করেন নি। পাছে সেখান থেকে পাল্টা প্রশ্ন আসে, বা আসে এমন উত্তর যা শুধু দুশ্চিন্তায় ইন্ধন যোগাবে। মা তাই আপন উদ্বেগ আপন অন্তরে নিবদ্ধ রেখে নিশ্চল মুহূর্তগুলি গুণছিলেন অসহ্য অধৈর্যে।

দরজার কাছে যখন দেবেশের পদধ্বনি শোনা গেল, তখন মার মন থেকে দুশ্চিন্তা অপসৃত হোলো। কিন্তু মনের কোথায় যেন রয়ে গেল অস্পষ্ট একটু খেদ। সে শুধু দেরি হবার খবর দেয় নি বলে নয়। এসেও দেবেশ বিশেষ কিছু বললে না বলে।

স্বভাবতই সে উদাসীন। এই ঔদাসীন্যকে অপরে অনেক ভুল বোঝে অবজ্ঞা বলে। কিন্তু মা জানেন তাঁর ছেলেকে। অমন কথা তাই তাঁর কদাচ মনে হয় না। কিন্তু আজ যেন দেবেশের ঔদাসীন্যকে তিনিও পারলেন না তেমন সহজভাবে নিতে। দেবেশ বেশি কথা বলে না এমনিতেই, তা নিয়ে আর

যে যাই মনে করুক, মার মনে ক্ষোভ নেই। তার নৈঃশব্দ্যে তাই তিনি বিস্মিতও হন না, আহতও হন না। কিন্তু নৈঃশব্দ্যেরও আছে প্রকারভেদ। তার অর্থ ভাষার চেয়েও স্পষ্ট হতে পারে কখনও কখনও।

দেরি হলে দেবেশ নিজেই দুঃখপ্রকাশ করে, কারণ বিবৃত করে সবিস্তারে। মার জিজ্ঞাসাও করতে হয় না কখনও। আজ সে শুধু উপরে যাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জানিয়ে গেল যে রাত্তিরে সে খাবে না। আর কিছু না। একবার জানতে পর্যন্ত চাইলে না মা খেয়েছেন কি না, অন্য কিছু জানানো তো দূরের কথা। দেবেশ উপরে নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। তার মন ছিল মালতীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। মার চিন্তার স্থান ছিল না সেখানে।

মালতীর কাহিনীবর্ণনে একটি নিঃসহায় আত্মসমর্পণের সুর ছিল যা দেবেশের হৃদয় স্পর্শ করেছিল গভীরভাবে। সেই স্পর্শে জাগ্রত হয়েছিল তার ভিতরকার সেণ্ট জর্জ। কিন্তু ড্রাগনটি কে? কোথায় সে? তাকে এত সহজে খুঁজে পাওয়া গেল না। দেবেশের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রইল শুধু দুঃখিনী মালতীর ছবি।

কিন্তু মালতীর দুঃখটা কী? নিঃসঙ্গতা? দুদিন আগেও দেবেশের সহজ সমাধান জানা ছিল এই সমস্যার। তার স্পষ্ট উত্তর ছিল অধ্যয়ন। সে নিজে ডুবে ছিল তার বইয়ের মধ্যে, তাইতে হয়েছিল তার নিজের নিঃসঙ্গতার সম্পূর্ণ নিরসন। আজ কিন্তু তার এই সহজ উত্তরটাকে কোনোক্রমেই যথেষ্ট মনে

হোলো না। কেবলই মনে হতে থাকল যে, বই দিয়ে সবখানি ফাঁক বুঝি চিরকালের জন্যে ঢাকা যায় না। আর, যে বিধি তার নিজেরই জীবনে অপর্যাপ্ত বলে আজ পরিগণিত, সে বিধান সে অপরকে দেবে কোন ভরসায়? মালতীর অসহায়তা যেন দেবেশে সংক্রামিত হোলো।

মা এতক্ষণ নীচে বসে ছিলেন। দেবেশ খাবে না শুনে তাঁর নিজের ক্ষুধাও ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছিল। ছেলের সঙ্গে তখনই উপরে আসেন নি। অভিমান করে নয়, রাগ করে তো নয়ই, আসেন নি শুধু দেবেশকে একা থাকতে দিতে।

মা ছাড়া এমন ভালো করে কেউ বুঝি তাকে বোঝেন নি কখনও। কখন দেবেশ কী চায়, কখন সে কিসে বিরক্ত বা বিব্রত হয়, সব কিছু মার জানা হয়ে যায় দেবেশের, এমন কি তাঁর নিজের, অজান্তে। পুত্রের ঔদাসীন্যের কারণ তাই স্পষ্ট না জানা থাকলেও এ কথা বুঝতে তাঁর মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় নি যে, তার বর্তমান ঔদাসীন্যের সঙ্গে যুক্ত আছে একান্ত ব্যক্তিগত কোনো চিন্তা।

সে চিন্তার অংশ নিতে মার ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। কিন্তু মা এ কথাও জানতেন যে, সংসারে অধিকাংশ জিনিসেরই অংশীকরণ অসম্ভব। অন্তত, অংশ করলেও মূল পরিমাণের কণাটুকুও হ্রাস পায় না!

সব বুঝেও মা পারলেন না আর চুপ করে থাকতে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে উপরে এসে দেখলেন, দেবেশ বিছানায় শুয়ে

আছে স্থির হয়ে। নিদ্রামগ্ন নয়, চিন্তামগ্ন। সে টেরও পায় নি মার আগমন। মা একবার চিন্তা করলেন, ঘরের আলোটা জ্বালবেন কি জ্বালবেন না—পাছে দেবেশের অস্বস্তির কারণ হয় তা। শেষে আলোটা না জ্বেলেই আর নীরব থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর এত দেরি হোলো কেন রে আজ দেবু?"

দেবেশ কী বলবে ভেবে পেল না। এখন তার মনে হোলো যে, মাকে একেবারে খবরই দেওয়া হয় নি। কখনও-নয়ের চাইতে বিলম্বে? এখন তাহলে বলবে কি? সব কথা? /

দেবেশের মুখ দিয়ে কথা সরল না। মার কাছে বলতে তার লজ্জা নেই, কিন্তু, কিন্তু—মালতীর তো আপত্তি হতে পারে। তার মা তো আর মালতীরও মা নয়। আজ সন্ধ্যায় যা হয়েছে, সে তো তার একক অভিজ্ঞতা নয়। তার ইতিহাসের কপিরাইট তো তার একার নয়।

কপিরাইটের কথায় মনে পড়ল, এ বিষয়ে আইনটা কী? যে কথা বলল আর যাকে তা বলা হোলো, এই দুজনের মধ্যে কার স্বত্ব সেই কথার উপর? যে চিঠি লিখল আর যাকে চিঠি লেখা হোলো, এর মধ্যে কে সেই চিঠির অধিকারী? যুক্তস্বত্ব? ভালো কথা। কিন্তু যদি আসে বিচ্ছেদ, যদি হয় পার্টিশন সুট? তবে? আইনের এই সমস্যাটা নিয়ে দেবেশ বিপদে পড়ল।

কিন্তু একটু পরেই মনে হোলো যে, প্রশ্নটা আইনের নয় আদৌ। নীতির? তার উত্তর তো সহজ। উভয়ের সম্মতি

না থাকলে কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না। কিন্তু মালতীর সম্মতি এখন সে পায় কোথা? এদিকে মা যে অপেক্ষা করছেন উত্তরের জন্যে।

পুত্রের নৈঃশব্দ্যে মা বিস্মিত হয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "খুব কাজ ছিল বুঝি আপিসে?"

"না তো।"

"ও, বেড়াতে গিয়েছিলি বুঝি?"

"হ্যাঁ, মা।"

দেবেশ গভীর অস্বস্তির সঙ্গে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিল যে, তার উত্তরগুলি উত্তর নয়। মার কাছ থেকে যে একটা কথা গোপন করতে হচ্ছে, সেই অব্যক্ত কথাটার অবহনীয় বোঝার ভারে দেবেশের নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এলো।

অন্যায় সে কিছু করে নি। সব কথা বলতে তার নিজের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তবু, কার অদৃশ্য হস্ত যেন তার কণ্ঠরোধ করে রেখেছে!

মা সাধারণত অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু আজ তাঁর কেন যেন সব কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। এই যে দেবেশের দেরি, এই যে তার কথা বলতে অনীহা—প্রশ্ন করা সত্বেও—এই সবগুলি সাধারণ নিয়ম থেকে এমনই ব্যতিক্রম যে, অজানা ভয়ে মায়েরও আপন রীতি থেকে ব্যতিক্রম করতে হোলো। দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে মা তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "একাই গিয়েছিলি বুঝি?"

দেবেশ তখনই উত্তর দিতে পারল না। তার সাতাশ বছরের জীবনে এই বোধ হয় প্রথম তার মাকে মনে হোলো আপন চিন্তাধারার অন্তরায় বলে। আপন প্রাইভেসির এলাকায় অনধিকারিণী বলে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে স্বতন্ত্র কারও হস্তক্ষেপ বলে। এর আগে মাকে স্বতন্ত্র বলেই মনে হয় নি কখনও। মা তো তার নিজেরই অংশ, সে নিজে তো তার মারই অংশমাত্র।

কিন্তু আজ কে যেন দাঁড়াল দুয়ের মাঝখানে!

ঘরটা অন্ধকার ছিল। তবু দেবেশ দু হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে শুয়ে ছিল। অকারণ একটা অপরাধ-বোধ তাকে নিরুত্তর করে রেখেছিল। অথচ সেই নিরুত্তরতাই যে তার অপরাধ-বোধের কারণ, তাও তার জানতে বাকি ছিল না। জুগুপ্সার অপরাধ গোপন করতেই বুঝি দেবেশ আরও সরে গিয়ে শয্যার অপর প্রান্তে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। অন্ধকার ঘরে অপেক্ষমানা মায়ের সরল জিজ্ঞাসা অপর পক্ষের নৈঃশব্দ্যের অস্পষ্টতায় অসহায়ভাবে হাত পেতে রইল। আর অপেক্ষা করতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো বন্ধুর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলি বুঝি?"

মার সর্বশেষ প্রশ্নে দেবেশ যেন নিষ্ক্রমণের একটা সংকীর্ণ পথের সন্ধান পেল। গোপনতার অন্ধকারের মধ্যে সে যেন আলোর রেখা। নির্বাত অন্ধকূপে সে যেন বায়ুর প্রবেশ। কোনো কিছু চিন্তা না করে শুধু যেন জেরার

উপর যবনিকা টানবার জন্যেই দেবেশ কালক্ষয় না করে বলল, "হ্যাঁ।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে মাতৃহৃদয় তৃপ্ত হোলো না। কিন্তু তিনি আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে দেবেশের ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে যেতে থাকলেন। দেবেশের উত্তর-দানের ধরনে একবার বুঝি মনে এলো একটু বিস্ময়, একটু অবিশ্বাসের আভাস। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে তিরস্কার করলেন পুত্রের সত্যবাদিতায় সন্দেহ করবার জন্যে। দেবেশ আর যাই করুক, দেবেশ মিথ্যা কথা কখনও বলে না, কাউকেই নয়, মাকে তো নয়ই—এ বিশ্বাস তার মার মনে দৃঢ়। মুহূর্তখণ্ডের জন্যও তা শিথিল হয়েছিল বলে তিনি ধিক্কার দিলেন নিজেকে। তখনকার মতো একেবারে বিস্মৃত হলেন আর সব কথা।

দেবেশ অন্য দিকে তাকিয়ে অতি কষ্টে মার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। পর-মুহূর্তেই তাকিয়ে দেখল, মা চলে গেছেন তার ঘর থেকে। আর অমনই তার অন্ধকার ঘরে তার অসত্য উত্তরের বিকৃত প্রতিধ্বনি যেন সহস্রটা তীক্ষ্ণ খণ্ডে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেশকে সর্ব অঙ্গে বিদ্ধ করতে থাকল।

এ আমি কী করলেম? মিথ্যা বললেম? তাও মার কাছে? মহার্ঘ পুরস্কারের জন্যেও পূর্বে যা করতে অস্বীকার করেছি, আজ তাই করলেম সেই একজনের কাছে, যার একমাত্র বিশ্বাসের আধার আমি? এবং যে আমার

একমাত্র সান্ত্বনার উৎস? মা একবারও আমার কথায় এতটুকু সন্দেহ করবেন না। উত্তর শোনা মাত্র চলে গেছেন। এ যে অন্ধজনের হাত থেকে পয়সা চুরি করা, নিদ্রিত জনকে হত্যা করা!

অশান্ত দেবেশ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল। মা এসেই শুয়ে পড়েছেন নীচের ঘরে। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করল দেবেশ। তার নিজের ঘরের মতো এ ঘরেও আলো ছিল না। কিন্তু দেবেশের সন্দেহ ছিল না যে, মা ঘুমোন নি। নিস্তব্ধ কক্ষে যে নিশ্বাস সুস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল তা নিঃসন্দেহে নিদ্রিতের নয়।

মাও টের পেলেন দেবেশের উপস্থিতি। কিন্তু কিছু বললেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

এবারে দেবেশের পালা নৈঃশব্দ্য বহন করবার।

অবশেষে দেবেশ বলল, "মা!"

মা সস্নেহে সাড়া দিলেন, "কী রে দেবু?"

দেবেশ চুপ করে রইল। কী বলবে ভেবে পেল না। মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মতো একটা অনান্তরিক লৌকিকতা করতে তার বাধল। কিন্তু ক্ষমা না চাইলে সে যে নিজেকেই ক্ষমা করতে পারবে না! আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলল, "মা, তুমি আজ আমায় কেন জিজ্ঞাসা করলে আমি কার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেম?"

অপরাধটা যেন মার!

মা বললেন, "কেন ভেবে তো তোকে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করি নে, দেবু। যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি।"

মার স্নিগ্ধ কণ্ঠে দেবেশের হৃদয় সিক্ত হোলো, শান্ত হোলো। শিশুর মতো অসহায় স্বরে বলল, "মা, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

"বোকা ছেলে। তুই বুঝি আবার এমন কিছু করতে পারিস যার জন্যে মার ক্ষমা করতে হবে!"

দেবেশের বুক থেকে বোঝা অনেকটা নেমে গেল। তবু বলল, "মা, আমাকে তুমি মিথ্যাবাদী মনে করো না, না?"

"তোকে মিথ্যাবাদী মনে করলে আমি বাঁচব কী নিয়ে দেবু? যা, শুয়ে পড়্‌গে এখন। রাত হয়েছে।"

"যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলো, মা, যে আমাকে আর তুমি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না, যার সত্য উত্তর আমি দিতে পারি নে।

মা এমন অনুরোধে বিস্মিত হলেন। কিন্তু ব্যথিত হলেন তার চেয়ে বেশি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে তাঁর মায়া হোলো। শুধু বললেন, "শুয়ে পড়্‌গে যা। রাত হয়েছে।"

দেবেশ অনেক হালকা হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু বিছানায় শুয়ে একবার এপাশ আর একবার ওপাশ ফিরে ঘুমোতে পারল না কিছুতেই। পাশে শুয়ে ছিল স্যালি। তারও চোখে ঘুম ছিল না।

নিদ্রাপ্রত্যাখ্যাত বিক্ষুব্ধ চিত্ত জর্জরিত হোলো ক্রমবর্ধমান ক্লান্তিতে। মনে মনে অসংখ্যবার ক্ষমা চাইল মার কাছে।

আর মালতীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বলল, তোমার সঙ্গে পরিচয় আকস্মিক। আমাদের দুজনের বিচরণ দু দিন পূর্বেও ছিল একেবারে বিভিন্ন কক্ষপথে। হঠাৎ কেন মিলিত হলেম জানি নে, আবার হঠাৎ কবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব তাও জানি নে। কিন্তু এই শুরু ও শেষের মাঝের সময়টায়—সে যত সংক্ষিপ্তই হোক বা যত দীর্ঘই হোক—এমন কিছু যেন আমরা না করি যার জন্যে লজ্জিত হতে হবে, যার জন্যে গোপনতার শরণ নিতে হবে, যার জন্যে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে অসত্যের কাছে। তোমার আমার বন্ধুত্বে—হ্যাঁ, বন্ধুত্ব ছাড়া আর কী?—এমন কিছু যেন প্রবেশ করতে না পারে যা সত্যের বিরোধী। প্রেম —না, প্রেম নয়; বন্ধুত্ব—সে তো জীবনবহির্ভূত ন্যায়-অন্যায়-স্বাধীন একটা বস্তু নয়; সে জীবনেরই অংশ। জীবনে যা অন্যায় বা অসত্য, বন্ধুত্ব তাকে ন্যায় বা সত্যে রূপান্তরিত করতে পারে না, কখনোই না। মালতী, এই নীতির বিরোধী আমি যেন কখনও কিছু না করি। মালতী, তুমি যেন আমায় তেমন কিছু করতে দিয়ো না। মালতী, কখনও না।

এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অসংখ্য পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও দেবেশের অনিশ্চিত দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হোলো না। মনে মনে সে ভর দিল মালতীর উপর। ভরসা না পেলেও অপরিসীম পরিতৃপ্তি লাভ করল মালতীর নামটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে।

মালতী, মালতী, মালতী!

ষোলো

মালতীর বাড়ির সামনে যখন ট্যাক্সি এসে থামল, তখনও তার একটু সময় লাগল নিজেকে এই কথাটা সম্যক উপলব্ধি করাতে যে এখানে তার নামতে হবে। নিদ্রাবিহারীর মতো ঠিক ঠিক ভাড়া চুকিয়ে দিল, ফটক খুলে ঢুকল, তারপর ঠিক ফটক বন্ধ করে নিজের ঘরের কাছে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলল। সবই ঠিক করেছে, কিন্তু যেন সজ্ঞানে নয়। স্বপ্নাবিষ্টের মতো।

দোতলার আলো তখন নিবে গেছে। চাকররা শুয়ে পড়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিদ্রাবিহারিণী নিঃশব্দপদে ঘরে ঢুকল, পাছে নিজের ঘুম ভেঙে যায়!

জামাকাপড় কিছু ছাড়ল না। অন্ধকারের মধ্যে জুতোটা খুলে সটান শুয়ে পড়ল সামনের শয্যায়। কাজটা শক্ত নয়। ঘরের যেখানে যা ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। কিছুমাত্র বদল হয় নি—জড়পদার্থের সুবিধাই এই! বদল হয়েছে শুধু মালতী। যে মালতী সেই সন্ধ্যায় ঘর থেকে দেবেশকে নিয়ে বেরিয়েছিল আর যে মালতী এখন ঘরে ফিরেছে, তাদের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। এক আরের অপরিচিতা।

কিন্তু ঘরটাও যেন বদল হয়েছে। অন্তত মালতীর তাই মনে হোলো। এক দিক থেকে সে স্বপ্নাবিষ্ট, কিন্তু অপর দিক থেকে তার সব কটা ইন্দ্রিয় যেন প্রখরভাবে জাগ্রত হয়েছে। যা ইতিপূর্বে দৃষ্টির অন্তরালে অবহেলিত রয়েছে, অকস্মাৎ সে

সব অকিঞ্চিৎকর জিনিসও যেন নব রূপ পরিগ্রহ করে দৃষ্টি দাবি করল।

শুধু দৃষ্টি জাগ্রত হয় নি। ঘ্রাণও। ঘরে শয্যার পাশে ফুলদানিতে আজ মালতী এক গুচ্ছ রজনীগন্ধার আয়োজন করেছিল বিশেষ করে দেবেশের আগমনের উপলক্ষে। আকাঙ্ক্ষিত সে অতিথি এসেছিল বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এসেছিল সরোজ। সে যেন উপদ্রব। তাই দেবেশের উপস্থিতিতে রজনী-গন্ধার কথা একবারও মনে হয় নি মালতীর। এখন এই অন্ধকার ঘরে রজনীগন্ধাগুলি যেন কথা কয়ে উঠল, সুর করে গেয়ে উঠল। ছোট ঘরখানি গানে গন্ধে ভরে উঠল।

কিন্তু শুধু রজনীগন্ধা নয়। তার গন্ধের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল আরও তীব্র একটা গন্ধ। সেটাকে সনাক্ত করতে একটু সময় লাগল মালতীর। হ্যাঁ, সিগারেটই হবে। এখন তার মনে পড়ল যে, দেবেশ তার ঘরে বসে গোটা তিনেক সিগারেট খেয়েছিল। বাহির থেকে ভেসে আসা স্নিগ্ধ রাতের হাওয়া, তার সঙ্গে রজনীগন্ধার সুরভি আর পুড়ে যাওয়া সিগারেটের গন্ধাবশেষ, সব কিছু মিলে মালতীকে আচ্ছন্ন করল। অন্য যে কোনো সময় নিকোটিন আর রজনীগন্ধার সমন্বয়টা মালতীরই কাছে উৎকট বলে মনে হোতো। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে মালতীর জীবনে কিছুই স্বাভাবিক নেই।

যা সুন্দর নয়, তাও সুন্দর ঠেকছে। সুন্দর হয়েছে সুন্দরতর।

মালতী অনেকক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে রইল, আর মনটাকে

"মনকে ছুটি দিল যদৃচ্ছ ভ্রমণ করবার। অল্পক্ষণ মাত্র পূর্বের জীবন্ত সুরভিত স্মৃতিগুলি মালতীর মনকে তেমনই আচ্ছন্ন করল, যেমন করেছে রজনীগন্ধাগুলি তার দেহকে।

কত শত কথা যে তার মনে এলো তার ঠিক নেই। ঠিকানা আছে। সে ঠিকানায় টেলিফোনও আছে। একবার মনে হোলো, দেবেশকে টেলিফোন করবে, বলবে যা বলা হয় নি।

এই হয়েছে মুশকিল। 'যখন থাক দূরে, আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে'। কিন্তু, 'কাছে এলে তোমার আঁখি, সকল কথা দেয় যে ঢাকি'! তখন সবগুলি কথা কোথায় যেন পালিয়ে যায় ভীরুর মতো।

টেলিফোনটার উপর হাত রাখল মালতী। আহা, এমন জিনিস আর নেই। এ কাছেও, এ দূরেও। দূরের দূরত্ব নেই, আবার কাছের নৈকট্য নেই। এমন বন্ধু আর নেই।

কিন্তু মালতী টেলিফোন করল না। এত রাত্রে, কি জানি, দেবেশ হয়তো বিরক্ত হবে। হয়তো ঠিক তেমন সুরে কথা বলবে না, যেমন বলেছিল আজ সন্ধ্যার শেষের দিকে। বললেও হয়তো এখন ঠিক তেমনটি শোনাবে না। সুরের এতটুকু ব্যত্যয় হলে, ছন্দের এতটুকু পতন হলে, মালতীর স্বপ্নটি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মালতী প্রবল দৃঢ়তা দিয়ে ইচ্ছা দমন করল।

কিন্তু গান তাকে গাইতেই, কথা তাকে কইতেই হবে। এখনই। এই মুহূর্তে। আজকের কথা আজই না বললে কাল আর বলা হবে না। বললেও তা আর আজকের কথাটি

কথা নিজের ভাষায়। অমন নিরাভরণভাবে স্খলিতকবরীতে লজ্জা হয় দেবেশের সামনে দাঁড়াতে। কিন্তু তবু, কাজ নেই ধারকরা বেশে। মনের কথা আপন মনের মতো করে বলবে। আপন হৃদয়শতদল মেলে ধরবে। নেবার হলে সে নেবেই। কবিই তো বলেছেন, পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।

মালতী লিখল। লিখল,—। না, যা লিখল তা শুধু দেবেশকেই লেখা। খোলা চিঠি নয়।

প্রতিটি ছত্র লেখবার সময় মালতী যেন একটি একটি যোজন করে দেবেশের কাছে এগিয়ে আসছিল। শেষ ছত্রে এসে হাত ঠেকল দেবেশের হাতে। আর অমনই সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। পাশে রাখল রজনীগন্ধার গুচ্ছটি। চুপিচুপি নিদ্রা এসে জাগরণের স্বপ্নকে স্বপ্নের সত্যতা দান করল।

ঘুম ভাঙল ভোর না হতে। জনহীন পথে কোলাহল নেই। দূর আকাশে শুকতারাটি তখন বিদায় নেবার আগে করুণ চোখে চেয়ে ছিল ধরণীর দিকে। কঠোর সূর্য তখনও অন্ধকারের অবগুণ্ঠন হরণ করে ধরণীকে করে নি লাঞ্ছিতা। মালতী চোখ মেলেই দেখল চিঠিটা। একবার ভাবল, খুলে পড়ে। পড়ল না। পাছে লজ্জায় মরে যায়, পাছে এখানে ওখানে বদল করবার লোভ সম্বরণ করতে না পারে।

শুধু কলমটা তুলে নিয়ে মালতী যোগ করল, দেবেশ, কাল রাতে তুমি পাশে ছিলে না বলে তোমাকে অভিশাপ দিয়েছি সহস্রবার, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ধন্যবাদ দিয়েছি

বিধাতাকে। তুমি থাকলে আমাদের উপর দিয়ে যে প্লাবন বয়ে যেত, তার জল সরে গেলে তুমি ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে না, আর আমাকে তো মরতেই হোতো জলে ডুবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমাকে ধন্যবাদ।

মনে মনে বলল, ভগবান, এমন যেন না হয়। দেবু, এমন যেন না হয়।

সতেরো

অসংখ্য দরকারী-অদরকারী কাগজপত্রের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ থেকে দেবেশ যখন মালতীর একান্ত অপ্রত্যাশিত, প্রায় অভাবনীয়, পত্রটি তুলে নিল, তখন কোমল একটি পালকের মৃদু একটু আঘাতে সে ধরাশায়ী হোলো। এর চাইতে বিস্ময়কর কোনো ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটে নি দেবেশের জীবনে। চিঠিখানা হাতে করে দেবেশ নিশ্চল হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ, পড়তেও ভুলে গেল। মধুর বিস্ময়ের পটভূমিকায় ছিল অপরিমেয় পরিতৃপ্তি।

এর আগে যখনই সে নিজের কথা ভেবেছে, এবং সেটা আদৌ বিরল নয়, তখনই তার নিজেকে অপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। একেবারে নিঃস্ব নয় সে কোনো দিকেই। অনেক পেয়েছে সে, তার জন্যে তার কৃতজ্ঞতাও গভীর। অনেক পেয়েছে। অনেক, কিন্তু সব নয়। একটা দিকেও নয়। দেবেশের ভাগ্য তার প্রতিভারই মতো বহুমুখীন—কিন্তু বহুদূর অগ্রসর হয়েও পরিপূর্ণ বিকাশ যেন হয়নি একটি দিকেও।

আজকের চিঠিটায় যেন একটা পূর্ণতার আবেশ পেল দেবেশ। যা ছিল অনির্দেশ্য ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, নামহীন, নিরাকার একটা অনুভূতি, তাই যেন পত্ররূপ পরিগ্রহ করে নির্দিষ্ট হোলো, স্থির হোলো। যা ছিল বাতাসে ভেসে যাওয়া

কথা, তাই কাগজে-কলমে বন্দী হয়ে স্থিতি লাভ করল। এখন একে হাতে ধরা যাবে, এখন এ একবার দেখা দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে না। একবার পড়ে আবার পড়া যাবে। আবার পড়ে আরও বহুবার। এখন মালতীর কথা ভাবতে গেলে শুধুমাত্র স্মৃতি থেকে ঋণ করতে হবে না, সঞ্চিত ও গচ্ছিত পত্রের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে ব্যয় করা যাবে, এবং সে ব্যয়ে সঞ্চয় শুধু বৃদ্ধিই পাবে।

দেবেশ চিঠিখানি খুলল। পড়ল। কতবার পড়ল তার সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। অঙ্কে দেবেশ কাঁচা।

গাণিতিক দর্শন কথাটা শুনেই দেবেশ ভয় পেয়েছিল। রাসেলের ওই বইটা আজও পড়তে সে সাহস পায় নি। তবু একটা সমস্যা গণিতের আকারে তার মাথায় ঘুরছিল কয়েক দিন থেকে। গত কয়েক দিন সে সহস্রবার মনে মনে বলেছে, এক দুই হতে চাইছে। এক দুই হতে চাইছে।

তার জীবনে মালতীর আবির্ভাব তাই সময়ের এত সংক্ষিপ্ত ব্যাপ্তিতেও এমন অভাবনীয় ব্যাপক গভীরতার সৃষ্টি করতে পেরেছে। দেয়ালপঞ্জীর বিচারে কত অল্প তাদের পরিচয়, অথচ কী এক অবোধ্য রহস্যময়ভাবে সময়কে টেলিস্কোপ করা হোলো! যুগযুগান্ত আশ্রয় নিল ক'টি মাত্র মুহূর্তের মধ্যে, জন্মজন্মান্তর বন্দী হোলো সংক্ষিপ্ত ক'টি দিনের ক্ষুদ্র পরিসরে!

চিঠিটা এসেছিল বিকালের ডাকে। দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেবেশ হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, পাঁচটা বেজে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। তখনই উত্তর লিখতে বসবে? দেবেশ

কিছু স্থির করতে পারল না। বাংলা লিখতে তার এত সময় লাগে যে, নিজেরই কাছে সত্যটা স্বীকার করতে লজ্জার সীমা থাকে না। ঠিক কথাটা যেন কিছুতেই কলমে আসবে না। ইংরেজী যে কথাটা সহজেই প্রথমে মনে আসে, কিছুতেই দেবেশ খুঁজে পায় না তার ঠিক যথাযথ বাংলা কথাটা। প্রতিশব্দটাকে মনে হয় স্থূল বলে, ভাবটির বা অর্থটির ঠিক শেড্‌টি যেন এতে ধরা পড়ে না। শেষ পর্যন্ত বাংলা সে যা লেখে, তা তার নিজেরই কাছে মনে হয় অক্ষম অনুবাদ বলে। ঠিক মূল চিন্তার সুরটি যেন কিছুতেই ধরা পড়ে না। শেষ পর্যন্ত নিজের লেখার উপর কঠোর মন্তব্য করে আর একটা ইংরেজী কথার অনুবাদ করে, বলে, মধ্যরাত্রির কেরোসিনের গন্ধে উৎকট এ রচনা!

না, মালতীর সঙ্গে তার মিলন গোধূলির, মধ্যরাত্রির নয়। চিঠির উত্তর তাই এখন স্থগিত থাকবে। কিন্তু চিঠিটাকে আস্তে, পরম আদর করে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে মালতীকে দেখবার ইচ্ছা দেবেশকে এমন নিঃশর্তভাবে অধিকার করে বসল যে, সে ইচ্ছার পায়ে আত্মসমর্পণ না করে উপায় ছিল না। তৎক্ষণাৎ দেবেশ মালতীকে টেলিফোনে ডাকল। অপারেটরকে নম্বর দিয়ে মনে একটু দ্বিধার উদ্ভব হয়েছিল। ভেবেছিল, উত্তর না পেলে—এবং পাওয়াই তো বিস্ময়ের ব্যাপার,—আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবে না। কিন্তু সেই বিস্ময়কর যোগাযোগ যখন ঘটল, তখন সকল দ্বিধা নিশ্চিহ্ন হোলো। মালতীর 'হ্যালো' শুনতেই

স্পষ্ট দ্বিধামুক্ত, প্রায়-উচ্চকণ্ঠে বলল, "কী করছেন আজ সন্ধ্যায় ?"

মালতী এই ডাক একবারও আশা করে নি। বরং চিঠিতে স্পষ্টই লিখেছিল যে, টেলিফোনে সে তার চিঠির উত্তর চায় না। আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলল, "বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু কেন বলো তো ?"

"বিশেষ প্রয়োজন, আজ আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া চাইই।"

মালতী ভয় পেল। দেবেশের স্বরে এমন একটা অবিশ্বাস্য তাড়া ছিল যে, তার সম্মুখে মালতীর সংকোচ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। সংকোচকেও অতিক্রম করল দেবেশের 'আপনি'-জনিত অস্বস্তি। সে তো শুধু চিঠিতেই 'তুমি' লেখে নি, একটু আগেও সহজেই তার পুনরাবৃত্তি করেছে। তবু কেন দেবেশ এমন করে তার পূর্বজন্মের দূরত্ব আগলে থাকবে ? বলল, "তার চেয়ে এখনই বলুন না যা বলবেন। দূর থেকে কঠোর সহনীয় হবে।"

দেবেশের বিপদই এই। কোমলও তার কণ্ঠে কড়ির মতো শোনায়। তা নইলে মালতী কী করে কল্পনা করতে পারল কঠোরতার কথা ? তার অন্তর যখন একেবারে বিপরীত ভাবে উচ্ছল ? যতদূর সম্ভব স্বর নামিয়ে বলল, "সে জন্যে নয়। যা কোমল, তা টেলিফোনে যথেষ্ট কোমল না শোনাতে পারে, সেই আশঙ্কায়ই এখন বলব না। দেখা হলে বলব। কখন আসব বলুন ?"

মালতী আর প্রতিবাদ করল না। দেখা হওয়ার জায়গা ও সময় ঠিক হোলো টেলিফোন রাখবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট যেন আর কাটতে চায় না। আরও বার কয়েক চিঠিটা পড়ল, যদিও তার সব কিছু দেবেশের প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। হাত ধোবার ঘরে গিয়ে আয়নায় মুখ দেখে দেবেশের আক্ষেপ হোলো যে, বাড়ি গিয়ে বদল করবার সময় নেই। আজকের কোটটা তার নিজেরই ভালো লাগে না। কোট না হয় না নেবে, কিন্তু ভালো সেই 'লাকি' টাইটাও আজ সে পরে নি বলে দেবেশের গভীর অনুশোচনা হোলো। এই সব পোশাকের ব্যাপারে দেবেশের খেয়াল ছিল না কোনো দিন। কী কোট পরেছে, বা কী টাই, এসব সম্বন্ধে সে ছিল একেবারেই অচেতন। আজ যেন তার পোশাককে তার উৎসবের অনুপযুক্ত বলে মনে হোলো। ভাগ্য ভালো, সার রজার ডি কভার্লির কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে মালতী সেখানে উপস্থিত ছিল না।

মালতীর নিজেরও সমস্যার শেষ ছিল না। টেলিফোন রেখেই সে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল স্নানের ঘরে। জুলাই মাসের গরমে সারাটা দুপুর সে সীলিঙের পাখাটাকে হয়রান করেছে, আর ঘেমেছে সে নিজে। গা ধুয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার উপরে কুণ্ডলী করে বাঁধা চুলটা খুলে দিল। হাঁটু পর্যন্ত এলিয়ে পড়ল মালতীর লম্বা চুলগুলি।

অসামান্যা রূপবতী বলে মালতীর খ্যাতি নেই; কেন

না বর্ণ তার উজ্জ্বল শ্যাম মাত্র, ফ্যাকাশে ফরসা নয়। সে নিজেও নিজেকে কখনও অসামান্যা সুন্দরী বলে মনে করে নি। রূপ নিয়ে সে মাথাই ঘামায় নি তেমন। আজ কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে একটু সচেতন গর্ব হোলো মালতীর। সদ্যোধৌত চর্মের উজ্জ্বলতা অগৌর হলেও অগৌরবের নয় আদৌ। তাই নয়? কিন্তু বর্ণের কথা ছেড়ে দিলেও, এমন চুল আছে ক'জন বাঙালী মেয়ের? সর্বোপরি, এমন সুসমঞ্জস ফিগার আছে কটি ভারতীয়ার? স্বাস্থ্যবতী অথচ তন্বী, দীর্ঘা অথচ অরুগ্না, চোখ দুটি সজাগ, সমস্ত মুখে নির্মল বুদ্ধির নিঃসন্দেহ দীপ্তি, সব কিছু মিলিয়ে মালতীর আকর্ষণ শুধুমাত্র দেহের নয়। অনেকখানি হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের, কিন্তু আকর্ষণটি অনস্বীকার্য। মালতী মনে মনে বলল, কথাটা আমি নিজে বললেও সত্য।

অন্যান্য মেয়েদের মতো পোশাক করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নেয় না মালতী। মালতীর রূপের যতটুকু দেহের, তার পরিচর্যা শক্তও নয়, সময়সাপেক্ষও নয়। অন্তর্বাসের উপর ব্লাউজ-পেটিকোট ও তার উপর শাড়ি পরে মালতী যখন বেরুবার জন্যে তৈরি হোলো, তখনও হাতে একটু সময় আছে। মাথার উপর পাখাটা আরও একটু জোরে চালিয়ে দিয়ে মালতী বসল একটু।

দেখা তো করতে যাচ্ছে, কিন্তু তারপর? দেবেশ কী বলবে? কী এমন বিশেষ প্রয়োজন? চিঠির কথা যদি বলে? চিঠিতে কী কী লিখেছে তার কিছুটা মনে হতেই

মালতীর লজ্জার অবধি রইল না। ছি ছি! সব কথা এমন লজ্জাহীনার মতো সে লিখতে পারল কী করে? রাত্রির উন্মাদনার অন্ধকারে লেখার কথা এখন যদি সাক্ষাতের দিবালোকে আলোচিত হয়? শাড়ি-ব্লাউজ তো ঠিক পরেছে মালতী, কিন্তু এমন মানসিক বিবস্ত্রতা নিয়ে দেবেশের সামনে যাবে কী করে সে? ছি ছি!

কিন্তু আর দেরি করবার উপায় ছিল না অভিসারিকার।

নির্ধারিত স্থান অর্থাৎ রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপর ত্রিকোণ পার্কের কাছে এসে দেবেশ ট্যাক্সি থেকে নামল।

সেই সঙ্গে আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি।

দীর্ঘ দগ্ধ দিনের অবসানে নিদাঘশ্রান্ত নাগরিকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রার্থনাই ছিল এই বর্ষণের জন্যে। সে প্রার্থনায় দেবেশও নিশ্চয়ই কণ্ঠযোগ করে থাকবে একাধিকবার। কিন্তু সেই বারিধারাই যখন স্বর্গের শান্তিময়ী সুধার মতো মুমূর্ষু ধরণীর মরূপম বক্ষতল সুশীতল করবার জন্যে মর্তে অবতরণ করল, দেবেশ তখন তাকে অভিনন্দন জানিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারল না। এমন অকালবর্ষাকে তার অভিশাপ না দিয়ে উপায় রইল না। হ্যাঁ, বৃষ্টি সে চেয়েছিল, কিন্তু তখন কি সে জানত যে সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করতে হবে মালতীর সঙ্গে? জানলে কি সে চাইত এই বৃষ্টিরূপী বাধা?

ইতিপূর্বেই দেবেশ সিদ্ধান্ত করেছিল যে, ঈশ্বরের একটুও ড্রামাটিক সেন্‌স্‌ নেই। এখন সে আবিষ্কার করল যে তাঁর সেন্‌স্‌ অব টাইমিং আরও অল্প।

কিন্তু এই সময়-জ্ঞানের ব্যাপারে ঈশ্বরকেও বোধ করি হারিয়ে দিতে পারে মেয়েরা! দেবেশ হাতের বইটা দিয়ে চশমার উপর ছাদ রচনা করে চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে: কোথাও মালতীর দেখা পেল না।

এমন বৃষ্টি মাথায় করে মালতী কি আসবে? দেবেশের মন অসহ্য অনিশ্চয়তায় ছিন্ন হোলো। কিন্তু যখন—ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে, বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে— তখন মালতী না-ই বা আসবে কী করে?

কথা ছিল রাস্তায় না দাঁড়িয়ে পার্কের ভিতরে এসে মাঝখানের গাছের তলায় বেঞ্চিটায় অপেক্ষা করা। দেবেশ তাই পার্কের টার্ন ষ্টাইল পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করল। হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ায় সবাই যখন পরম ত্রস্ততায় নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, তখন একটা লোক সমান ত্রস্ততায় ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে, এতে স্বভাবতই কয়েকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোলো। কিন্তু এসব দিকে মনোযোগ দেবার মতো মন বা সময় ছিল না দেবেশের। সে এগিয়ে চলল।

পার্ক ততক্ষণে শূন্যপ্রায়। বৃষ্টির মেঘ এসে সন্ধ্যাকে এগিয়ে এনেছিল। পার্কের তিন দিকের বাড়ীগুলিতে তাই আলো জ্বলছিল। বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে দেখলে সেই বিজলী বাতিগুলিও কী রকম যেন একটা অনাগরিক রূপ ধারণ করে। পার্কের মধ্যে ল্যাম্পপোষ্ট আর গাছগুলি অবিচলিত-ভাবে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। আর ভিজছিল দেবেশ।

ভিজতে ভালো লাগছিল। মাথার উপরের গাছটা যতদূর সম্ভব রক্ষা করতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু তবু এখানে ওখানে কয়েক ফোঁটা অতর্কিতে গায়ে এসে পড়ছিলই। দেবেশ কিছু মনে করে নি। কিন্তু চশমাওয়ালা লোকদের বৃষ্টিতে বড়ো বিপদ, কেন না চশমাটার কাচ ছুটো ভিজে যায় সব চেয়ে আগে আর তখন দৃষ্টি হয় আচ্ছন্ন। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও সে অপেক্ষা করছিল। এই বৃষ্টির মধ্যে মালতী যদি আসে, এবং সে তো বলেছে যে আসবে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবে—তা হলে এই বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকারে, এই নির্জন পার্কের অলক্ষ্য সাক্ষ্যে এতদিনের বাক্যরাশিকে অতিক্রম করে, সকল সংকোচ, সকল জড়তা ভাসিয়ে দিয়ে, এককে শুধু দুই করবে না, দুইকে এক করে দেবে। দেবেশের অধীর আশায় বৃষ্টিধারা জলসিঞ্চন করল।

একটু পরেই হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় দেবেশ দেখল, সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে একটী মহিলা দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই মালতী। মানুষ পুরোপুরি অভিলাষের দাস হলে দেবেশ নিজে ছুটে এগিয়ে গিয়ে মালতীকে অভ্যর্থনা করত। পারল না। বাধল। সংকোচ তখনও কাটে নি।

হাসতে হাসতে কাছে এসে মালতী বলল, “যাক, এসেছ তা হলে? আমি তো ভেবেছিলেম, বৃষ্টি দেখে আসবেই না শেষ পর্যন্ত।”

দেবেশ এখানে সাধারণত যে উত্তর দিত তা হচ্ছে এই

যে, কথা দিলে সেটা রাখাই তার রীতি। আজকের সিক্ত সন্ধ্যায় এমন একটা শুষ্ক উত্তর দেবেশের মুখে সরল না। না। বলল, "সে আশঙ্কা যে আমার ছিল।"

মালতী কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। দেবেশ বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু সেই আশঙ্কা যখন মিথ্যা প্রমাণিত হোলো তখন আপনার আসাকে শুধু প্রতিশ্রুতি-পূরণ মনে হোলো না। মনে হোলো, প্রতিশ্রুতি তো বৃষ্টির মতো অ্যাক্ট অব্ গড এসে নাকচ করে দিয়েছে। পরবর্তী প্রাপ্তিটি তাই দুর্লভ সৌভাগ্য ; মাইনে নয়, বোনাস ; পাওনা নয়, বখশিশ।"

বর্ষণের স্পর্শে আর সঙ্গীতে মালতীর হৃদয় এমনিতেই উচ্ছল হয়ে ছিল। দেবেশের ভাষণে আরও খুশি হয়ে হাসতে হাসতে বলল, "কিন্তু এদিকে যে মাথার উপরে বারি ঝরঝর, সে খবর রাখ কি?"

"রাখি এবং রাখি নে। কিন্তু মাথাকে আজ বিদায় দিয়েছি, অতএব তার উপরে বারি ঝরঝর কি না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। মাথাকে বাদ দিয়ে যাকে নিয়ে এখানে এসেছি, সে হচ্ছে মন এবং এই বৃষ্টিটা তার একান্তই মনঃপূত।"

"কিন্তু এই বৃষ্টিতে কি এমনই দাঁড়িয়ে থাকব?"

"ও হো! কী অভদ্র আমি! অতিথিকে এতক্ষণ বসতে পর্যন্ত বলি নি।"

"বা রে, এটা কি তোমার বাড়ি নাকি?"

"না, বাড়ি নয়। পার্ক, কিন্তু আমার। এটাকে আজ আমি রিকুইজিশন করেছি। ট্রেস্‌পাসার যারা ছিল তাদের একটু আগে তাড়িয়ে দিয়েছি বৃষ্টি এনে, পুলিশ যেমন করে হোস-পাইপ দিয়ে জল ছড়িয়ে বেআইনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।"

এ কি দেবেশ, না, আর কেউ? লোকটা এমন স্বাভাবিক মানুষের মতোও কথা বলতে পারে? মালতী বিশ্বাস করতে পারছিল না, কিন্তু সহাস্যে উপভোগ করছিল দেবেশের পরিহাস। দেবেশ সচেতন থাকলে নিজেও বিশ্বাস করতে পারত না তার বর্তমান মূর্তি। কিন্তু পত্রে যে সেতু রচিত হয়েছিল তার উপর দিয়ে দেবেশ অবলীলাক্রমে অপর পারে এসে পৌঁছেছিল। যে আত্মসচেতন সংকোচ তার জন্মগত অভিশাপ, তাকে ফেলে এসেছিল ওপারে।

পাগলের মতো প্রলাপ থামিয়ে কপট দরবারী লৌকিকতার স্বরে বলল, "আর্যে, আমার দীন উদ্যানে আসন গ্রহণ করে অধমকে ধন্য করুন।"

হাসতে হাসতে ভিজে বেঞ্চিটার উপর বসে মালতী বলল, "চিনতে পারছি নে তো। নতুন লোক বলে মনে হচ্ছে।"

"বিস্ময়ের কিছু নেই। সত্যি নতুন যে। নতুন বোতলে পুরানো আসব ভর্তি করা শঠতা। তার চেয়ে বড়ো শঠতা পুরানো শিশিতে নতুন আসব। তেমন শঠতা আমি করতে পারব না।"

"এর আগে এত কথা তো কখনও—"

"সামনে গিরি নেই, পঙ্গু যা লঙ্ঘন করতে পারে। তাই ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে মূককে বাচাল হয়েই শাস্ত্রবচনানুযায়ী পরিবর্তনের পরিমাপটা বোঝাতে হচ্ছে।"

দুজনে প্রাণ খুলে হাসছিল। ঝরঝর বৃষ্টি। চতুর্দিকে কোথাও গুপ্তচর নেই কান পেতে। আকাশে তারাগুলি নেই চোখ মেলে। উভয়ের মনের পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে বিদায় নিয়েছে সকল বাধা। মনের পুরোভূমি অধিকার করে আছে দুটি তৃষিত বুভুক্ষু চিত্তের দুর্দম মিলনপিয়াসা।

দেবেশ দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। মালতী বলল, "অতিথি-সংকার তো হোলো। এবার গৃহীর উপবেশনে তো বাধা নেই।"

"বাধা নেই। সাধও আছে। কিন্তু এই জলধারার মধ্যে ওই শুষ্কং কাষ্ঠং-এর বেঞ্চিতে বসতে পারব না।"

"সে ভয় নেই। শুষ্কং এটা আদৌ নেই। কিন্তু কোথায় বসব তা হলে ?

দেবেশ কাছের গাছটা দেখিয়ে বলল, "বৃক্ষ ঈব।"

"গাছের উপরে নয় আশা করি !"

দেবেশ একটু ভেবে বলল, "উঁ, না। উপরে নয়। তার চেয়ে গাছটাকে বলা যাক, আমাদের মাথার উপর ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে।"

"ছত্রটি নিচ্ছিদ্র নয়।"

"ছাতা তো ছাতা, কোন ইংরেজ কবি যেন আকাশকে পর্যন্ত ছিদ্রময় বলে বর্ণনা করে কাব্য রচনা করেছেন।

অভিযোগ করে কী হবে ?—” সহসা দেবেশ গম্ভীর হোলো কবিতাগুলির কথা মনে করে।

কিন্তু অভিযোগ কোথায় ? মালতী অভিযোগ করবে আজ এই এমন একটি সন্ধ্যায়। সে কি এমনই অকৃতজ্ঞ ? এতক্ষণ সে তো শুধু বৃষ্টিধারার রিমঝিম শুনেছে, আর শুনেছে দেবেশের অভূতপূর্ব পুলকপ্রকাশ পরিহাস, আর মনে মনে শুধু বলেছে, এ কি ঘুমে, এ কি জাগরণে, কি জানি কি জানি ! এত আনন্দের মধ্যে দেবেশকে হঠাৎ মলিন হতে দেখে মালতীর ভালো লাগল না। দণ্ডায়মান দেবেশের হাত ধরে মালতী বলল, “চলো, ওই গাছটার তলায় বসিগে।”

মালতীর স্পর্শে দেবেশ তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে তার মন থেকে বিষাদকে বিতাড়িত করল সজোরে। মনে মনে বলল, আজ এই সন্ধ্যায় এই নির্জন বৃষ্টিমুখর ত্রিকোণ পার্ককে ঈডেন উদ্যানে পরিণত করব। মনের কাঁধের ’পরে থাকতে দেব না ওরিজিন্যাল সিনের দুর্বহ বোঝা। আনন্দকে মনে করব না অপরাধ বলে। ওই বৃক্ষের ফল লাল হয়ে লোভ দেখাতে চাইলে চোখ ফিরিয়ে নেব। ওটা আপেল গাছই নয়। ওটাকে করব মিস্‌ল্‌টো। আজ বড়োদিন। বরফের বদলে বৃষ্টি ঝরছে, এইটুকুই যা প্রভেদ।

গাছের কাছে এসে মালতী বলল, “কিন্তু এখানে শুধু জল নয়, কাদাও রয়েছে যে।”

দেবেশ তাড়াতাড়ি তার হাতের বইটা মাটির উপর রেখে বলল, “এইবারে বসুন।”

বই সম্বন্ধে দেবেশের এমন অবজ্ঞা দেখে মালতী বিস্মিত হোলো। বইয়ের উপর বসতে তার নিজেরও ইচ্ছা ছিল না। বলল, "কিন্তু বইটা—"

দেবেশ বাধা দিয়ে জোর করে মালতীকে বইয়ের উপর বসিয়ে দিতে দিতে বলল, "আজ—বুক্‌স্‌, ডু নট লুক অ্যাট মি ; ক্লক্‌, ডু নট ষ্টেয়ার। বোসো।"

আপনি ও তুমির মধ্যে যে বৃহৎ প্রাচীর ছিল, দেবেশ তা বিনা চিন্তায়, বিনা চেষ্টায়, প্রায় অজ্ঞাতসারে ধূলিসাৎ করে দিল। সেই সঙ্গে চূর্ণ হোলো আরও অনেকগুলি প্রাচীর। দুজনে বসল পাশাপাশি। একজনের হাত রইল আর একজনের হাতে। গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ-ঢালা সন্ধ্যাটি সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায় সুন্দর হয়ে উঠল।

সেই পূর্ণতার মধ্যে বাক্যনবাব দেবেশের এবার কেন যেন কথার জন্যে ভিখারী বলে মনে হোলো নিজেকে। নিজের কথা হারিয়েছে, কিন্তু কেবলই মনে আসছে নানা গানের সুর, নানা কবিতার কথা।

দেবেশের হাতটা একটু চেপে ধরে মালতী বলল মৃদুস্বরে, প্রায় কানে কানে, "কী, হঠাৎ চুপ করে রইলে যে ?"

দেবেশের মনে যে কথাগুলি গুনগুন করছিল, তা মালতীরই মতো মৃদুস্বরে তার কানের কাছে এসে বলল, "যে কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি, জানি না কোন মন্তরে তাহারে দিব বাণী। মালতী, এবার আমি শুনি আর তুমি বলো !"

দেবেশের স্কন্ধে আলগোছে মাথাটা স্থাপন করে মালতী

এলায়িত কণ্ঠে বলল, "বাণী মোর নাহি। স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি। তুমি বলো।"

দেবেশ বলল, "তুমি বলো।"

এই নিজের বলতে অস্বীকৃতি ও অপরকে বলতে অনুরোধটুকুর মধ্যে কত কথা যে বলা হয়ে গেল, তা ওরা দুজনেই বুঝল। কিছুক্ষণ পরে মালতী বলল, "আমার কথা তো আমি সব বলেছি। আর যা কথা তা যদি আজও না জেনে থাকো, তা হলে আর কখনোই জানা হবে না। তুমি বলো।"

দেবেশ যতই সব কিছু বিস্মৃত হয়ে আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠুক, কখনোই খুব দীর্ঘ সময়ের জন্যে তার জীবনের অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা মন থেকে দূরে থাকে না। একটু আগে 'বাণী' কথাটির দু'বার উল্লেখ হয়েছে। এবারে মালতীর ইঙ্গিত।

দেবেশের ইচ্ছা ছিল না এমন কথা উত্থাপন করে আজকের এই সন্ধ্যাটিকে বিষণ্ণ করে তুলতে। কিন্তু তা বুঝি হবার নয়। কাব্যের সুর পরিহার করে শান্ত স্বাভাবিক গদ্যময় স্বরে দেবেশ বলল, "মালতী, এতদিন যে তোমাকে আমার সম্বন্ধে সব বলি নি, তা কিছু গোপন করার দুরভিসন্ধি নিয়ে নয়। যে কথাটা শুনতে চাইছ, সেটাতে অপরাধ নেই কারোই। তাই গোপন করবার কারণ নেই। সেটা শুধু দুজনের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। তার ফলটা যে মন্দ হয়েছে তার কারণ এই নয় যে, একজনেরও উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না। মন্দ ছিল শুধু ভাগ্য। দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে তুমি বিরক্ত হবে, শুধু এই আশঙ্কায়ই এত দিন বলি নি।"

"দেবেশ, ভালো হোক মন্দ হোক, তোমার কোনো কথায় আমি বিরক্ত হব—এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে কী ক'রে ?"

"সংক্ষেপে বলি তা হলে। দুর্ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে আড়াই বছর আগে। বাণীকে তার আগে কখনও দেখি নি। পরে আত্মীয়েরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন এই কথা বলে যে, এমন কাউকে আমি বিয়ে করলেম কী করে যার সঙ্গে এতটুকুও পরিচয় নেই। এই প্রশ্নের জবাব আজও জানি নে।

"যাই হোক, তার চাইতে যা মর্মান্তিক তা হচ্ছে এই যে, বিয়ের পরেও পরিচয় আর হয়ে উঠল না। আমার বয়স হয়েছে, আমার অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা যদিবা অল্প, সহনশীলতা অপরিসীম। আমি তাই চুপ করেছিলেম। কিন্তু বাণীর কাছ থেকে সেটা আশা করাই অন্যায়। ঠিক দু বছর পরে তাই সে এখান থেকে মার কাছে চলে গেছে। বলা বাহুল্য, এতে আমি বিলাপ করি নি। বাধাও দিই নি। যাকে সুখ বা শান্তি দিতে পারি নি, তাকে অন্তত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করি নি।

"এ নিয়ে দোষারোপের অন্ত নেই। তা নিয়েও আমি অনুদ্বিগ্নমনা। আমার এই অনুদ্বেগ যে পাষণ্ডের হৃদয়হীনতা বলে প্রচারিত হয়েছে, তা নিয়েও অভিযোগ করবার অধিকার নেই আমার। করিও নে। আইনের অমানুষিকতার জন্যে যে অপ্রীতিকর অধ্যায়ের সুষ্ঠু অবসান ঘটানো সম্ভব হয় নি সে জন্যে মানুষকে অমানুষ বলে গাল দিলে সুবিচার হয় কি না— সমাজই বিচার করুক। যদিও তাতে আসামীকেই বিচারক

করা হয় বোধ হয়। সে যাই হোক, আইনত শেষ না হলেও আর সব দিক থেকে তার সমাধি হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই।”

মালতীর অভিজ্ঞতাও মূলত বিভিন্ন নয়। সে জানে এমন অভিশপ্ত জীবনের বেদনা কোথায়। তাই সে বুঝল দেবেশের কথা অন্তরে অন্তরে। শুধু দেবেশ যা বলেছে তাই নয়, যা বলে নি তাও। গভীর চিন্তা করে নয়, নিজের মনে মনে যা অসংখ্যবার আবৃত্তি করেছে, তা-ই দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলল, “মুশকিল হচ্ছে এই যে, এটাকে সমাধি বলে মনে করলে ভূতে বিশ্বাস করতে হয়। ভূতটা যেন শিকল হয়ে হাত-পা বেঁধে রেখেছে সর্বক্ষণ।”

“আমি ঠিক শিকল বলব না। আমি বলি, এ যেন—” নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে উপমাটা খুঁজে পেল—“এ যেন জুতোয় লাগা কাদা। অপরিচ্ছন্ন আর ভারী এই বোঝাটা নিয়ে পথ চলতে অসুবিধে হয় বইকি। কিন্তু অসুবিধাই মাত্র, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেই এর আমার জীবনে।”

এই আলোচনাটা ভালো লাগছিল না দেবেশের। একে শেষ করে মধুর সন্ধ্যাটির মূল সুরের ঠিক লয়ে ফিরে আসবার জন্যেই মালতীর অবশ হাত দুটি তুলে নিয়ে নিজের মুখের দু দিকে স্থাপন করে আস্তে আস্তে বলল, “আমার জীবনের পরি-প্রেক্ষিতে বর্ণিত ঘটনাটার সামান্যতা স্পষ্ট বুঝতে পারবে যখন বলি, আমি যদি ওটাকে নিয়ে কখনও কিছু লিখি, তা হবে

কোনো দৈনিক কাগজের পূজা-সংখ্যার জন্যে একটা ছোট গল্প, কলকাতা থেকে রামরাজাতলা পর্যন্ত যার আয়ু।”

দেবেশ কথাটা বলেছিল একটু চেষ্টাকৃত লঘুতার সুরে। মালতী কিন্তু হাসল না। দেবেশ তাই আরও কাছে এসে গভীর স্বরে যোগ করল, “আর তোমার-আমার পরিচয় নিয়ে যদি কখনও লিখি তবে তা হবে অন্তহীন একখানি উপন্যাস-মালা। এবারে প্রভেদটা বুঝতে পেরেছ আশা করি।”

“বুঝেছি। কিন্তু আমি যে বাণীর কাছে অপরাধিনী হয়ে রইলেম।”

দেবেশ এই উক্তিটার আয়নায় আপন রূপ দেখে চমকে উঠল। তা হলে সেও কি অপরাধী নয় কর্নেল রণেন গুপ্তের কাছে? দেবেশ আর মালতী কি তাহলে পার্টনার্‌স্‌ ইন ক্রাইম? প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে পেল না দেবেশ। প্রশ্নগুলি ছাপিয়ে মন কেবলই বলতে থাকল, এমন অপার্থিব আনন্দের ভিত্তি কিছুতেই হতে পারে না অন্যায়। এমন স্বর্গীয় পুলকের পশ্চাতে কিছুতেই থাকতে পারে না পাপের আভাস। তবে? কিন্তু? জিজ্ঞাসাগুলি তীরের মত বিঁধতে থাকল। এবারে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি যেন তীক্ষ্ণ ধারাল মনে হতে থাকল।

মালতী সাদরে দেবেশের কপালের উপর চলে আসা ভিজে চুলগুলি সরিয়ে সাজিয়ে দিতে দিতে মিনতির সুরে বলল, “কী বলো।”

সেই কোমল স্পর্শের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি-শয়তানী দেবেশের মন থেকে সন্দেহের করাল ছায়া সরিয়ে নিয়ে আবার সেখানে

আনন্দের আলোকপাত করল। দেবেশ উত্তর খুঁজে পেল। যুক্তিটা সাজাবার সময় নেবার জন্যেই বলল, "তুমি যদি বাণীর কাছে অপরাধিনী হয়ে থাক, তা হলে আমিও যে কর্নেলের কাছে ক্রিমিন্যাল। তাই নয় ?"

মালতীর প্রশ্নের এই অনুপ্রশ্নটা একবারও তার মনে আসে নি। মনের জিভ কেটে বলল, "কিন্তু কই, তোমাকে যে একবারও অপরাধী বলে মনে করতে পারি নে।"

"আর আমিই বুঝি তোমাকে অনায়াসে অনুক্ষণ অপরাধিনী মনে করি, না ? তুমি জানো, তা নয়। তবে আমি এতদিন বিশ্বাস করে এসেছি যে, অপরাধীকে অন্তরে অন্তরে তার অপরাধের বোঝা বহন করতে হবেই হবে। তবে কি তুমি আর আমি পরোক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা করছি ? এই যে তুমি আর আমি এই মুহূর্তে এক ও অভিন্ন হয়ে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হয়েছি, এটা কি সত্য নয় ?"

ভাষাহীন মাধ্যমে মালতী তার সর্ব্বান্তঃকরণ সম্মতি জানিয়ে দিল। পিছনের গাছটাকে সত্যি সেই মুহূর্তের মতো মিস্‌ল্‌টোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হোলো।

আরও অনুপ্রাণিত হয়ে দেবেশ আবার বলল "এই প্রত্যক্ষ জীবন্ত জ্বলন্ত সত্যের চাইতে বড়ো হয়ে গেল সেই বাজে মিথ্যাটা ? শুধু মাত্র এই জন্যে যে সে মিথ্যা উচ্চারিত হয়েছিল উদরপরায়ণ কতকগুলি লোকের উপস্থিতিতে আর ঘৃতঘুষিত অগ্নিশিখার সাক্ষ্যে ? আর তোমার আমার সারা জীবন এই মিথ্যাটা আগলে যেতে হবে ? এ কেমন বিধি ?

এ কেমন বিধান ? এ কেমন বিচার ? একটু আগে তুমি বাণী-বঞ্চনার কথা বলছিলে। এর উত্তর তো তুমিই সেদিন দিয়েছিলে। বঞ্চনা কাকে বলো ? যার যা ছিলই না, তাকে তা থেকে বঞ্চনা করা কি সম্ভব ?"

মৃত অতীতের সকল বিশ্বাস নিঃশেষে বিস্মৃত হয়ে দেবেশ বলে চলল, "তা ছাড়া ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটাই এ ক্ষেত্রে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক। আর সে প্রসঙ্গ যদি উত্থাপন করাই হয়, তা হলে বলব, অপরাধের সবটাই অপর পক্ষের। আমি সৈনিককে বঞ্চনা করি নি, সৈনিক আমাকে বঞ্চনা করেছে। তুমি বাণীকে বঞ্চনা কর নি, বাণী তোমাকে বঞ্চনা করেছে।"

তীব্র এই উক্তিটার প্রতিবাদ করল না মালতী। কিন্তু পূরোপূরি সমর্থনও যে করতে পারল না তা দেবেশের জানতে বাকি রইল না। তাই সে আরও ব্যাখ্যা করে বলল, "বঞ্চনা নয় তো কী ? এ তো জমিদারের অবর্তমানে তার জমি দখল করারই সামিল। তোমার আমার পরিচয় ছিল না। সেই অপরিচয়ের সুযোগে দুটি অনধিকারী ব্যক্তি তোমাকে ও আমাকে তাদের সম্পত্তি বলে চুরি করল। পরিচয়ের প্রথম মুহূর্তে আসল মালিকানা প্রকাশ হয়ে পড়ল। অনেকগুলি বছরের অলীক দখল তৎক্ষণাৎ আমরা দুজনে অস্বীকার করলেম। জবরদস্ত অধিকার সত্ত্বেও আমরা অন্তরে ছিলেম একেবারেই শূন্য। তাই যে মুহূর্তে দেখা হোলো অমনই একটিমাত্র ক্ষণ আড়াল করে দিল দীর্ঘ আড়াই বছরকে।"

"আমার বেলায় সেটা দশ বছর।"

"তা হলেই দেখ, পূর্বেকার দখলটা কত নকল, কত মেকি !"

"ঠিক। কিন্তু আর সবাই যে শুধু সেই স্বত্বটাকেই স্বীকার করবে।"

"তারা যদি স্বত্বকে সত্যের উপর স্থান দেয়, তা হলে তুমি আমিও কি সেই অন্যায়ে সহায়তা করব ?"

"দেবেশ, তুমি পুরুষ।"

"মালতী, তুমি মানুষ।"

ওই দুটি কথা থেকে মালতী অপরিসীম শক্তিসংগ্রহ করল। কিন্তু জন্মজন্মান্তরের নির্বোধ সংস্কারের নিষ্ঠুর বন্ধন তবু যেন ছিঁড়তে চায় না, ছেঁড়ে শুধু মালতীকে।

একটু থেমে দেবেশ আবার শুরু করল, "মালতী, পাপ-পুণ্যের সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। কালে কালে তার পরিবর্তন। তবু মোটামুটি আমি সেই কাজকেই বলব পাপ, যার ফলে কাউকে ব্যথা দেওয়া হয় ; আর তাকেই বলব পুণ্য, যাতে পরকে আনন্দ দিই।"

"দেবেশ, তুমি পুণ্যবান।"

দেবেশের হৃদয় পূর্ণ হোলো। মালতীর কানে কানে বলল, "আর তোমার কথা আমি বলব ?"

"আমিই বলি, এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর, তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা কর।"

বলতে বলতে মালতী কেঁদে ফেলল। বৃষ্টিসিক্ত আননে

এমনিতেই জলধারা অবিরত বয়ে যাচ্ছিল। অশ্রুধারা তার সঙ্গে মিলিত হোলো।

দেবেশ মালতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করল মালতীর বেদনার পরিমাপ। এতক্ষণ সে সমাজ-সংস্কারকের মতো তর্ক করছিল। সেই বক্তৃতার স্বর পরিহার করে বেদনাবিধুর কণ্ঠে বলল, "মালতী, মিছেই এতক্ষণ তর্ক করছিলেম। তর্ক চলে মানুষের পূর্বকল্পিত, সজ্ঞান কর্ম নিয়ে। মানুষ নিজে যা করে তাই নিয়ে। প্রাচীন গ্রীকরা জানত যে, বিবাদ করা চলে না আমোঘ ভাগ্য নিয়ে। ডেস্টিনি, নেমেসিস্ এসব নাম দিয়েছিল ওরা। ওই তালিকায়, আর একটি নাম যোগ করতে হবে, সেটি প্রেম। এ কেউ করে না, এ ঘটে। এই ঘটনের আইন-কানুন মানুষের জানা নেই, মানুষের আইন-কানুন তাই এর উপর খাটাতে যাওয়াই মূর্খতা। এই যে তুমি আর আমি, আজ বিকালেও কি আমরা জানতেম যে, আজ সন্ধ্যায় আমরা দুজনে এমন করে দুজনকে আবিষ্কার করব? এমন করে একজন আর একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করব? একটুও না। একবারও কি এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে এসেছি যে কাউকে বঞ্চনা করব? একটুও না। আমাদের এখানে আসার ফলে যদি কেউ বঞ্চিত হয়ে থাকে তাদের জন্যে সহানুভূতি হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু প্রতিকার কী এর? কিছু নেই। ডেস্টিনির মতো নিঃশব্দে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর বঞ্চনার কথাই যদি বলো, তুমি আর আমি বঞ্চিত হই নি? তুমি আর আমি এমন

অনেক জিনিষ হারাই নি, যাতে আমাদেরও অধিকার ছিল আর কারও চেয়ে কম নয়? তুমি আমি অভিযোগ করি নি, অভিযোগ করে লাভ নেই বলে। যা পাই নি, আজ তা পেয়েছি। কল্পিত বঞ্চনার ভয়ে সেই পরমা-প্রাপ্তি অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করব না এমন মূর্খ আমি নই। আমরা পরস্পরকে যা দিয়েছি আর যা পেয়েছি, তা একান্তই পরস্পরের জন্যে। এর আগেও তা আমাদের হৃদয়ে নিহিত ছিল, কারও কাজে আসে নি। আজ আমাদের একজন তা প্রত্যাখ্যান করলে আবার তা ফিরে যাবে আপন অব্যবহারের অন্ধ বিবরে, কারও কাজে আসবে না। অমিতব্যয়িনী প্রকৃতিও এমন অন্যায় অপব্যয় সহ্য করবে না।”

বক্তৃতার উত্তেজনায় মালতীর হাতের মুঠি থেকে দেবেশের হাত একটু শিথিল হয়ে আসছিল। মালতী হাতটাকে আবার তুলে নিয়ে তার মুখের কাছে এনে তারই উপর ওষ্ঠ স্থাপন করে বলল, “দেবেশ, তর্ক বৃথা। যুক্তি বৃথা। পাপ বলে একে মানিনে। কিন্তু মানলেই কি অন্যথা করতে পারতেম? আজ সকালেও হয়তো পারতেম। এখন আর পারব না। পাপ বলে মানলেও না। যার গতি রোধ করবার সাধ্য আমার নেই, তার গন্তব্য নিয়ে গবেষণা করে কী হবে? যেখানে যাবার সেখানে সে যাবেই। সেখানটা ভালো হোক মন্দ হোক, সে অবশ্যম্ভাবী। অন্তত গতিটা যে স্বর্গের মধ্য দিয়ে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেটা প্রত্যক্ষ—”

দেবেশ বাধা দিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। মালতী তাকে

নিঃশব্দে নীরব করে দিল। তারপর আবার নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের কথাটা শেষ করল, "আর গন্তব্যে পৌঁছে যদি দেখি, সেটা স্বর্গ নয়, তা হলে এই মুহূর্তের কথা স্মরণ করে অনুশোচনা থাকবে না।"

এবারে দেবেশ মালতীকে নিঃশব্দ করে দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "মালতী, কালও স্বর্গ কথাটা শুনলে অবিশ্বাসের হাসি হাসতেম অবজ্ঞাভরে।"

বৃষ্টি তখন অনেকটা শান্ত হয়েছে, ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ভিজে জামা-কাপড়ের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ওদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল যে, আর যাই অপ্রতিরোধ্য হোক, নিউমোনিয়া নিবারণ করবার উপায় আছে এবং আর দেরী করলে সে উপায় থাকবে না। দুজনে সোজা হয়ে বসল। স্বপনে দোঁহে ছিল যে মোহে, জাগার বেলা হোলো। উঠবার আগে দেবেশ বলল, "মালতী, যাবার আগে শেষ কথাটি বলো।"

মালতীর ভাবতে হোলো না এক মুহূর্তও। স্বতই অন্তরোত্থিত ধীর কণ্ঠে বলল, "দেবেশ, আমি আজ পূর্ণ।"

এই পূর্ণতারই জন্যে মালতী আর জানতে চাইল না দেবেশের শেষ কথাটি। তারও এমনই একটি কথা স্বতই মনে এসেছিল। আকাশের দিকে মাথা তুলে চোখ মুদে পরম প্রশান্তি সহকারে মন্ত্রের মতো ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল, "*Nunc dimittis, nunc dimittis.*"

আঠারো

কিন্তু সে যে হবার নয় !

প্রকৃতির রীতিই নয় যথাস্থানে ইতি। ফুল ফুটে শান্ত হয় না, ঝরে। ফল পেকে ক্ষান্ত হতে পারে না, ক্ষয় তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সংসারে তাই শেষ আছে, সমাপ্তি নেই। মৃত্যু নেই, আছে শুধু অকালমৃত্যু। তার কোনোটা আগে, কোনোটা বা পরে। যথাকালে নয় কখনোই।

হতে পারে বিধাতা ল্যাটিন জানেন না। হতে পারে জেনেও, বুঝেও, তিনি দেবেশের প্রার্থনা উপেক্ষা করলেন।

কারণ যাই হোক, ত্রিকোণ পার্ক থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরবার সময় প্রবল বারিপাত হোলো, কিন্তু বজ্রপাত হোলো না। দেবেশ নিরাপদে বাড়ি পৌঁছোল।

মালতী পূর্ণতার কথা ঘোষণা করলে। কিন্তু বাহু প্রসারিত করলে আরও-র আশায়। না করে পারলে না। অতএব—

কিন্তু, সে যে আর এক কাহিনী, ওয়াটসন।

শেষ